প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
চারু খান

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বাবা-কে

যিনি এ বই দেখলে খুব খুশি হতেন

লেখকের কথা ও কৃতজ্ঞতা

বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর, তুলনায় উপন্যাসবিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থের সংখ্যা কম, বর্তমান গ্রন্থটি সে-অভাব কিছুটা পূরণ করবে ব'লে আশা করি, যদিও গ্রন্থের সমস্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি এখন একমত নই, এমন কি এখন লিখলে হয়ত এভাবে লিখতাম না, কিন্তু কি ভাবে লিখতাম তা-ও বোধহয় স্পষ্ট ক'রে বলা যাবে না, তবু উপন্যাস সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশী সমাজ ও জীবন ঘনিষ্ঠ ব'লে এখন লিখলে হয়ত বাংলার সমাজ ও বাঙালী মানসের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প কি ভাবে বদলাচ্ছে তা দেখানো যেতো। নিজের পুরনো লেখা সম্পর্কে লেখকমাত্রেরই কিছু কুণ্ঠা থাকে, এ লেখা তার ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু লেখক সবসময় নিজের লেখার নিরপেক্ষ বিচারক না-ও হতে পারেন, সেই ভরসায় এবং কতকটা আলোচ্য বিষয়ের অভিনবত্বের জন্য রচনাটি বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রর উপন্যাসের রূপ ও রীতির বিষয় নিয়ে আলোচনাটি লেখা হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. ডিগ্রির জন্য, বর্তমান গ্রন্থটি সেই গবেষণা-পত্রের আদ্যন্ত সংশোধিত পরিমার্জিত একটি সহজপাঠ্য রূপ।

গ্রন্থটির প্রাথমিক পর্যায়ে আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করেন স্বর্গত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গত ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ অমলেন্দু বসু, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, শ্রীমান সুরজিৎ দাশগুপ্ত, শ্রীমান দেবেশ রায়, শ্রীমান তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলয় বসু প্রমুখ শ্রদ্ধাভাজন ও

স্নেহাস্পদগণ। আকৈশোর বন্ধু সুরজিৎ বসু, শ্রদ্ধেয় গণেশচন্দ্র রায় ও সহকর্মী অধ্যাপক ঋতেন চক্রবর্তীর সঙ্গে নানা আলোচনা তর্কে বিতর্কে উপকৃত হয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় সুকুমার মিত্র (সুকুমারদা) ও অধ্যাপব শ্রীমান রমেন্দ্র বর্মণ আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মদীয় অধ্যাপক ভারতবিদ্যাবিশারদ ডক্টর সুকুমার সেনের সস্নেহ প্রশ্রয় না পেলে একাজ শেষ হতো কিনা সন্দেহ, নানা হতাশার মধ্যে তাঁর উৎসাহ আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে, তাঁর ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধ্য।

শ্রীমতী আরতি লাহিড়ীর সাহায্যের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই ডঃ অশোক ভট্টাচার্য ও বিভাস ভট্টাচার্যকে যাঁদের একান্ত সহযোগিতা ও উৎসাহে পুস্তকটি প্রকাশিত হলো। এই গ্রন্থ প্রকাশনায় অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার এবং রাণা বসু যে ভাবে সাহায্য করেছেন তা আমাকে তাঁদের কাছে অশেষ ঋণী করেছে।

কার্তিক লাহিড়ী

বিষয় সূচী

উপক্রমণিকা ১

ঘটনা-প্রধান উপন্যাস :

বাংলা উপন্যাসের প্রত্নপর্যায় ১১

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস :

বাংলা উপন্যাসের নবপর্যায় ১০৪

মননধর্মী-উপন্যাস :

বাংলা উপন্যাসের আধুনিক পর্যায়ের সূচনা ১৮২

আখ্যানভঙ্গী ২০৯

ভাষা ২২৯

উপসংহার ২৪৭

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ২৪৯

উপক্রমণিকা

প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির অদ্বৈত সংযোগ যে কোন শিল্পের পরাকাষ্ঠা। এ সাযুজ্য সম্ভব হয় শিল্পী-চৈতন্যের প্রসার ও গভীরত্বে। কারণ, জীবন একই সঙ্গে ব্যাপক এবং অগাধ; আর শিল্পীর ধ্যেয় জীবন সামগ্র্য বিধৃত হয় উপলব্ধির প্রখর ও অতল সূক্ষ্মতায়। ফলে তাঁকে জীবন থেকে মুখ ফেরালে চলে না। বিশেষতঃ উপন্যাসে দেশ-কাল ধৃত মানুষ উপজীব্য ব'লে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের সম্বন্ধ নিবিড় ও নিকট। তাই একান্ত আত্ম-মগ্ন, আত্মমুখী বা আকাশ-বিলাসী ঔপন্যাসিকেরও অন্তত একটি পা সংসার কর্দমে প্রোথিত থাকতে বাধ্য। আপাত প্রেক্ষণে অবশ্য আদ্যন্ত জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ড বিশৃঙ্খল ও অনুপূর্বহীন ব'লে মনে হয়। এই এলোমেলো, বিশ্লিষ্ট প্রবাহের নিগূঢ় ঐক্য সন্ধান ও গ্রন্থিবন্ধনে শিল্পীর প্রাণান্ত প্রয়াস। জীবনের তাৎপর্য-ই তাঁর অনুসন্ধেয়। এ অন্বিষ্টের জন্য নিরন্তর প্রযত্নে নির্মিত নক্‌শার মধ্যে ঔপন্যাসিক আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রে জীবন সামগ্র্য রূপায়ণে আগ্রহী, এবং সেই সূত্রে ব্যক্তি ও সমাজের স্বরূপ ও সম্পর্ক নির্ণয় তাঁর কাছে আবশ্যিক। উপন্যাসে ব্যক্তির প্রশ্নই মুখ্য; কারণ প্রাতিস্বিকতার উদ্ভবেই উপন্যাসের জন্মলগ্ন ত্বরান্বিত হয়। যেহেতু সমাজ-সংসার বিযুক্ত স্বয়ম্ভু ব্যক্তি বাতুল কল্পনা মাত্র, সেজন্য সামাজিক পটে ব্যক্তির বিচারণা অপরিহার্য। ওই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির আপন সত্তার সঙ্গে নানা দ্বন্দ্ব-মিলনে চারিত্র্য বিকাশের চিত্র উন্মীলিত হয়। সম্পর্কের ত্রিস্তর

সামান্য মিশ্র নয়, তা পারস্পরিক ও অন্তর্গূঢ়, এই সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টায় ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীগত কৌণিকতা প্রতিফলিত, এই দৃষ্টিভঙ্গী চৈতন্যের গভীরত্ব ও প্রসারতায় তাবৎ বিশৃঙ্খলা সংহৃত করে, এবং তখনই উপন্যাসে স্থান ও কালের মাহাত্ম্য উদ্ভাসিত হয় স্বাভাবিক নিয়মে। ঔপন্যাসিক এই দৃষ্টিভঙ্গীর কল্যাণেই প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সামঞ্জস্য সাধনে পারংগম।

শিল্পবিষয় ও শিল্পরূপ, ফ্লবেআরের ভাষায়, "শরীর ও আত্মার মত, আধার এবং আধেয় আমার কাছে এক।" সেজন্য রূপকল্প ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় প্রসঙ্গ, বক্তব্য প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ ও উত্থাপন অনিবার্য। জীবনের সজীবত্ব যেমন সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত, লেখকের বিষয় তেমনি সমগ্র রূপকল্পে বিস্তৃত। তাই বক্তব্য রূপায়ণের জন্য প্রকরণ নির্বাচনে ঔপন্যাসিক সর্বদা সমস্যাপীড়িত এবং চিন্তাবিষ্ট, কারণ একমাত্র যথাযোগ্য শিল্পরূপেই শিল্পবিষয় যথার্থ বিধৃত, এবং পদ্ধতির সুষ্ঠু ও যোগ্য ব্যবহারেই ঈপ্সিত শিল্পরূপ প্রকাশিত হয়, "Technique, as we have said, is the tactics of novel writing, form its more general strategy, dictated as it is by the organic development of the content. Without a content integrated with the totality of life, without a form that reveals this process of integration, and without a technique that points and underlines this form, a novel cannot be worthy of serious notice." (Hyman Levy and Helen Spalding : Literature For An Age of Science, pp. 164-65)

জীবন ঘনিষ্ঠ ব'লে জীবনের মতই উপন্যাসের কাব্য বা নাটকের মত নির্দিষ্ট ঋজু প্রতিমা নেই। কাব্যিক বা নাট্যিক যেমন স্বতন্ত্র

পরিচয় দ্যোতক শিল্প-পদ্ধতি, উপন্যাস তেমন অনন্যতন্ত্রী নয়। তৎসত্ত্বেও উপন্যাস নিরাকার নিরঞ্জন নয়, বক্তব্যের টানে জীবন সামগ্র্য প্রকাশের তাড়নায় শেষপর্যন্ত একটি কাঠামোয় শৃঙ্খলিত, যেমন জন্ম-মৃত্যুর বলয়ে বিরাট জীবনের চংক্রমণ সীমাবদ্ধ। জীবনের প্রারম্ভ ও প্রান্ত বিন্দুর মধ্যবর্তী অধ্যায় সমস্যা সঙ্কুল ও জটিল। নানা তরঙ্গে কর্মে অকর্মে চাঞ্চল্যে স্থৈর্যে মূক ও মুখর এই অধ্যায় অব্যবস্থিত, এবং যার নির্দিষ্ট কোনও আকার নেই; স্থির-আকৃতি বিহীন এমন অধ্যায়ই ঔপন্যাসিকের উপজীব্য, আর জীবন বলতে সচরাচর দ্বন্দ্বময় চিত্রই আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু যাবতীয় কর্মকাণ্ড উপন্যাসে চিত্রিত হ'লে অনাসৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল, ফলে নির্বাচন ও অভিজ্ঞতার তর-তম করণ অবশ্যম্ভাবী। "জীবন", হেনরী জেমসের ভাষায়, "সমস্ত কিছুর গ্রহণ ও একাকার, এবং শিল্পের সবটাই পৃথকীকরণ ও নির্বাচন।" এ-নির্বাচন জীবনের তাৎপর্য সন্ধানের জন্য প্রয়োজন, আবার নির্বাচিত অংশগুলি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী, বক্তব্যে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ; এবং এরই মধ্যে লেখকের ঈপ্সা ও আকাঙ্ক্ষার চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়।

পরস্পর সংযুক্ত খণ্ডাংশে জীবন সামগ্র্য চিত্রায়ণ সম্ভব বাস্তবের জটিল কাটাকুটির রহস্য উন্মোচনে। ফলে জীবনের গতি-প্রকৃতি অনুসরণে কোন কৌশল অবলম্বনীয়—তা সমস্যার বিষয়; এবং বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপ একই সক্রিয়তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হ'য়ে উঠলেই উপন্যাস রচনা চরিতার্থ। তাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সাযুজ্য স্থাপন, কারণ একমাত্র যোগ্য সংযোগেই স্রষ্টার যাবতীয় মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়। ফলে উপন্যাসে এক এক সময়ে এক একটি উপকরণের উপর ঝোঁক পড়া স্বাভাবিক, কারণ এই ঝোঁক ঈপ্সিত লক্ষলাভের জন্য উদ্ভূত, অবশ্য এ স্থলে

সামাজিক অবস্থা ও তৎকালীন সাহিত্যিক গদ্যের ভারবহন ক্ষমতার বিষয়টি উল্লেখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের সূচনা স্তরে কাহিনী ও ঘটনার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ সঙ্গত তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যিক গদ্যের অবস্থানুসারে। এ অবস্থা দ্রুত উন্নত হ'তে থাকলে চরিত্রের স্বকীয় বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়, তখন উপন্যাসে ঝোঁক পড়ে চরিত্রের উপর। এবং পরবর্তীসময় ঘটনা বা চরিত্র চিত্রণ অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীর অন্তর চিত্রণই ঔপন্যাসিকের মুখ্য অবলম্বন হয় বিশিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতের জন্যই। যথাযথ পন্থা, প্রকৃতি পন্থা, প্রকাশপন্থা, প্রতীক পন্থা প্রভৃতি যে কোনও রীতির উদ্ভব তাই কোনও খেয়াল খুশী নির্ভর নয়। এক-একটি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাই ঔপন্যাসিককে ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী করে সন্দেহ নেই।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের ধ্যান-ধারণা তাঁর বক্তব্য, এরই সাহায্যে তিনি ঈপ্সিত ছক ও নকশা সন্ধানে তৎপর, এবং ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, পরিবেশ ইত্যাদি সহযোগে শিল্পের নিয়মে আপন বক্তব্য রূপায়ণে সচেষ্ট। উপন্যাসে শিল্পের নিয়মের অর্থ হচ্ছে ঘটনা, চরিত্র প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য থেকে স্বসমুত্থ পরিণতি সমূহ ; এক্ষেত্রে লেখকের ইচ্ছা বা মত আরোপ করা শিল্প নিয়ম বিরুদ্ধ। অথচ প্রকাশিত বক্তব্যের সঙ্গে লেখকের সাধ কি সর্বদা সামঞ্জস্যময় ? ঔপন্যাসিকের ঈপ্সা পদে পদে ব্যাহত উপযুক্ত শিল্প উপকরণের অভাবে, শ্রেয়-প্রেয়র দ্বন্দ্বে। যে গভীরতায় বা বিস্তারে প্রস্থান তাঁর পরম স্বর্গ, হয়ত ভাষার স্থিতিপ্রবণতাই তখন সে-উত্তরণের পক্ষে কণ্টক বিশেষ। তদুপরি উপস্থাপনা, রীতির সীমাবদ্ধতা উপেক্ষণীয় নয়। উপন্যাস বিকাশশীল সৃষ্টি ব'লেই কর্তার হুকুম সর্বদা মানে না, চরিত্র ঘটনা ইত্যাদিরও একটা নিজস্ব

গতি ও ছন্দ আছে। সেজন্যে উভয়ের (লেখকের ইচ্ছা ও উপকরণের ইচ্ছা অতিক্রম করার শক্তি) সমন্বয় সাধন ঔপন্যাসিকের কর্তব্য। অন্যপক্ষে ভাষা, রীতি প্রভৃতি নিরতিশয় নমনীয় নয় ব'লে পূর্ব পরিকল্পনা স্থির-বিন্দু থেকে কিঞ্চিৎ সরে যেতে বাধ্য হয়ত লেখকের অনিচ্ছায় বা অচেতনে। পদ্ধতির পরিপাক শক্তি এ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গের সমানুপাতিক হ'লে লেখকের ফাঁড়া কাটে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক রচনার প্রথম থেকে শেষ অবধি মনস্ক ও সচেতন থাকতে বাধ্য, এই সচেতনতা অবশ্যই শিল্প বিষয় ও শিল্পরূপ উভয় সম্বন্ধীয়।

যে কোনও শিল্পের আলোচনার মতই উপন্যাসের আলোচনা সামগ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, এই সমগ্রতার আলোচনায় অবশ্য ঔপন্যাসিকের সাধ ও বক্তব্যের উপর জোর পড়ে স্বাভাবিক নিয়মে, কারণ আপন বক্তব্য রূপায়ণের জন্যই উপন্যাস রচিত হয়, আবার নির্বাচিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি সেই লক্ষ্যে উপনীত হন, সেজন্য পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

॥ ২ ॥

বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিচারে তাই অতি সংগত ভাবেই বক্তব্য, প্রসঙ্গ-র বিষয় উত্থাপিত; এবং বক্ষ্যমাণ আলোচনা বক্তব্য রূপায়ণে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও রীতি বিষয়ক। এক একটি শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে তদীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক একটি রচনাকে সেই শ্রেণীভুক্ত করা সমালোচকের প্রথাসিদ্ধ কর্ম, এমন বিভাজনে সমালোচকের সুবিধা অনেক। কিন্তু কোনও একটি শিল্পকর্মকে একটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যে সর্বতোভাবে খাপ খাওয়ানো সম্ভব কিনা তর্কের বিষয়। এমনকি ভালো

এবং মন্দ শ্রেণী বিভাগেও শিল্পকর্মের প্রকৃত বিচারণা ফলপ্রসূ নয়। আবার, আত্মমুখী আলোচনায় ব্যক্তিগত মর্জি ও পক্ষপাতের চিহ্ন প্রকট থাকাই স্বাভাবিক, যদিও স্বীকার্য পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষ মানুষ কেতাবে বিরাজ ক'লেও তেমন মানুষ মরজগতে অলীক। অথচ সমালোচকের শ্রেষ্ঠত্বই নিরূপিত হয় পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষতার তর-তমে। একটি বিশেষ রচনার বিচারে সামগ্রিক রস আস্বাদনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে উপরি উক্ত অসুবিধা অতি অনায়াসে অতিক্রম করা যায়, কিন্তু যে ক্ষেত্রে শিল্পের একটি সমগ্র বিভাগ আলোচনাধীন, সেক্ষেত্রে হেনরী জেম্‌সের বিরক্তি ("দি আর্ট অব ফিকশন"-এ হেনরী জেম্‌স লেখেন: "উপন্যাস এবং রোমান্স, ঘটনা-প্রধান উপন্যাস ও চরিত্র-প্রধান উপন্যাস, এই বিভাগ সমালোচক ও পাঠক আপন সুবিধার্থে এবং নিজেদের কিছু কষ্টকর অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য করেছেন ব'লে আমার মনে হয়, যাতে স্রষ্টার উৎসাহ বা বাস্তব সংযোগ নেই বললেই চলে, * * *") উপেক্ষা করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

বর্তমান গ্রন্থে বহু উপন্যাস আলোচিত হওয়ায় সুবিধার জন্য কয়েকটি স্থূল বিভাগ সমালোচক করতে বাধ্য হয়েছেন, এবং সুখের বিষয় 'চোখের বালি' উপন্যাসের সূচনা অংশে রবীন্দ্রনাথ এই বিভাজনের কাজটি সুগম করে দিয়েছেন, "ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো"—এই সূত্রে বাংলা উপন্যাসের প্রত্নপর্যায়ের উপন্যাসগুলির প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে "ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া", এবং এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলি সেজন্য "ঘটনা প্রধান উপন্যাস" অভিধার উপযুক্ত। অথচ বঙ্কিম-উপন্যাসে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দানই চূড়ান্ত নয়, উপন্যাসে স্বীয় বক্তব্য ও

তত্ত্বপ্রমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের মত তৎপর ও মনোযোগী পুরুষ সত্যই দুর্লভ। জীবনের বিভিন্ন, বা সময় সময় একই সমস্যা রূপায়ণের জন্য তাঁর প্রযত্ন বিস্ময়ের; এবং উপন্যাসের আদি কর্মিকের পক্ষে নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকা অবশ্যই দুঃসাহসিক। কিন্তু বক্তব্য বা তত্ত্বপ্রমাণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বহির্ঘটনা ও কাহিনীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। সংলাপ বা পরিবেশ চিত্রণে বঙ্কিম-উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর অন্তরের চিত্র বহুসময় সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হয়, তবু সমগ্র উপন্যাসে বহির্জগৎ ও ঘটনার আধিপত্য সর্বদা প্রবল ও প্রকট। সেজন্য বঙ্কিম-উপন্যাস, আমাদের বিশেষ মনোযোগের বিষয় হলেও, 'ঘটনা প্রধান উপন্যাস' রূপেই চিহ্নিত। প্রত্নপর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান পুরুষ, এবং বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রভাব "চোখের বালি" পর্যন্ত রচিত সমস্ত বাংলা উপন্যাসে অল্পাধিক সক্রিয়। আশ্চর্যের বিষয় উপন্যাসের এই আদি কর্মী রীতিগত যত পরীক্ষায় নিরত ছিলেন সে-অনুপাতে পরীক্ষার চেষ্টা অন্যান্য ঔপন্যাসিকে অনুপস্থিত, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিযোগী।

"চোখের বালি" উপন্যাসে নবপর্যায়ের সূচনা, এবং এই ধারা রবীন্দ্রনাথে "গোরা" পর্যন্ত প্রবাহিত। "চোখের বালি"-তে পাত্র-পাত্রীর 'মনের দাঁতের কথা টেনে' বের করা হয়েছে, ফলে পূর্বের ঘটনা-প্রধান উপন্যাস থেকে এ-উপন্যাস নানা দিক থেকে পৃথক। ঘটনা বাহুল্য বর্জন, চরিত্রের স্বকীয় বিকাশ, চরিত্রোৎসারিত ঘটনার বিবরণ প্রভৃতি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে নবপর্যায়ের উপন্যাসগুলি স্বতন্ত্র। এ-পর্যায়ে পাত্র-পাত্রীর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্র সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং ঔপন্যাসিক পাঠক সম্মুখে চরিত্রের অন্তর উন্মোচনে উৎসাহী, সেজন্য নবপর্যায়ের উপন্যাসগুলি "মনস্তত্ত্বমূলক

উপন্যাস” হিসাবে চিহ্নিত, যদিও “গোরা” উপন্যাসের পরিচয় মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস অভিধায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত নয়। উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম নিয়ে সমালোচক সর্বদা বিব্রত ও চিন্তিত, কারণ এই রচনাগুলিকে কোনও ক্রমে একটি শ্রেণীভুক্ত করা অসম্ভব, সেজন্য উৎকৃষ্ট রচনা স্বতন্ত্র ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার যোগ্য, কারণ সেই আলোচনায় শিল্পকর্মের একটি আদর্শ মান প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই আদর্শ মান অন্যান্য স্রষ্টার রচনাবলীর মান উন্নয়নে সহায়ক। কিন্তু এ-সমালোচনা পদ্ধতির অসুবিধা অনেক, বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে বহু রচনা বিশ্লেষণে সমালোচক নিযুক্ত। অন্যপক্ষে স্রষ্টা যে উচ্চতায় উপনীত, সমালোচক প্রায় সেই উচ্চতায় আরোহণ না করলে সমালোচনা যথাযথ ও উপযুক্ত না হবার সম্ভাবনা প্রবল। তাই বর্তমান সমালোচকের মত স্বল্পবিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সে পথ পরিহার বিজ্ঞতার নামান্তর। “গোরা” একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম, এবং উপন্যাসটি বক্তব্য, প্রকরণ, ভাষায় আমাদের সাহিত্যে ব্যতিক্রম বিশেষ, সেজন্য “গোরা”র আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে হওয়া উচিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে “গোরা”র আলোচনা নবপর্যায়ভুক্ত, তবু সেই সীমার মধ্যে উপন্যাসটির যথাযোগ্য সমালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসে মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি আংশিক রূপে অনুসৃত, কিন্তু এই অনুসরণে তাঁর দ্বিধার ভাবই প্রকাশিত। মনে হয় জনপ্রিয়তার খাতিরে ঘটনা বাহুল্য ও মনোবিকলনের মধ্যে তিনি একটা আপোষ করার চেষ্টা করেছিলেন, তদুপরি ঔপন্যাসিক-প্রতিভার মানদণ্ডে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সমস্যার স্বরূপ যতটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র তার অংশত সক্ষম

হন নি। সাধারণত অতিরিক্ত ভাবালুতার খাতে তাঁর রচনাধারা প্রবাহিত, এবং এই ভাবালুতাই তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণও বটে।

"গোরা" পর্যন্ত যাবতীয় বাংলা উপন্যাসকে প্রত্ন ও নব—দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা কঠিন নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের ("যোগাযোগ" ব্যতীত) উপন্যাসগুলিতে "একটি গভীর ভাবগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁহার রচনা ভঙ্গী ও বিষয় বর্ণনা অনেকটা অভিনব প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছে।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ: ১৪২)। এই উপন্যাসগুলি ভিন্ন প্রকরণে রচিত, যে প্রকরণে কাহিনী বা চরিত্রের আদি অন্ত্য ক্রম বিকাশ উহ্য, এবং শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে (বিশেষতঃ চতুরঙ্গ, এ-উপন্যাসটি এ-অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস) হৃদয় অপেক্ষা মননেই লেখকের আগ্রহ, সেজন্য এ-শ্রেণীর উপন্যাসকে কোনক্রমেই প্রত্ন বা নব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধিচর্চা এবং বুদ্ধির উপর আস্থা স্থাপন আধুনিকতার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ, তাই এ-উপন্যাসগুলি আধুনিক পর্যায়ের অন্তর্গত, এবং আধুনিক পর্যায়ের দ্বারপ্রান্তে এসে বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

বক্ষ্যমান আলোচনায় উপন্যাসের আত্মা অপেক্ষা শরীরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ব'লে আলোচনাটি সমালোচকের বিচারে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হ'তে বাধ্য, যেহেতু আত্মা ও শরীরের হরিহর মিলনই সজীবতা, সম্পূর্ণতা। কিন্তু কাব্যের আত্মার সন্ধানে আমাদের পূর্বাচার্যগণের অনেকে অবশেষে কাব্যশরীরের অপূর্ব নির্মাণ ক্ষমতার আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছেন, তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ও আলোচনা-পদ্ধতি অসামান্য উন্নত এবং সময় সময় সেইসব আলোচনা প্রতিভাও ক্ষমতার গুণে

মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। প্রতিতুলনা এ-ক্ষেত্রে স্পর্ধা ও বাতুলতা, শুধু পূর্বাচার্যগণ কাব্যের দেহাত্মক আলোচনায় ভীত বা কুণ্ঠিত ছিলেন না, এ প্রসঙ্গটি আমাদের স্মরণযোগ্যমাত্র। সে-হিসাবে উপন্যাসের শরীর বিষয়ক প্রস্তাবের (আলোচনার মান নিকৃষ্ট হলেও) মূল্য কম নয়, অন্তত সেই প্রস্তাবে ঔপন্যাসিকের অনুসৃত পদ্ধতি বিশ্লেষণে স্রষ্টার সান্নিধ্য ও সাহচর্যলাভ সহজ হয়; সেই বিশ্লেষণে পাঠক, সমালোচক এবং লেখক উপকৃত হ'তে বাধ্য। বাংলা উপন্যাস এখনও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার উর্বর ভূমি, এবং উর্বর ভূমি থেকে পরিমাণমত উৎকৃষ্ট ফসল তোলাও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ।

ঘটনা-প্রধান উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের প্রত্ন পর্যায়

ক. প্রথম যথার্থ উপন্যাস

অনেক সমালোচকের মতে 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস, স্বয়ং প্যারীচাঁদ মিত্র সেই অভিমত পোষণ করতেন। এ দাবী হয়ত অযৌক্তিক নয়, কারণ উপন্যাস রচনার জন্য সমাজ-সংসারের বিস্তৃত পটভূমি রচনা ও সেই পটভূমি উত্থিত সমস্যা ধরার চেষ্টা সম্পর্কে লেখক যে অবহিত ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে গ্রন্থের ইংরেজিতে লেখা ভূমিকায়। কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা, কলকাতার আদি বৃত্তান্ত, বৈদ্যবাটির বাজার, জমিদার ও মোসায়েব, হুগলি ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারি, উকিল বটলর সাহেবের অফিস, নীলকরদের অত্যাচার, প্রজাদের দুর্দশা, সমাজের সৎ ও ধড়িবাজ—প্রভৃতি অসংখ্য বর্ণনায় স্পষ্ট যে, লেখক দেশের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন চিত্র রচনার মধ্য দিয়ে গোটা সমাজ-জীবন ও সেই সমাজের বিভিন্ন মানুষের পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন, আর এই গোটা সমাজ ও জীবন আঁকার জন্য অসৎ মতিলালের সৎ মতিলালে রূপান্তরের কাহিনী নির্বাচিত হয়েছে। উপন্যাসের সূচনাস্তরে কাহিনীর আকর্ষণই মুখ্য, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি, বরং বলা ভালো, আজও অধিকাংশ বাঙালী ঔপন্যাসিক কাহিনীর মোহে ও জালে আবদ্ধ। উপন্যাসের প্রত্যুষ পর্বে 'গল্প নির্মাণ শক্তি প্রকৃত সৃষ্টি লক্ষণ' (মোহিতলাল মজুমদার : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, পৃ: ২৫) নিঃসন্দেহে, কারণ গল্প নির্মাণের প্রখর টানেই তখন চরিত্র

সজীব ও প্রাণবান হয়, এবং সেই সৃষ্টি শক্তির জন্যই আখ্যান উপযুক্ত পরিবেশে স্থাপিত হ'য়ে সম্ভাব্য ও বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ উপন্যাসের শৈশবাবস্থায় প্লট, চরিত্র, পরিবেশ বর্ণনা, সংলাপ প্রভৃতি প্রধান উপাদানগুলি লেখকের কাহিনী নির্মাণ শক্তির বলে উপন্যাসের অনন্য ও বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যে রূপকল্পে মানুষের জীবন একই সঙ্গে সামাজিক ও প্রাতিস্বিক সত্তার নিরন্তর সংঘর্ষে সজীব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই উপন্যাসের প্রত্যুষপর্বের রচনা বিচারে লেখকের কাহিনী নির্মাণ শক্তির উপর সমালোচকের ঝোঁক পড়ে স্বাভাবিক কারণে।

কুশিক্ষা ও উপযুক্ত মনস্কতার অভাবে মানুষের অধঃপতন এবং যথোচিত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ফলে সেই অধঃপতন থেকে মুক্তিলাভ —'আলালের ঘরের দুলাল'-এর প্রতিপাদ্য বিষয়; লেখক এই প্রতিপাদ্য রূপায়ণের জন্য মতিলালের শৈশব অবস্থা থেকে তার ক্রম ও দ্রুত পতনের চিত্র বর্ণনা ক'রে অবশেষে মতিলালের মতি পরিবর্তনের চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। অসৎ মতিলালের সৎ মতিলালের উত্তরণ কাহিনীতে তাই লেখকের গল্প-নির্মাণ শক্তি সম্পর্কে আগ্রহ জাগে। প্যারীচাঁদ সেই গল্প নির্মাণে সফল হয়েছেন—একথা বলা মুস্কিল, যদিও উপন্যাসোপযুক্ততা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে লেখক কাহিনীটিকে বিস্তৃত সমাজ পটে স্থাপিত করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়—যে দক্ষতার বলে সমাজ ও জীবনের বিস্তৃত পটভূমি ও কাহিনী আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে থাকে, আলোচ্য গ্রন্থে কাহিনী ও পরিবেশের সেই অঙ্গাঙ্গিত্ব রক্ষিত হয় নি। গল্পের টানে অথবা পরিবেশ বর্ণনার অমোঘ আকর্ষণে কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণনা একে অপরের সম্পূরক বা পরিপূরক হয়ে ওঠে নি, ফলে পরিবেশ চিত্রণ উহ্য রাখলে গল্পের ইতর বিশেষ হয়

না, অর্থাৎ কাহিনী ত্রিমাত্রিকতা (দেশ, কাল ও ব্যক্তি) লাভ করে নি, অথচ লেখক কাহিনীটিকে উপন্যাসোচিত বিস্তার দিতে মনোযোগী ছিলেন। বিস্তৃত পটভূমি ও কাহিনী পাশাপাশি অবস্থান করলেও উপন্যাসের অনবদ্যরূপে সংহত হয় নি। এর জন্য অবশ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের কল্পনাশক্তি দায়ী। উপন্যাসের সমস্যা ও নীতি শিক্ষা দানের মধ্যে বিভেদ রেখা টানতে পারেন নি ব'লেই 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা ব্যর্থ হয়েছে। লেখকের আসল উদ্দেশ্য ছিল গল্পচ্ছলে নীতি শিক্ষাদান, এবং তার প্রমাণও পুস্তকটির প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় লভ্য, সেজন্য লেখক সর্বদা কাহিনী নির্মাণের প্রতি মনোযোগীও ছিলেন না। 'অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ, সৎ সঙ্গে কাশীবাস' প্রবচনটি প্রমাণের জন্য প্যারীচাঁদ মিত্র মতিলালের কুকীর্তি চিত্রণে অতি তৎপর ছিলেন, কিন্তু একটি চিত্র কার্যকারণে অন্যচিত্রের জনক বা সন্তান নয় ব'লে লেখকের এ-প্রচেষ্টা অনেকটা উদাহরণ দেবার সামিল রূপে গণ্য ; মতিলাল কুসঙ্গে কি কি কুকর্মে রত—তার উদাহরণ সংগ্রহ ও সেই সংবাদ প্রদানে লেখক সন্তুষ্ট, সেজন্য মতিলালের মতি পরিবর্তনের কারণ অথবা মতিলালের সৎ হবার আকুতি লেখক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। এই রূপান্তরের কৈফিয়ৎ দেওয়া দক্ষতার পরিচয়, এরূপ দক্ষতা হয়ত এক্ষেত্রে আশা করা অনুচিত, কিন্তু যে-উপন্যাসে রূপান্তরের কাহিনীই মুখ্য, সে উপন্যাসে রূপান্তরের প্রতিটি স্তর না হ'লেও কোনও কোনও স্তরের বিবরণ দান লেখকের ন্যূনতম দায়িত্ব। বস্তুত, নীতি শিক্ষাদান উদ্দেশ্য হওয়ায় লেখক প্রতিবেশ বর্ণনায় অধিক মনোযোগী হয়েছেন, কারণ প্রতিবেশ বর্ণনার ফাঁকে উপদেশ প্রদান অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রতিবেশগুলি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে অতি উৎকৃষ্ট চিত্র, বিশেষতঃ

তৎকালীন আবেষ্টনটি লেখকের বর্ণনায় আমাদের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হয়। কিন্তু এই প্রতিবেশ চিত্রণ গল্পের বা চরিত্রের আন্তরটানে উত্থিত নয়, লেখকের খেয়ালখুশি মাফিক উপস্থাপিত, ফলে চিত্রগুলি টেকচাঁদঠাকুরের বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দ্যোতক হলেও বক্তব্য বা কাহিনীর বিকাশে সহায়ক নয়। বরং প্রতিবেশ চিত্রণ কাহিনীর অগ্রগতির পথে অন্তরায়, সেজন্য কাহিনীগুলিকে বহুসময় পৃথক পৃথক ঘটনার নকশা বলে মনে হয়।

অন্যদিকে চরিত্রায়ণের প্রয়াসও গ্রন্থে অপরিলক্ষিত। প্রতিটি চরিত্রের সুস্পষ্ট ব্যক্তিক লক্ষণ বাংলা উপন্যাসের এইস্তরে কিঞ্চিৎ দুরাশার মতই, তবু কাহিনীর মধ্যে ঘটনার টানাপোড়নে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিত্বের ঈষৎ স্ফূরণ অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলাল"-এ চরিত্রগুলি সৎ ও অসৎ-এর প্রতিরূপমাত্র। মাত্র প্রতিরূপ হওয়ার জন্য চরিত্রের সজীবতা নষ্ট হয়েছে। পুরাকালে নীতিশিক্ষা দানের জন্য রচিত কাহিনীতে চরিত্রগুলি যেমন তত্ত্ব কথার বাণীমূর্তি বিশেষ, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের চরিত্রগুলির সেই দুর্দশা। বস্তুত কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে আত্মীয়তা সন্ধান এ গ্রন্থে দুষ্কর, কারণ কাহিনীটি ঘটনা পারম্পর্যের কার্যকারণে বিকশিত নয়। ঘটনাগুলির প্রায় সব ক'টি মতিলালের কুকীর্তির নিদর্শন, যদিও এই কুকীর্তিগুলির প্রভাব চলমান কাহিনী বা চরিত্রে অনুপস্থিত। সেজন্য মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে কবিতা ও আগড়পাড়ার অধ্যাপকদিগের বাদানুবাদ, বেচারামবাবু ও বেণীবাবুর কথোপকথন বিশেষতঃ বরদাবাবু প্রসঙ্গে এবং রামলালের সৎ চরিত্রের কারণ বিশ্লেষণের সংলাপগুলি, বরদাবাবুর উপদেশ বিতরণ, বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ ও সেই উপলক্ষে নাপিত-নাপ্তেনীর সংলাপ, বাবুরামবাবুর শ্রাদ্ধবাসরে পণ্ডিতদের

বাদানুবাদ প্রভৃতি অবান্তর রূপেই গণ্য। এ-গুলি লেখকের সমাজ সম্বন্ধীয় ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার উদাহরণ, কিছুটা নীতিজ্ঞানেরও। এজন্যই বাহুল্যর কাহিনী লেখকের কাছে অপরিহার্য, যদিও বাহুল্যের কোনও সক্রিয় ভূমিকা গ্রন্থের যে কোনও কাহিনীতে অবর্তমান। অবশ্য স্বীকার্য যে, অসৎ চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বর্ণহীন নয়, অন্তত ঠকচাচার চরিত্রটি বেশ সজীব। কিন্তু গ্রন্থে সব চরিত্র সরল (ফ্ল্যাট) এবং সময় সময় টাইপ, অথচ দু-একটি চরিত্র প্রতিভূস্থানীয় ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল না হ'লে উপন্যাস রচনার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।

"আলালের ঘরের দুলাল"-এ উপন্যাসের সব ক'টি উপাদান বর্তমান, তবু উপাদানগুলি লেখকের অক্ষমতায় রাসায়নিক ঐক্যে আশ্লিষ্ট নয়। পরস্পর বিযুক্ত চিত্রও বক্তব্যের টানে বা গল্প নির্মাণের কৌশলে সংহত হয় উপন্যাসে, প্যারীচাঁদ মিত্রর গল্পরচনা ক্ষমতায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল না, অন্যদিকে প্রতিপাদ্যবিষয়টির সংযুক্তি-করণের শক্তি লেখকের নীতি শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায় নিঃশেষিত। যে কোনও বক্তব্য উপন্যাস রচনার উপযুক্ত, অবশ্য সেই বক্তব্যের রূপায়ণ উপন্যাসের ন্যায় ও নিয়মে সংঘটিত হ'লে। দুঃখের বিষয় "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থে বক্তব্য রূপায়ণের সেই ঔপন্যাসিক ন্যায় ও নিয়ম অনুপস্থিত, তাই "আলালের ঘরের দুলাল" বর্তমান সমালোচকের মতে উপন্যাস পদবাচ্য নয়।

বরং গল্প নির্মাণ শক্তির পরিচয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "অঙ্গুরীয় বিনিময়" গ্রন্থে অধিক পরিলক্ষিত। "আলালের ঘরের দুলাল"-এর মত এ-গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য হিতোপদেশ বিতরণ, কিন্তু "অঙ্গুরীয় বিনিময়"-এর কাহিনী অবান্তর, বাহুল্য ঘটনায় ভারাক্রান্ত নয়। কাহিনীর সূত্রপাত শিবজী কর্তৃক রোসিনারা অপহরণে,

এ অপহরণের উদ্দেশ্য বাদশাহের সঙ্গে স্থির সৌহার্দ এবং সম্বন্ধ নিবন্ধন, কিন্তু বন্দিনী রোসিনারা অচিরে শিবজীর যত্ন ও মাধুর্যভাবে বশীভূতা হন, শিবজীও বাদশাহ-নন্দিনীর প্রণয় মুগ্ধ হন। এই সময় রোসিনারার প্রতি অশালীন আচরণের জন্য জনৈক সেনানীকে শিবজীর দ্বৈরথে আহ্বানের পর কাহিনী শিবজী ও সেনানী কেন্দ্রিক : দ্বৈরথে পরাস্ত হয়ে সেনানীর মোগল পক্ষ অবলম্বন, মোগলদের দুর্গজয়, রোসিনারার মুক্তি, শিবজীর পলায়ন ও পুনরায় দুর্গজয় এবং সেনানীর বন্ধন মোচন, অবশেষে মোগলদের বিরুদ্ধে সেনানীর প্রাণ বিসর্জনে এ-অধ্যারের সমাপ্তি। ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে কাহিনী দিল্লী অভিমুখী ও দিল্লী কেন্দ্রিক ঃ জয়সিংহের পরামর্শে শিবজীর আরঞ্জেব দরবারে যাওয়া, অপমানিত অবস্থায় বন্দী হওয়া, কৌশলে পলায়ন এবং পলায়নের সময় ভগ্নদেবালয়ে রোসিনারা প্রেরিত অঙ্গুরীয় গ্রহণে কাহিনীর বৃত্ত সম্পূর্ণ, অবশ্য এই অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে রোসিনারার যন্ত্রণাদীর্ণ আলেখ্যটিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাহিনীর মূল উপজীব্য নিঃসন্দেহে শিবজী ও রোসিনারার প্রণয়-উপাখ্যান, গ্রন্থের নামকরণেও সেই গুরুত্ব আরোপিত। অথচ মহারাষ্ট্রপতি ও বন্দিনীর প্রণয় উদ্গমের ইতিবৃত্ত নিতান্ত দায়সারা ভাবে কয়েক ছত্রে প্রকাশিত ঃ "রোসিনারা সেইস্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং মাধুর্যভাবে বশীভূতা হইলেন।" অথবা, "সত্যবটে, যখন শিবজী আরঞ্জেব-কন্যাকে উপত্যকা মধ্য হইতে হরণ করিয়া আনেন, তখন শত্রুদ্রোহ মাত্র তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তিনি অদৃষ্ট-পূর্বা রোসিনারার প্রতি প্রীতি সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং তাহা উঠিয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐ নবকিশোরীর হৃদয় কর্ষণে এমন ঝটিত সক্ষম হইলেন।"—উদ্ধৃতি দু'টি বিবৃতি

মূলক বলাও অতিরঞ্জন, কারণ উপন্যাসে বিবৃতিমূলক পদ্ধতিতেও নায়ক-নায়িকার প্রণয় উন্মেষের চিত্র এমন সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হয় না, আর এ-ক্ষেত্রে বাদশাহ-কন্যার পিতৃ-শত্রুর প্রতি মনোভঙ্গী পরিবর্তন নিশ্চয়ই নানা জটিলতায় আচ্ছন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন ব'লেই সেনানী বিষয়ক অধ্যায়টি গ্রথিত করেন, "এই সময়ে আবার এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হয়, যৎ কর্তৃক বাদসাহ কন্যার মন শিবজীর নিতান্ত বশীভূত হইল।" অবশ্য বিভিন্ন অবস্থায় সেনানীর প্রতি আচরণে শিবজীর শৌর্য ও মহত্ত্ব প্রকাশিত এবং মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ে সেনানীর অবদানও ন্যূন নয়, তবু অধ্যায়টি "বাদসাহ কন্যার মন শিবজীর নিতান্ত বশীভূত হইল" প্রমাণের জন্যই যেন সংযুক্ত। নায়ক-নায়িকার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি বিভিন্ন স্তরে আদৌ বিশ্লেষিত নয়, সেজন্য পিত্রালয়ে রোসিনারার প্রত্যাবর্তনের পর শিবজীর কার্যকলাপ ভাবনা-চিন্তায় নায়িকা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, হৃদয় পরিবর্তনের এহেন নির্বিকার ভাব অন্তত সজীব মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক ও অচিন্ত্যনীয়, তাই পলায়নের সময় রোসিনারার কাছে শিবজীর অঙ্গুরীয় ও উষ্ণীষ প্রেরণ এবং রোসিনারাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব আকস্মিকতার নামান্তর, বিশেষতঃ শিবজীর চরিত্র সে-ভাবে অঙ্কিত নয়। শিবজীর চরিত্র দ্বন্দ্বমুক্ত, ঋজু ও সরল, এবং ঘটনাগুলি একমুখীন ও ক্ষিপ্রগতিযুক্ত বলে শিবজীর ব্যক্তিত্ব অনুদ্ভাসিত, কারণ শিবজীর চরিত্রে প্রেমজনিত সংশয় উৎকণ্ঠা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মানবিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, অবশ্য এ-জন্য লেখকের নির্বাচিত পদ্ধতি মূলত দায়ী। কাহিনীমূলক বা ঘটনা-প্রধান আখ্যান উপন্যাস স্তরে উন্নত হয় নানা ঘটনা ও কাহিনীর জটিল উপস্থাপনায়, এবং ঘটনা ও কাহিনীর জটিল সন্নিপাতে (উপন্যাসের

সূচনা স্তরে) তখনই পাত্র-পাত্রীর প্রাতিস্বিক ও সামাজিক সত্তা এবং পরস্পরের সম্পর্ক তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। "অঙ্গুরীয় বিনিময়" কাহিনীমূলক আখ্যান, এবং এ-গ্রন্থে বহির্ঘটনার আধিপত্য প্রবল, কিন্তু পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক ঘটনা বা কাহিনীর জটিলতায় স্থাপিত নয়, তাই এ-গ্রন্থ উপন্যাসোচিত বিস্তার লাভ করে না লেখকের অতি সংক্ষিপ্ত, প্রায় সারাংশ লেখার মত, ঘটনাবলীর বিবরণ ও ভাষণমূলক ভঙ্গীর জন্য। উপন্যাস স্তরে উন্নত হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল রোসিনারা শিবজীর প্রণয় সম্পর্কটির নানাস্তরের বিশ্লেষণ, বা নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে উপস্থাপিত করা ; এই রীতিতে নায়ক-নায়িকার নতুন সম্পর্ক অঙ্কিত হলে শিবজীর চরিত্র দ্বন্দ্বময় রক্তমাংসের হতো সন্দেহ নেই, শিবজীর চরিত্রে এই দ্বন্দ্বময়তা ঘটনা ও চরিত্রের টানাপোড়নে ঔপন্যাসিক-বিস্তার আনতে পারতো, সেই দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণাদীর্ণ হৃদয়ের আংশিক পরিচয় অবশ্য রোসিনারার চিত্রে লভ্য, কিন্তু সে-চিত্রটিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং ক্ষিপ্র গতিতে লিখিত, তাই অঙ্কিত রোসিনারা উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার অনুপযুক্ত। লেখক অবশ্য আরঙ্জেবের প্রতিহিংসা গ্রহণের চিত্র সংযুক্ত করেন হয়ত কাহিনীতে বৈচিত্র্য আনার জন্যই, কিন্তু সে-প্রচেষ্টাও অতি সংক্ষিপ্ত এবং বর্তমান কাহিনীতে আকস্মিক ঘটনা রূপেই গণ্য, কারণ আরঙ্জেবের এই পরিকল্পনা গ্রহণের কোনও পূর্ব-ভূমিকা গ্রন্থে নেই, অন্তত শিবজীকে হত্যা করার পরিকল্পনার সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণের কোন কার্য-কারণ যোগাযোগ অনুসন্ধান দুষ্কর। অর্থাৎ "অঙ্গুরীয় বিনিময়" গ্রন্থে উপন্যাসের সব ক'টি উৎপাদান ও গুণ বর্তমান থাকলেও লেখকের উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে অতিস্বচ্ছ দৃষ্টির অভাবেই পুস্তকটি উপন্যাস মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়েছে। আর এইখানেই "দুর্গেশনন্দিনী"র সঙ্গে "অঙ্গুরীয় বিনিময়"-এর পার্থক্য।

কেবলমাত্র কাহিনীর আদি অন্ত রচনাই ঔপন্যাসিকের ইতি কর্তব্য নয়, কারণ উপন্যাসের মানুষ একই সঙ্গে সামাজিক ও প্রাতিস্বিক জীব। ফলে ঔপন্যাসিকের উপজীব্য সেই সব মানুষ মানুষী যারা প্রেম ঈর্ষায়, সংশয় উৎকণ্ঠায়, চাতুর্য দুঃসাহসে, সুখ দুঃখে, ঘৃণা ভালোবাসায়, আত্ম-নিবেদন ও আত্মঘোষণায় সজীব ও প্রাণবন্ত। এবং এই মানুষ মানুষী যে গদ্য আখ্যানের উপজীব্য, সে-আখ্যানে বিস্তার ও গভীরতায় জীবন সামগ্র্যই প্রকাশিত নানা আলোছায়ায়। "দুর্গেশনন্দিনী" সেই অর্থে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস। যথার্থ উপন্যাস, কারণ এ-গ্রন্থের পাত্র-পাত্রী প্রাণোত্তাপে চঞ্চল, তাই কাহিনীর সূচনায় পাত্র-পাত্রী সমাপ্তিতে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ না হলেও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্তিত নিশ্চয়ই। একজন অশ্বারোহী যুবার বিষ্ণুপুর থেকে গড় মান্দারণের পথে একাকী গমনে যে কাহিনীর সূত্রপাত, নানা তরঙ্গ বিভঙ্গ উত্থান পতনে সেই কাহিনীর সমাপ্তি আয়েষার গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গ পরিখার জলে নিক্ষেপে। মোগল-পাঠান বিরোধের সূত্রে জগৎ সিংহের বীর সত্তা বিবর্তিত হল প্রেমিক সত্তায়। সেই প্রেমাস্পদ দর্শন অবশেষে নিষ্ঠুর পরিহাসে রূপান্তরিত হয় অতর্কিত পাঠান আক্রমণে। শত্রু-প্রাসাদে আহত রক্তাক্ত জগৎসিংহ শত্রুকন্যার সেবায় ও যত্নে সঞ্জীবিত হন নতুন আবেগে, যে আবেগে অঙ্গীকার রক্ষার ইচ্ছা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কা সমান প্রবল, কারণ আয়েষার নিঃশব্দ শুশ্রূষা নায়কের মনে অস্থিরতা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। জগৎসিংহ সেই সময় বিবর্তনের মুখে, এবং নায়কের চারিত্র্য বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হতে থাকে ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ। নিঃসন্দেহে এ-কাহিনী বৃত্ত রচনায় গল্পের আকর্ষণই মুখ্য, অথচ লেখকের গল্প-নির্মাণের শক্তির অন্যতায় প্লট্ পরিবেশ,

চরিত্র, সংলাপ উপন্যাসের বিশিষ্টরূপে সংহত, এবং ইতিবৃত্তের পাত্র-পাত্রী রাজপুত্র বাদসাহ-কন্যা প্রভৃতির আদলে আধুনিক মানুষেই পরিণত হয় সহজে। কার্যকারণের, সময়ের পর-পূর্বতার সূত্রে, পরপর ঘটনা সংযোজনায় অর্থাৎ প্লটগ্রন্থনে, কাহিনীর উপযুক্ত পরিবেশ নির্বাচনে, কাহিনীর বিভিন্ন স্তরে পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক বিবর্তনে এবং সংলাপের উচ্চাবচে পাত্র-পাত্রীর স্বরূপ প্রকাশে "দুর্গেশনন্দিনী" নানা অপরিণত চিহ্ন ও ত্রুটি যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস।

মোগল-পাঠান বিরোধের পটভূমিকায় উপন্যাসের কাহিনী উপস্থাপিত। জগৎসিংহ নায়ক হলেও প্রথমখণ্ডে কাহিনীর নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক বিমলা। নায়কের সঙ্গে নায়িকা তিলোত্তমার সাক্ষাতের পর নায়ক নায়িকার প্রণয় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে বিমলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তদুপরি গড় মান্দারণে পাঠান সৈন্যের প্রবেশ ও দুর্গজয়ের কারণ বিমলার অনবধানতা, এবং ওই সূত্রে উপন্যাসের প্রতিনায়ক ওসমান ও আয়েষার মঞ্চে আবির্ভাব হয়। অথচ দ্বিতীয় খণ্ডে বিমলা অন্তরালবর্তিনী, প্রায় নেপথ্যবাসী। এর কারণ বিমলার চরিত্রে অনুসন্ধেয়। বিমলা দূতী, দূতীর কাজ নিষ্পন্ন করেই তার ভূমিকার ইতি। নায়ক নায়িকা প্রতিনায়ক বা প্রতিনায়িকার সংযোগ ঘটানোর জন্য এরূপ চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন। অন্যপক্ষে বীরেন্দ্রসিংহ ও অভিরাম স্বামীর আবির্ভাবের পর বিমলা যে মূল কাহিনীর একটি অপরিহার্য চরিত্র নয়—এমন সিদ্ধান্ত যুক্তি গ্রাহ্য, কারণ দ্বিতীয় কাহিনীতেই (বীরেন্দ্রসিংহ কেন্দ্রিক) তার ভূমিকা সক্রিয়, যদিচ বিমলা মূল ও গৌণ কাহিনীর সংযোগী চরিত্র। অবশ্য মূল কাহিনীর সমান্তরালে গৌণ কাহিনী প্রবাহিত না ক'রে

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমখণ্ডের প্রায় সর্বত্র ও দ্বিতীয়খণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে গৌণ কাহিনীকে ঘটনার নিজস্ব নিয়মে সংযুক্ত ক'রে উপন্যাসের গতি অব্যাহত রাখার প্রতি সচেতন ও সজাগ ছিলেন, এজন্য অবশ্য লেখকের কৌতূহল সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষনীয়। নিষ্প্রদীপ মন্দিরে জগৎ সিংহের সঙ্গে অপরিচিত রমনীদ্বয়ের সাক্ষাতের পর বয়োজ্যেষ্ঠার অতিসন্তর্পণে পরিচয় গোপন রাখার ঘটনা থেকেই একের পর এক প্রশ্নে পাঠক কিঞ্চিৎ বিব্রত ও অশেষ কৌতূহলী হয়ে পড়েন। বয়োজ্যেষ্ঠার নবীনার পরিচয় দানে বিলম্ব করা, মানসিংহের নাম শুনে বীরেন্দ্র সিংহের ক্ষিপ্ত হওয়া, নবীনার পরিচয় পেয়ে জগৎ সিংহের দীর্ঘশ্বাস মোচন ইত্যাদি অসংখ্য কেন-র সঙ্গে বীরেন্দ্র বিমলার সম্পর্ক কি, অথবা অভিরাম স্বামীর উক্তির ('পাপীয়সি! নিজ হতভাগ্য বিস্মৃত হও নাই! দূর হও।') তাৎপর্য কি প্রভৃতি বহু কৌতূহল বর্ধক প্রশ্নে পাঠক বিমূঢ় হলেও গল্পের আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণও এইগুলি। অবশেষে জগৎসিংহের নিকট লিখিত বিমলার পত্রে সমস্ত উৎকণ্ঠার নিরসন হলেও, উপন্যাসে পুনরায় নতুন কৌতূহলের সৃষ্টি হয় তিলোত্তমা উদ্ধারের ঘটনায়। এ-কৌতূহল সৃষ্টির কৌশলে পাঠক উপন্যাসের শেষপৃষ্ঠা পর্যন্ত সজাগ ও মনস্ক থাকতে বাধ্য হন। কৌতূহল উদ্রেক রোমান্সের সাধারণ লক্ষণ, এবং ঘটনার ক্ষিপ্রগতি কৌতূহল অটুট রাখার প্রধান সহায়। "দুর্গেশ নন্দিনী" উপন্যাসে একের পর এক দ্রুত ঘটনা সংঘটনের ফলে পাঠকের ঔৎসুক্য হ্রাস না পেয়ে বরং বিবর্ধিত হয় এবং দ্রুত ঘটনা ঘটানোর ফলে লেখক অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা বিশ্বাস্য সম্ভাব্য করে তোলেন। অবিশ্বাস্য ঘটনা বিশ্বাস্য করে তোলা দক্ষ ঔপন্যাসিকের পরিচয়, বঙ্কিমচন্দ্র "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতি সহজে উত্তীর্ণ হয়েছেন

ঘটনার অতিক্ষিপ্র সঞ্চালনে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (পাঠান কর্তৃক গড় মান্দারণ জয়) এমন চকিতে ঘটে যে পাঠক প্রায় বাধ্য শিশুর মত তা বিশ্বাস করেন। প্রথম থেকে দুর্গ জয় পর্যন্ত কাহিনীতে ঘটনার চমক ও ক্ষিপ্রতা সকল বাধা বিপত্তি সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে এত দ্রুত বেগে প্রবাহিত হয় যে পাঠকের মন স্থির করার অবকাশ প্রায় শূন্য, যদিও কিঞ্চিৎ মনঃসংযোগে দ্রুত ঘটনা চালিয়ে লেখকের সুযোগ নেবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়—পাঠান ও মোগল বিরোধের সময় (সে-সময় বীরেন্দ্র পাঠানদের শত্রু) দুর্গের বাইরে প্রহরী নেই, বা দুর্গের নিকটবর্তী অরণ্যে, পথে, শত্রু সৈন্য বা গুপ্তচরের স্বচ্ছন্দ বিচরণের সংবাদ দুর্গাধিপতির অজ্ঞাত বা সে-সংবাদ জ্ঞাত হয়েও দুর্গাধিপতির নিষ্ক্রিয়তা অকল্পনীয় যে-কোনও ক্ষেত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র এমন অসম্ভব ব্যাপার ঘটনার বিপুল আবর্তে প্রবেশ করিয়ে পাঠকদের সংশয় হরণে তৎপর ও যত্নবান হয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি বহুলাংশে সার্থক এবং এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাকে বিশ্বাস্য করা কম কৃতিত্বের নয়, এর ফলে মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় 'লেখক একটা বড় জয়লাভ করেন।' কিন্তু কতলুখাঁর দুর্গে আয়েষা কর্তৃক জগৎসিংহের সেবা শুশ্রূষার কাহিনী অবাস্তব রূপেই গণ্য। "দুর্গেশনন্দিনী" রোমান্স, রোমান্সে অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনার ছড়াছড়ি স্বাভাবিক, কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠিত-তথ্য-বিরুদ্ধ ঘটনা সংস্থাপন রোমান্সের ক্ষেত্রেও ক্ষমার্হ নয়। একজন রাজপুত যুবক কোনও নিয়মে পাঠান অন্দরমহলে স্থান পাওয়ার যোগ্য নন, এমন ঘটনা ইতিহাস সম্মত নয়, তাই দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায় অসুস্থ জগৎসিংহের শয্যাপার্শ্বে আয়েষার অবস্থান বিস্ময়জনক। জগৎসিংহের নিকট লিখিত বিমলার পত্র পাঠ ক'রে পাঠক অবশ্য তেমনই বিমূঢ়

হতে বাধ্য। বিমলার বাল্যজীবনের সঙ্গে ওসমানের বাল্যজীবনের সংযোগ সূত্র এবং সেই সুযোগে জগৎসিংহের নিকট ওসমানের মারফৎ পত্র প্রেরণ প্রভৃতি ঘটনা বিস্ময়-সীমা লঙ্ঘনকারী। এবং পরবর্তী কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারণায় বলা যায়, কতলুখাঁর বন্দী নিবাস থেকে তিলোত্তমা উদ্ধারের জন্য ওসমানের সঙ্গে বিমলার একটি সংযোগের প্রয়োজনেই এই আয়োজন। লেখক সহজ সুযোগ গ্রহণের জন্য এমন আকস্মিক ও অসম্ভব উপায় গ্রহণ করেন ব'লেই সেগুলি অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ে। এ-সব ক্ষেত্রে লেখক ঘটনাগুলির কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ব্যাপারটিকে আরও জটিল ও অবিশ্বাস্য করে তোলেন।

আকস্মিক সুযোগ গ্রহণের আর একটি দৃষ্টান্ত কতলুখাঁর মৃত্যু দৃশ্য। মৃত্যু দৃশ্যটি যথেষ্ট বিশ্বাস্যতায় অঙ্কিত নয়, তদুপরি মৃত্যুর সময় তিলোত্তমার চরিত্র সম্পর্কে কতলুখাঁর প্রশংসাপত্র যেমন আকস্মিক তেমনই অহেতুক। পরবর্তী সময়ে জগৎসিংহ তিলোত্তমা সম্পর্কে সংশয়যুক্ত হয়ে তাকে গ্রহণ করবেন ব'লে লেখকের এ-ব্যবস্থা, অথচ জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার ঘনিষ্ঠতার কথা কতলুখাঁর বিদিত কিনা, সে-বিষয়ে উপন্যাসে কোনও আভাস নেই; ফলে ঘটনাটি এক্ষেত্রে উপন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘনের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য। এমন কি কতলুখাঁর মৃত্যুকালীন উক্তিতে যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় উদ্ঘটিত, তার সঙ্গে কতলুখাঁর পূর্বজীবনের সামঞ্জস্য বিধান দুঃসাধ্য।

ঘটনার প্রতি অধিক মনোযোগের জন্য বঙ্কিম-উপন্যাসে বহুসময় একটি ক্ষুদ্র বা খণ্ড উপাখ্যান (episode) অতি বিস্তৃত হয়। উপন্যাসে মূল কাহিনীকে সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করার জন্য

উপাখ্যান যোজনা সময় সময় সংগত, কিন্তু সে-উপাখ্যান কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত না হলে তা অর্থহীন সংযোজন মাত্র। "দুর্গেশনন্দিনী"-তে তেমন একটি উপাখ্যান দিগ্‌গজ গজপতি ও আশমানির। সিরিয়স নাটকে অনেক সময় ড্রামাটিক-রিলিফ-এর জন্য হালকা লঘুচালের দৃশ্য বা দৃশ্যাংশের প্রয়োজন হয় নাটকের স্বাভাবিক নিয়মে, "দুর্গেশনন্দিনী"-তে তেমন কোনও স্বস্তির প্রয়োজন একান্ত ছিল না, বরং গজপতি-আশমানির উপাখ্যান উপন্যাসের গম্ভীর পরিবেশে রসাভাষ ঘটায়। গজপতি নায়কের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে, তিলোত্তমা সম্পর্কিত গজপতির উক্তিই জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদের কারণ। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিঃসন্দেহে, তাই প্রশ্ন জাগে জগৎসিংহের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে মূর্খ ভাঁড়ের কথা ধ্রুব সত্য ব'লে স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় কোনও প্রমাণের অপেক্ষায় না থেকে প্রতিমা বিসর্জনে উদ্যত হওয়া সংগত কিনা? গজপতির কথা বিনাদ্বিধায় বিশ্বাস করার জন্য জগৎ সিংহ সম্পর্কে পাঠকের এ-তাবৎ লালিত ধারণা প্রায় বিপর্যস্ত হতে বাধ্য, এবং নায়কের প্রেমের গভীরতা সম্পর্কে পাঠকের সংশয় জাগাও ন্যায্য। এর পর অতি অনায়াসে প্রতিমা বিসর্জনে জগৎসিংহের প্রয়াস আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতুককরই ঠেকে। ফলে গজপতির এমন উক্তি ও সেই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নায়কের মানসিক পরিবর্তন উপন্যাসের উৎকর্ষতা লাভের পথে অন্তরায় রূপেই বিবেচ্য এবং দক্ষ ঔপন্যাসিকের পক্ষে এমন উপাখ্যান সংযোজন অপরিপক্ব-তার পরিচায়ক।

"দুর্গেশনন্দিনী" প্রথমপুরুষে রচিত উপন্যাস, ঔপন্যাসিক প্রায় সর্বত্র পথ- প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য উপন্যাসটি প্রায়ই

বিবৃতি মূলক। অবশ্য সংলাপ ও সংস্থানের মাধ্যমে সম্যক চরিত্র স্ফুরণ সর্বদা না ঘটলেও, মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও দৃশ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে লেখক পারদর্শী হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসের মত এ-উপন্যাসেও একজন মহাপুরুষ আছেন, সেই মহাপুরুষের গণনা দ্বারা উপন্যাসের ঘটনাবলী ঈষৎ পরিচালিত হয়েছে। দৈব এবং নিয়তির প্রতি বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত বঙ্কিম-উপন্যাসে সুপ্রচুর, কিন্তু গ্রীক নাটকের নিয়তি যেমন মানুষের বাইরের একটি শক্তি হয়েও নায়কের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি, "দুর্গেশনন্দিনী"-তে অদৃষ্টবাদ তেমন ওতপ্রোত নয়, কৃত্রিম উপায়ে আরোপিত। ঔপন্যাসিক এ-সম্বন্ধে সচেতন হলে নাটকীয়তা স্বাভাবিক হতো নিঃসন্দেহে, অথচ শেকসপিঅর প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র গ্রীক-ট্র্যাজেডি ও শেকসপিঅর-ট্র্যাজেডির মূল প্রভেদ একাকার ক'রে ফেলায় উপন্যাসে সেই তীক্ষ্ণ নাটকীয়তা আনতে অক্ষম এবং বিপন্ন হয়েছেন, যেজন্য উপন্যাসে নাটকীয় মুহূর্তগুলি অতিনাটকীয়, যেমন—আয়েষার প্রণয় নিবেদনের মুহূর্ত, ওসমান ও জগৎসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্য। আয়েষার প্রণয় জ্ঞাপন অতি আকস্মিক এবং ওসমানের আবির্ভাবের পূর্বে আয়েষার প্রণয় উন্মেষের কোনও লক্ষণ উপন্যাসে দৃষ্ট নয়, তাই আয়েষার উক্তি ("এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর") ওসমানের মত আমাদেরও স্বপ্নের অগোচর। ওসমান চরিত্রে যে ঔদার্য, মার্জিত রুচির পরিচয় প্রকাশিত, দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্যে সে ওসমানের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। ঈর্ষার অনলে পুড়লেও ওসমানের মত চরিত্রের পক্ষে এমন বর্বরোচিত আচরণ অসম্ভব বলেই মনে হয়।

এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও "দুর্গেশনন্দিনী" গ্রন্থে উপন্যাসের প্রতিটি অঙ্গের মধ্যে নিগূঢ় ঐক্য বর্তমান, সেজন্য প্লট গ্রন্থন বা চরিত্র

চিত্রণে বহু অপরিণতির চিহ্ন লক্ষিত হলেও গ্রন্থের কাঠামো অবশেষে উপন্যাসের বিশিষ্ট রূপেই সংহত। ইতিবৃত্তমূলক কাহিনীর আশ্রয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রক্তাক্ত হৃদ চিত্ত প্রকাশিত করলেন "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে, সেদিক থেকে "দুর্গেশনন্দিনী" বাংলা সাহিত্যের একটি যুগান্তরকারী ঘটনা ; রমেশচন্দ্র দত্তর ভাষায় "Nothing so bold and original had been attempted in Bengali prose, nothing so powerful, and so life-like had been executed in Bengali fiction."—(Cultural Heritage of Bengal, p. 145)।

খ. ঔপন্যাসিক ও নীতিবিদের দ্বন্দ্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভা দ্বিতীয় উপন্যাস "কপাল কুণ্ডলা"-য় "দুর্গেশনন্দিনী"র প্রায় সমস্ত ত্রুটি দুর্বলতা অতি অনায়াসে মোচন ক'রে আত্মবিশ্বাস ও স্বকীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত। কাহিনীর সময় আড়াই শত বৎসর পূর্বের হ'লেও তথাকথিত ইতিহাসের কোলাহল বর্তমান উপন্যাসে প্রায় অশ্রুত, মতিবিবির অতীত জীবনের ঘটনাবলীতে যে ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল লভ্য, সমগ্র উপন্যাসের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। "দুর্গেশনন্দিনী"-র অজস্র অস্ত্রের ঝনন ও রোমান্টিক প্রেমের সুলভ আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে লেখক "কপালকুণ্ডলা"-য় এমন এক প্রতিবেশ রচনায় মনোযোগী ছিলেন, যা নবীন ঔপন্যাসিকের কল্পনাশক্তির ও দুঃসাহসের পরিচয়। লেখক এ-উপন্যাসে যে-সমস্যায় আলোড়িত, সে-সমস্যার উদ্ভব আমাদের বাস্তব জীবনেই, অথচ লেখকের কল্পনা-শক্তি ন্যূন হলে উপন্যাসের ঘটনাবর্তে ও চরিত্রের সম্বন্ধপাতে তার সঠিক রূপায়ণ অসাধ্য হতো নিশ্চয়ই।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস সে-কারণে বারংবার ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার যোগ্য।

সামঞ্জস্য স্থাপনের সমস্যা উপন্যাসের মূল সমস্যা, এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র কপালকুণ্ডলার মাধ্যমে সমস্যাটি রূপায়ণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। বিজন সমুদ্রতীর, বিশাল আকাশ ও নির্জনবনভূমির পরিমণ্ডলে আশৈশব বর্ধিত কপালকুণ্ডলা সমাজ-উদ্যানে প্রবিষ্ট হয়েছে নবকুমারের সঙ্গে আকস্মিক বিবাহ সূত্রে, সেজন্য সংসারানভিজ্ঞার হৃদয়দীর্ণ সংসার-পটে নিজেকে সুসংলগ্ন স্থাপনের অবিরত প্রয়াসে। প্রথম খণ্ডে উপন্যাসের স্থান নির্বাচন, ঘটনা সংস্থাপন, এমন কি নায়িকার রূপলাবণ্য বর্ণনায় অসাধারণত্বের প্রলেপ এবং ভাষায় কাব্যিক স্পর্শ সমাজ ও স্বজনচ্যুত বিশিষ্ট পরিবেশরই উপযুক্ত, যে-পরিবেশে সংসারী নবকুমার দুর্ঘটনায় পতিত ও কপালকুণ্ডলা আশৈশব বর্ধিত। পরিবেশের প্রভাবে কপালকুণ্ডলা চরিত্রে অপাপবিদ্ধ সরলতা ও মাধুর্য সম্পৃক্ত। নির্দ্বিধায় মতিবিবির অলঙ্কার গ্রহণ ও ভিক্ষুককে সমুদয় দানের মধ্যে নায়িকার সংসার-জ্ঞানের অভাব প্রকট, তাই অলঙ্কার প্রাপ্তির পর ভিক্ষুকের পলায়ন তার কাছে বিস্ময়জনক, এমন বিস্ময় কপালকুণ্ডলার পক্ষে স্বাভাবিক-ই। এই বিস্ময় কপালকুণ্ডলার সাংসারিক জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা, কিন্তু এমন বহু অভিজ্ঞতাময় সংসার-জীবনে প্রবেশ করেও কপালকুণ্ডলা অপরিবর্তিত থাকে, সামাজিক জীবনে অবতীর্ণ হয়েও সে পূর্ব জীবনের প্রত্যাশী, শ্যামা-সুন্দরীর প্রশ্নের উত্তরে "সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে সুখ জন্মে" উক্তিটি তার সাক্ষ্য। বলা বাহুল্য এমন উক্তি সংসার বীতরাগেরই স্মারক, অন্তত এ উক্তিতে নায়িকার সংসারের প্রতি অনুরাগের চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য লেখক নায়িকার সমীকরণ প্রচেষ্টার চিত্র উহ্য রেখে শ্যামার সঙ্গে কথোপকথনে এই বীতরাগের

চিত্র তুলে ধরেন। তাই পূর্বজীবনের মোহে সংসার জীবনে ছিন্নমূল আসক্তিহীন কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার ভিক্ষার উত্তরে নবকুমার ও পদ্মাবতীর জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে এতটুকু কুণ্ঠিত নয়। অর্থাৎ সামঞ্জস্য স্থাপনের অক্ষমতায় নায়িকার ট্র্যাজিডি বর্ণনা ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু। এই চিত্রের বৈপরীত্যে মতিবিবির সংসার ও বাস্তব জগতের অতিশয় প্রীতির চিত্র স্থাপিত। কপালকুণ্ডলার বিপরীত কোটির চরিত্র মতিবিবির ভোগবিলাস, কামনা-বাসনার প্রতি উৎকট অনুরাগ প্রভৃতি বর্ণনায় ঔপন্যাসিক সংসারের নগ্নতা প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার সমস্যা অতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ না ক'রে মাত্র কয়েকটি সংলাপে একস্থানে পূর্বস্মৃতি জাগরণের মধ্যে নায়িকা সমাজ-জীবনে অসন্নিবদ্ধ—এমন চিত্র অকাট্য করার পক্ষপাতী ছিলেন, তাই লেখকের বর্ণনাই আমাদের এ চিত্র বিশ্বাস করার একমাত্র আশ্রয়ভূমি। এ-বর্ণনা অন্যভাবে বিশ্বাস করানোর জন্যই মতিবিবির কাহিনী তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিল এবং মতিবিবির পূর্বজীবনের পরিচয় দানের অজুহাতে কপাল-কুণ্ডলার সামঞ্জস্য স্থাপনের চিত্রটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না করে যেন নায়িকার অক্ষমতাই স্বাভাবিক—এমন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন। সেজন্য মতিবিবির পূর্বজীবনের কাহিনী অতি বিস্তৃত, এই অতি-বিস্তার উপন্যাসের পক্ষে ক্ষতিকর নিঃসন্দেহে, কারণ উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার বিবর্তনের আলেখ্যই প্রধান। কিন্তু কপালকুণ্ডলার জীবনে সংস্কারের অমোঘ প্রভাবের বিষয়টি সমধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে পরবর্তী সময় (চতুর্থখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে) কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন অবলোকনের পর ধর্ম-বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাস উত্থিত অমূলক সংস্কারের বিজয়-ই মূল সমস্যার স্থলাভিষিক্ত হয়, যদিও এ-সংস্কারের ইঙ্গিত উপন্যাসের প্রথমখণ্ডেও লভ্য, যেখানে কপাল-

কুণ্ডলা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানার ইচ্ছায় দেবীপদে বিল্বপত্র অর্পণ করে। শ্যামার সঙ্গে কথোপকথনে স্খলিত বিল্বপত্রের ঘটনাটি উল্লেখে কপালকুণ্ডলার জীবনে বিধি নির্দেশ লঙ্ঘনের পাপবোধ স্পষ্ট প্রতিভাত। অন্যদিকে "যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না" উক্তিতে সংসার বীতরাগের যে চিহ্ন বর্তমান, তার ফলেই হয়ত কপালকুণ্ডলা সংস্কারের নিকট আত্মসমর্পিতা, অথবা বিধি লিপি লঙ্ঘনের পাপের জন্য সে সর্বদা শংকিত ও ভীত। অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনে স্বপ্ন, দৈববিশ্বাস, অমূল প্রত্যক্ষ অন্যান্য উপন্যাসের মত অলঙ্কারাত্মক আরোপিত বস্তু নয়, নায়িকার জীবনে রক্তমাংসের মত সজীব। কিন্তু বনচরের সংসার জীবনে সামঞ্জস্য স্থাপন ও প্রাক্তন সংস্কারের বিজয় সমস্যা তুটি সার্থক রূপায়ণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শেষ অবধি সমান মনস্ক না থাকায় সমস্যা তু'টি একই সমস্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ না হয়ে তুইটি বিযুক্ত সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাই গ্রন্থের মূল সমস্যা উপন্যাসের শেষে স্থানচ্যুত, সেজন্য উপন্যাসের মৌল সৌন্দর্য শেষ তুইপরিচ্ছেদে বিঘ্নিত ও অতি নাটকীয়তায় পর্যবসিত।

নবকুমার সঙ্গিগণ কর্তৃক বিজনবনে পরিত্যক্ত হওয়ার পর থেকে মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্যন্ত, এবং লুৎফ-উন্নিসার সপ্তগ্রাম আগমন থেকে শেষ পরিচ্ছেদ ('প্রেতভূমে') ঘটনাবহুল অধ্যায়। উপন্যাসের সূচনা থেকে নবকুমার মতিবিবির সাক্ষাৎকার পর্যন্ত কাহিনী অবিচ্ছিন্ন ধারায় ক্ষিপ্র বেগে প্রবাহিত, উপন্যাসের এই অধ্যায়ে পূর্বঘটনার মর্মস্থল থেকে পরবর্তী ঘটনার উৎসারণ হওয়ায় এবং কাহিনীর সময় সীমা অতি স্বল্পদিনে নিবদ্ধ থাকায় কাহিনী একমুখীন ও নাটকীয় লক্ষণযুক্ত। এই অধ্যায়ের প্রথমে এবং প্রায় শেষে ঔপন্যাসিক তু'টি অতর্কিত ঘটনার (অকস্মাৎ নদীতে

জোয়ার আসা, এবং দস্যু হস্তে মতিবিবির লাঞ্ছনা) সুযোগে নায়িকা এবং প্রতি নায়িকার সঙ্গে নায়ক নবকুমারের সংযোগ ঘটান, এবং এই চমকের মধ্যবর্তী সময় নায়ক-নায়িকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ও ঘটনার মধ্যে অনিশ্চয়তা থাকে ব'লে প্রাকৃতিক পটভূমিকায় নির্বাচিত স্থিতিগুলি (Situation) তে কাব্যিক কল্পনার মর্মে মর্মে নাটকীয়তা স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে পড়ে। হয়ত ঔপন্যাসিক এ অধ্যায়ে বহুলাংশে নৈর্ব্যক্তিক ব'লে এ অঘটন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু "প্রদীপ নিবিয়া গেল"-র সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের কাব্যকল্পনা নাট্যরস বিপর্যস্ত হয়েছে, এবং সম্পূর্ণ একটি অন্য কাহিনী সংযোজনায় (মতিবিবি উপাখ্যান) কাহিনীর একমুখীনতা ব্যাহত, কারণ মতিবিবির উচ্চাশা আকাঙ্ক্ষা ও পরিশেষে ব্যর্থতার পল্লবিত বিবরণ উপন্যাসের পক্ষে অনাবশ্যক, বিশেষতঃ যে উপন্যাসের সূচনায় কাব্য ও নাটক হর-পার্বতীর মত অবিচ্ছেদ্য। মতিবিবির সপ্তগ্রাম আগমন উপন্যাসের শেষ অধ্যায় (তৃতীয়খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত) ও পরিণতির জন্য প্রয়োজন, যেহেতু প্রথম অধ্যায়ে মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎকার-ই নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার জীবনে সংকট রূপে-সূচিত হয়েছে। কিন্তু মাত্র এই অজুহাতে কাহিনীর ঋজুভঙ্গী ও অবিসর্পিত গতি ব্যাহত করা উপন্যাসের পক্ষে ক্ষতিকর; কারণ সেলিম, মেহেরউন্নিসা বা সেলিমের পরিবর্তে খস্রুকে সিংহাসনে বসানোর চক্রান্ত প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ মুল বা গৌণ কোনও সমস্যা রূপায়ণেরই সহায়ক নয়, বরং এই ঘটনাগুলি কাহিনীর ভারসম্য ও লক্ষ নষ্ট করেছে নিঃসন্দেহে। তাছাড়া ঐতিহাসিক পরিবেষ্টন গতানুগতিক ও প্রথাসিদ্ধ, যেজন্য অনৈতিহাসিক অংশের মায়াময় অনুপম প্রতিবেশের পাশে এ-চিত্র অতি ম্লান, বর্ণহীন, বিশেষত্ব বর্জিত। উভয় পরিবেশ উভয়ের সম্পূরক হয়নি ব'লে ইতিহাসের

অনুপ্রবেশ ঈপ্সিত ফল বর্তায় নি। অন্যদিকে মতিবিবির রাজধানীর বিলাস কলা-কুতূহল পরিত্যাগও মতিবিবির পূর্বজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাস্য নয়। নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রাক্তন স্বামীর প্রতি আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার হেতু সম্পর্কে ঔপন্যাসিক নীরব, মতিবিবির সংলাপে স্বামীপ্রেম উচ্ছ্বসিত হলেও মতিবিবির কারণহীন মানসিক পরিবর্তন পাঠকের নিকট বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্ন। কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজিডির জন্য মতিবিবির প্রয়োজন, সেজন্য লেখক অবলীলাক্রমে লুৎফ-উন্নিসাকে যেন তেন প্রকারে সপ্তগ্রামে উপনীত ক'রে কাপালিকের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটান। সপ্তগ্রামে কাপালিকের আবির্ভাব, মতিবিবির আগমন, উভয়ের সংযোগ ও ষড়যন্ত্র—ঘটনাগুলি চমকপ্রদ আকস্মিক, আর পর পর এই অঘটন ঘটানোর জন্য অতর্কিত চমকের পর চমকে কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজিডি ত্বরান্বিত হয় অতি-নাটকীয়ত্বে। মাত্র দুই দিনে (চতুর্থখণ্ডের সময় সীমা) এতগুলি আকস্মিক যোগাযোগ ও ঘটনা অতিনাটকীয়তার সহায়ক। তাই এই অধ্যায়ে কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজিডির জন্য দায়ী সংসার নয়, নবকুমার নয়, দায়ী তার স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination)। "তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা-প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পর প্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জনে তদ্রূপ।" তাই স্বপ্নে প্রদত্ত ভৈরবীর নির্দেশ সে মানতে বাধ্য, সেজন্য আকাশমণ্ডলে নবনীরদ নিন্দিত মূর্তি দেখার মতিভ্রম তার কাছে সত্য ও সর্বসংশয়হর। ফলে এমন নায়িকার পরিণতিতে অতিনাটকীয় বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা স্বাভাবিক। নায়িকার অন্তরস্থিত ট্র্যাজিডির বীজ যখন অঙ্কুরের পথে, তখন বহির্ঘটনার প্রবল চাপে সেই অঙ্কুর বিনষ্ট হয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যে পরিস্থিতিতে কপালকুণ্ডলা

অসহায়, এবং সেজন্য কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজিডি অবশেষে প্যাথেটিকে পরিণত হয়েছে। কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজিডি ব্যক্তিগত, যা সামঞ্জস্য স্থাপনের অক্ষমতায় প্রকট, অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ভবিতব্য, রহস্যময়ীর শক্তি লীলার মাহাত্ম্য ও বিজয় ঘোষণায় তৎপর হয়ে সেই বিশুদ্ধরস ভঙ্গ করেন, লেখকের এই বিশুদ্ধরস সম্পর্কে সচেনতার প্রমাণ—লুৎফ-উন্নিসার কাতর প্রার্থনায় "কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তাকরিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "* * * আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" " কপালকুণ্ডলার হাহাকার শূন্যতায় উপন্যাসটি সমাপ্ত হলে শেষ দুই দৃশ্যের অতি-নাটকীয়তা পরিহার করা সম্ভব ছিল ও উপন্যাসের মূল সমস্যা কপালকুণ্ডলার মাধ্যমে উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ এবং সেই তীক্ষ্ণতায় নায়িকার জীবনে সংস্কারের প্রভাবও প্রকাশিত হতো নিঃসন্দেহে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার অন্তর-জীবনের চিত্র অবহেলিত ব'লে চতুর্থখণ্ডে চমকের পর চমক লেখকের একমাত্র অবলম্বন হয়, যে জন্য উপন্যাসটির অকৃত্রিম সৌন্দর্য শেষ কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিপর্যস্ত, এজন্য অবশ্য তাঁর নির্বাচিত-পদ্ধতি অনেকাংশে দায়ী, কারণ বিধিলিপি লঙ্ঘন জনিত পাপবোধ এবং বনচর জীবনের জন্য হাহাকার প্রকৃত পক্ষে অন্তরেরই সমস্যা।

"কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে দুটি প্রতিবেশ (একটি সভ্যতার প্রায় স্পর্শবর্জিত বিবিক্ত সমাজ, অন্যটি সপ্তগ্রামের পারিবারিক বেষ্টন) রচনা করে ঔপন্যাসিক কেন্দ্রীয় চরিত্র কপালকুণ্ডলাকে প্রকৃতি ও নির্জনতার আবেষ্টন থেকে ছিন্ন ক'রে পারিবারিক জীবনে সন্ন্যস্ত

করেন। নায়িকার পূর্বজীবন ও বিবাহের পরের পরিবেশ কখনো সদৃশ নয়, পরন্তু উভয়ের মধ্যে মেরুপ্রায় ব্যবধান বর্তমান, ফলে নায়িকা নতুন পরিবেশে প্রবেশ করে কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হতে বাধ্য। তদুপরি নতুন পরিবেশ যথেচ্ছ বিহার, অবাধ স্বাধীনতার পরিপন্থী, সেজন্য কপালকুণ্ডলা যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হবে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াসে, এবং তা স্বাভাবিক। আর এমন যন্ত্রণাক্ষুব্ধ জীবন চিত্রণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো সম্ভব। ঔপন্যাসিক এ-রীতি অনুসরণ করেন না ব'লে কপালকুণ্ডলার সামাজিক রীতিনীতির শৃঙ্খলে আলোড়িত হওয়ার চিত্র উহ্য থাকে, মাত্র কয়েকটি সংলাপে বা পূর্বস্মৃতি জাগরণে কপালকুণ্ডলা সংসারজীবনে সমূল প্রোথিত নয় —এ সংবাদ পাঠকের কাছে যথেষ্ট নয়। এই চিত্র উহ্য থাকে ব'লেই মনে হয় কপালকুণ্ডলা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টায় নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল। নায়িকা চরিত্রের এবম্বিধ নিশ্চলতা নিশ্চেষ্টতা নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না, কারণ তদ্রূপ অভিপ্রায়ে দুটি পরিবেশ নির্বাচনের তাৎপর্য-ই অর্থহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নায়িকার জীবনে সংস্কারের প্রভাব ও বিধিনির্দেশ লঙ্ঘনজনিত গ্লানিবোধ আত্যন্তিক, সেজন্য অদৃষ্টবাদ অনায়াসে নায়িকার জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়। মানুষ অদৃষ্ট ও নিয়তির কাছে অসহায়, উপন্যাসে প্রায় তেমন সিদ্ধান্তই রচিত। কিন্তু এই সংস্কার বা অদৃষ্টবাদ উপন্যাসে কার্যকারী করতে হলে নায়িকার জীবনের দ্বন্দ্বমথিত চিত্রের বর্ণনা প্রয়োজন, অন্তত সংসারের প্রতিকূল প্রতিবেশে ছিন্নমূল কপালকুণ্ডলার অসহায়তা ও সেই অসহায়তার জন্য দৈবে আত্মসমর্পণ ঘটনার সাহায্যে দেখানো উচিত ছিল, নচেৎ আলেখ্যটি যথেষ্ট বিশ্বাস্য ও বাস্তব হয় না।

"কপালকুণ্ডলা" ঘটনা-প্রধান উপন্যাস, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে সংঘটিত বহুঘটনার কারণ বা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টায় সম্পূর্ণ নীরব, আবার আন্তর সমস্যা রূপায়ণের জন্য মানস চিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অনুৎসাহী, অথচ দু-একটি বিরল ইঙ্গিতে কখনো কদাচ সংলাপে বা পরিবেশের অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনায় একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় অতি অনায়াসে. এমনকি মতিবিবির অনাবশ্যক কাহিনী সত্ত্বেও। এবং এইখানে সমালোচক বিমূঢ় হতে বাধ্য। তবে কি "কপালকুণ্ডলা" প্রতীক উপন্যাস ? প্রতীকের মধ্যে আপাত বাস্তবাতীত ব্যঞ্জনার যে সুর আবহ সঙ্গীতের মত ক্রিয়াশীল, অন্তত নায়িকার আলেখ্যে সে-স্পর্শ অনুভূত। কপালকুণ্ডলার মত বিমূর্ত চরিত্র ইহলোকে অবর্তমান, অথচ মানুষের কল্পনায় এমন মানবী-ই কাঙ্ক্ষিত, ঈপ্সিত ; সেদিক থেকে কপালকুণ্ডলা মূর্তিমতী সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কাঙ্ক্ষিত হলেও বন্দিনী নয়। সে প্রকৃতির মত মুক্ত ও স্বাধীন, কপালকুণ্ডলার আত্মবিসর্জন ইচ্ছাতেও সেই ভাবপ্রকট। অথচ এই চরিত্রে বিধি বিড়ম্বনার গ্লানি থাকার ফলে চরিত্রটির প্রতীকী ব্যঞ্জনা ঈষৎ বিঘ্নিত, এবং সৌন্দর্যের প্রতীক কপালকুণ্ডলার জীবনে শেষ অবধি সংস্কারের অমোঘ প্রভাবই জয়ী হয়েছে, উপন্যাসের চতুর্থখণ্ডের ঘটনা সংযোজনায় নায়িকার জীবনে বিধিলিপি লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্তের চিত্র অঙ্কনই বঙ্কিমের কাছে প্রধান ছিল। সেজন্য "কপালকুণ্ডলা"-কে প্রতীক উপন্যাস বলা দুঃসাধ্য। অন্যদিকে লেখক উপন্যাসের প্রতীকত্ব সম্বন্ধে যে সচেতন ছিলেন না, তার প্রমাণ দেবীর পাদ-পদ্মে অভিন্ন বিল্বপত্র স্থাপনের ঘটনা। বিবাহে দেবীর আপত্তি নেই, অথচ সেই দেবী-ই নায়িকার পতিগৃহ যাত্রা নামঞ্জুর করার মধ্যে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা প্রতিফলিত, এবং এইখানে উপন্যাসের মূল দুর্বলতা,

যারজন্যে কপালকুণ্ডলার প্রতীকী ব্যঞ্জনা বিঘ্নিত এবং সাধারণ নারীর মতই কপালকুণ্ডলার জীবনে অমোঘ সংস্কারই বিজয়ী হয়। এই ঘটনায় মনে হয় উপন্যাসের কাহিনী একটি পূর্বনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী রচিত. যে ছকের শর্ত পূরণের জন্য আখ্যানের কার্য-কারণের সূত্র ঔপন্যাসিক নিয়মানুসারে অনুসৃত নয়।

এমনকি লেখক চরিত্রের পূর্বচিত্র সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে স্বীয় প্রয়োজনে চরিত্রগুলির মধ্যে যে রূপান্তর ঘটান তা সামঞ্জস্যহীন, অবিশ্বাস্য। কাপালিকের চরিত্রে প্রথমদিকের নির্মমতা নিষ্ঠুরতার অন্তঃস্থলে দৃঢ়তা ও পৌরুষের পরিচয় শেষ অধ্যায়ের কাপালিকের মধ্যে সন্ধান পণ্ডশ্রম। প্রথম অধ্যায়ের কাপালিক ভয় ও ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার পাত্র, শেষ অধ্যায়ের কাপালিক কৃপা ও করুণার যোগ্য। মতিবিবির চরিত্রও তেমন স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। অর্থাৎ লেখকের স্বীয় বক্তব্য রূপায়ণের অবাধ ইচ্ছাই এমন বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী, সেজন্য বহু ঘটনা ও সংস্থানের আকস্মিকতা, অসম্ভাব্যতা, অযৌক্তিকতা তাঁর কাছে স্বাভাবিক এবং বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য তুল্যমূল্য ও একাকার।

তবু প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা ও ব্যবহারে, প্রকৃতি ও কপালকুণ্ডলার সাযুজ্য স্থাপনে বঙ্কিম-প্রতিভা দুঃসাহসিক, কারণ কপালকুণ্ডলার মত একটি বিমূর্ত নারীর (কপালকুণ্ডলা বিজনবনে পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিপালিত, ফলে সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা, যৌন চেতনা রহিত, বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ) বাস্তবিক চরিত্র চিত্রণ দক্ষ উপন্যাসকারেরও বহু আয়াস সাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র অসাধ্য সাধনে উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রকৃতি বর্ণনার অসাধারণত্ব ও কাব্যিক কল্পনার সংযোগে, এবং কপালকুণ্ডলা যে প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সে-বিবরণ উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে প্রসারিত। ফলে পাঠক কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বাস্তবতা

সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থাপনার গুণে। প্রথম অধ্যায়ের নাটকীয়তা সৃষ্টিতে এবং সমস্যার গভীরতর রূপায়ণের চেষ্টায় বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্ফূরণ বাংলা উপন্যাসের অপরিসর ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক। উপন্যাসটি নানা ত্রুটি সত্ত্বেও পাঠকমনে এক অপূর্ব দ্যোতনা ও পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, সেই সামগ্রিক আবহাওয়াটি একই সঙ্গে বিশিষ্ট এবং সামান্য, এবং "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসের বারংবার ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা তাই এত প্রয়োজনীয়।

"মৃণালিনী" বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যর্থতার স্বাক্ষর, তথাপি উপন্যাসটির বক্তব্য বঙ্কিম-উপন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরবর্তী কয়েকটি উপন্যাসে যে স্বদেশ-প্রেম বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত, সেই বিষয়বস্তু বীজাকারে "মৃণালিনী"-তে নিহিত ছিল। অনেকের মতে "আনন্দমঠ"-এর স্বদেশানুরাগের উৎস "মৃণালিনী"। কিন্তু বক্ষ্যমাণ উপন্যাসে বক্তব্য রূপায়ণের জন্য যে রঙ্গস্থলী ও ইতিহাসের ঘটনা নির্বাচিত—তা অতি অকিঞ্চিৎকর এবং মূল আখ্যায়িকার নায়ক যদিও স্বদেশ রক্ষার জন্য নবদ্বীপে মাধবাচার্য কর্তৃক আনীত, কিন্তু সে কার্যোদ্ধারের সময় নিষ্ক্রিয় এবং তার আচার আচরণের মধ্যে মৃণালিনীর জন্য উৎকণ্ঠাই প্রবল ছিল। যে মাধবাচার্য বহুদেশ পর্যটনে যবনবিরোধী শক্তি সংগঠনে এত উৎসাহী, সেই মাধবাচার্যও নবদ্বীপ পতনের সময় অকুস্থলে অনুপস্থিত, এবং মাত্র সপ্তদশ যবনসেনা কর্তৃক রাজধানী অধিকার করার ঘটনায় মাধবাচার্যের শক্তি সংগ্রহের ব্যর্থতা প্রমাণিত, অথচ লেখক শক্তি সংগ্রহের ব্যাপারে মাধবাচার্যের আংশিক সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন, যদিও সেই সংগৃহীত আংশিক শক্তি-ও নবদ্বীপ পতনের সময় নিষ্ক্রিয়। আসলে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট গ্রন্থের সর্বদেহে প্রসারিত নয়, তাই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব মূল বা গৌণ উভয় কাহিনীতে প্রায় শূন্য।

হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেমোপাখ্যান উপন্যাসের মূল উপজীব্য। অবশ্য এ-কাহিনী কিঞ্চিৎ আবর্তসঙ্কুল মাধবাচার্যের জন্য, কারণ মাধবাচার্যের জন্যই নায়ক-নায়িকার সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে, অথচ যেজন্য এ বিচ্ছেদ সেই কার্যে প্রতিশ্রুত হেমচন্দ্র উদাসীন ও নির্বিকার, যদিও নবদ্বীপ আগমনের প্রথমদিকে তুরক অনুসন্ধানে সে কিঞ্চিৎ তৎপর ছিল। কিন্তু নবদ্বীপেও হেমচন্দ্রর জীবন মৃণালিনীময়, ফলে ইতিহাস অংশ বিযুক্ত করে নিলে কাহিনীর কোন ক্ষতি হয় না। অন্যদিকে পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র নেহাৎ যান্ত্রিকভাবেই উপস্থাপিত। মনোরমার প্রতি পশুপতির আকর্ষণ ও মনোরমার জন্য স্বীয় অশুভ বাসনা ত্যাগের ইচ্ছা যান্ত্রিকরূপেই অঙ্কিত, নচেৎ পশুপতির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসের একটি উৎকৃষ্ট বিষয় হয়ে উঠতে পারতো। গৌণ কাহিনীর (পশুপতি-মনোরমা উপাখ্যান) সঙ্গে মূল কাহিনীর যোগসূত্র অতিক্ষীণ, তাই গৌণকাহিনী উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ। দুটি কাহিনী যে ঐতিহাসিক পটে সংযুক্ত সেই পরিপ্রেক্ষিতও উপন্যাসে সঠিক ব্যবহৃত নয়, সেজন্য উপন্যাসের প্লটে সংহতির অভাব পরিলক্ষিত, আর এই সংহতির অভাবের জন্যই "মৃণালিনী" সফল উপন্যাস নয়।

"বিষবৃক্ষ" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু এ উপন্যাসেও অলৌকিকতার স্পর্শ বর্তমান। উপন্যাসের প্রারম্ভে কুন্দর স্বপ্নদর্শন (তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ছায়া পূর্বগামিনী) অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টির পরিপোষক, কুন্দর ভবিষ্যৎ-জীবন সেই স্বপ্নদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ ও নারী-ই (নগেন্দ্র ও হীরা) নায়িকার দুঃখময় পরিণতির নিয়ামক শক্তি এবং কুন্দর ট্র্যাজিডি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্য করার জন্যই যেন রচিত হয়। অথচ স্বপ্নানুযায়ী কুন্দর জীবন রূপায়িত হলেও সংঘটিত ঘটনা বা যোগাযোগগুলি

উপন্যাসের নিজস্ব নিয়মে উত্থিত, কুন্দর চলমান জীবনের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট। উপন্যাস পাঠকালে তাই স্বপ্নবৃত্তান্ত বিস্মৃত হওয়া পাঠকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ স্বপ্নটি কুন্দ-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য নয়, স্বপ্নবৃত্তান্ত অনুক্ত থাকলেও বিবৃত ঘটনাবলীর মধ্যে কুন্দর ট্র্যাজিক সমাপ্তি দেখানো সম্ভব ছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র নানা ঘটনার সংস্থানে সে-বিষয়ে দক্ষ ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। অন্যপক্ষে কাহিনীর ক্রমবিকাশে বা কুন্দর নিজের জীবনে স্বপ্নের প্রভাব শূন্য, একমাত্র অপ্রাকৃত প্রতিবেশ সৃষ্টি ব্যতীত স্বপ্নের দ্বিতীয় তাৎপর্য নেই, আর "বিষবৃক্ষ"-এ সেই প্রতিবেশ সৃষ্টি নিরর্থক, কারণ তা কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন নিরালম্ব স্বয়ম্ভু। অবশ্য কুন্দর দ্বিতীয় স্বপ্নদর্শন প্রথম স্বপ্নের অনুবৃত্তি—এই যুক্তির সাহায্যে প্রথম স্বপ্নের প্রভাব কুন্দর জীবনে সমধিক—এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক কিনা বিচার্য নিঃসন্দেহে। দ্বিতীয় স্বপ্নটি কুন্দনন্দিনীর জীবনে এমন সময় উপস্থাপিত যখন কুন্দ সহ্যের শেষসীমায় উপনীত। আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হ'য়ে কুন্দ তখন নিজের মৃত্যু কামনায় অধীর, অসহায় নারী বাঁচার পথ আবিষ্কারে অক্ষম, সেইসময় স্বপ্নটি তাই তেমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। বরং দ্বিতীয় স্বপ্নটি কুন্দর দ্বন্দ্বমথিত জীবন থেকে উত্থিত ব'লে এমন স্বপ্নদর্শন যে-কোনও মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ও সম্ভব। প্রথম স্বপ্নটি কুন্দর জীবনের সূচনায় স্থাপিত, যার সঙ্গে কুন্দর পরবর্তী জীবনের সম্পর্ক নেই, অথচ দ্বিতীয় স্বপ্নটি উপন্যাসের ঘটনাস্রোতে ও কুন্দ-জীবনের এক বিশেষ পর্বে উদ্ভূত, ফলে স্বপ্নটি আরোপিত বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সন্ন্যস্ত নয়, যেজন্য প্রথম স্বপ্নের অনুবৃত্তি রূপে দ্বিতীয় স্বপ্নের বিচার যুক্তিহীনতার নামান্তর রূপেই গণ্য। প্রথমটি আর্ট সৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর, দ্বিতীয়টি আর্ট হিসাবে সফল। প্রথম স্বপ্নটি যে নিরালম্ব ও স্বয়ম্ভু

তার আর একটি প্রমাণ—ঘটনা সংস্থানের কৌশল। নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুন্দর সাক্ষাতের পর এবং বিষবৃক্ষের বীজ বপন পর্যন্ত ঔপন্যাসিক কুন্দর জীবনে বিবাহ ও বৈধব্য গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি বিবৃত ক'রে অবশেষে নবম পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র আলয়ে উপস্থিত করার পরই মূল কাহিনী ও ট্র্যাজিডির সূত্রপাত হয়—নগেন্দ্রর নৌকাযাত্রা থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত ঘটনাবলী সেই কাহিনীর ভূমিকাস্বরূপ। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের নৈর্ব্যক্তিক বস্তুমুখীন (objective) দৃষ্টি আমাদের কাছে আশ্চর্যের, এই দৃষ্টির ফলেই কুন্দর জীবনের প্রায় যাবতীয় ঘটনা স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপিত, এবং সেজন্য কুন্দর জীবনের দুঃখময় মুহূর্তগুলি সহজ নাটকীয়তায় অভিষিক্ত।

নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনে কুন্দনন্দিনী শনিগ্রহ বিশেষ, তেমনি কুগ্রহ দেবেন্দ্র ও হীরা কুন্দর জীবনে। মূল কাহিনীর উপর দেবেন্দ্র হীরার উপাখ্যানের প্রভাবও সমধিক। কুন্দ (নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থ) নগেন্দ্রর বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর আখ্যায়িকাটি যখন পরিণতির মুখে সেইসময় বৈষ্ণবরূপী দেবেন্দ্রর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে সূর্যমুখীর অজস্র তিরস্কারে কুন্দর গৃহত্যাগ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, ওই সুযোগে হীরার সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রর বিরক্তি উৎপাদনে সক্রিয় হওয়ায় নগেন্দ্র সূর্যমুখীর বিচ্ছেদ আসন্ন হয় নগেন্দ্র-কুন্দর বিবাহে। আবার কুন্দ যখন দুঃখের শেষ সীমায় উপনীত ও আত্মমৃত্যু চিন্তায় মগ্ন, সে সময় হীরার সহানুভূতির ছলে আত্মহত্যার ইঙ্গিত ও উপকরণ কৌশলে রাখা কুন্দর মৃত্যুর কারণ হয়, অবশ্য দেবেন্দ্রর নিপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণই হীরার মূল লক্ষ, তবু কুন্দর প্রতি তার ঈর্ষার পরিণাম সামান্য নয়। অর্থাৎ কুন্দর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে, এবং নগেন্দ্র-জীবনে কিঞ্চিৎ পরোক্ষ ভাবে হলেও

দেবেন্দ্র-হীরার উপাখ্যান মূল কাহিনীর গতিপ্রকৃতির পরিবর্তনে সাহায্যকারী হয়েছে।

আবার, মূল কাহিনীর দুটি চরিত্র সূর্যমুখী ও কুন্দর দ্বারা দেবেন্দ্র-হীরার কাহিনী বহুপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত। সূর্যমুখীর দৌত্যের ফলে হীরার দেবেন্দ্রর রূপে মুগ্ধ হওয়ার মধ্যে দেবেন্দ্র-হীরা কাহিনীর সূত্রপাত। আর কুন্দকে কেন্দ্র করেই হীরা-দেবেন্দ্রর কলহ সূচিত এবং উভয়ের ভয়াবহ পরিণামের অগ্নিস্পর্শে সম্পূর্ণ নির্দোষ কুন্দ (দেবেন্দ্র-হীরার ক্ষেত্রে) অবশেষে ভস্মীভূত হয়। অর্থাৎ দু-টি কাহিনী পরস্পরের প্রতি অতি নির্ভরশীল, একটি কাহিনী থেকে অন্যটির বিযুক্তি তাই "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে অকল্পনীয়।

কুন্দর প্রতি দুজন পুরুষ (নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র) আসক্ত, কুন্দ সে হিসাবে দু-টি কাহিনীর সংযোগী চরিত্র। অবশ্য নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রর আসক্তি চিত্র ভিন্ন দুই পদ্ধতিতে অঙ্কিত, যা বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতার পরিচায়ক। কুন্দর প্রতি দেবেন্দ্রর আকর্ষণ প্রত্যক্ষ ঘটনার সাহায্যে বর্ণিত, এবং কুন্দকে পাওয়ার দুর্নিবার বাসনা দেবেন্দ্রর ক্ষেত্রে প্রকট তার আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশে, ছদ্মবেশ গ্রহণ থেকে যার সূত্রপাত, কিন্তু নগেন্দ্রর উন্মাদনা বহুলাংশে মানসিক ব'লেই সংলাপ বা কর্তব্যকর্মে অবহেলার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণে সেই চিত্র উপস্থাপিত। তাই দেবেন্দ্রর আসক্তির চিত্র বিস্তৃত, নগেন্দ্রর ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত। এই ভিন্ন রীতি গ্রহণের ফলে উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন প্রতিফলিত, তেমনি উভয়ের কর্ম-পদ্ধতি ঘটনার গতি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক। পদ্ধতির সঠিক পরিবর্তনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে নাটকীয় মুহূর্তে সফল ও সার্থক হয়েছেন। "বিষবৃক্ষ"-এ লেখক নাটকীয় পদ্ধতিতে উপস্থাপনায় বহুলাংশে সফল, তার অন্যতম কারণ কাহিনীটি কুন্দনন্দিনী কেন্দ্রিক।

কুন্দ ব্যতীত আখ্যান অংশটুকুও কুন্দর জীবনের সঙ্গে কোনও না কোনও উপায়ে জড়িত, এবং নায়িকার ভাগ্যবিপর্যয় বা দুঃখময় জীবনের অতি তীব্রতা ও অবশেষে মৃত্যু—ঘটনাগুলি গোবিন্দপুর গ্রাম কেন্দ্রিক। চরিত্র ও ঘটনাস্থলের সীমা অতি নির্দিষ্ট হলে ঘটমান বর্তমানে নাটকীয় লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য ঘটনাস্থল ও চরিত্রের সংকোচনের সঙ্গে সময় সীমার নির্দিষ্টতা নাটকীয় উপস্থাপনা পদ্ধতির অনুকূল। "বিষবৃক্ষ"-এ সময় অতি সীমিত রূপে ব্যবহৃত নয়, কিন্তু মূল গল্পের (অষ্টম পরিচ্ছেদের পর) সূচনা থেকে কুন্দর ট্র্যাজিডি পর্যন্ত ঘটনা বহুদিন ব্যাপী বিস্তৃতও নয়। এতদসত্ত্বেও, বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দর জীবন ও মানসিক অবস্থার বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্বয়ং উপযাজকের মত উপস্থিত থাকায় নাটকীয় পদ্ধতি সর্বদা সার্থক হয়ে ওঠে নি। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লেখকের ভাষায় প্রকাশিত, ফলে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতে বাধ্য। কিন্তু নাটকীয় পদ্ধতিতে রচনায় লেখকের মন্তব্যহীন উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়, এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে চরিত্রের মানসিক বিবরণ প্রদান সিদ্ধির সহায়। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় বিষবৃক্ষে বহুপরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক, যেজন্য সময় সময়, কুন্দ-নগেন্দ্রর মনোবিকলনের ক্ষেত্রেও, আধুনিক নাটকীয় রীতির পরিচয় বর্তমান উপন্যাসে দুর্লভ নয়। কুন্দর প্রথম আত্মহত্যার দৃশ্য (ষোড়শ পরিচ্ছেদ) এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দৃশ্যের আবেগ ও উত্তাপ কুন্দর নিজস্ব অনুভূতিতে রূপায়িত বলে তা একই সঙ্গে কাব্যিক ও নাট্যিক, এবং কুন্দর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক।

উপন্যাসে দু-টি বিপরীত জীবনযাত্রার চিত্র সংযোজনা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম প্রিয় শিল্প কৌশল। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে নগেন্দ্র-কুন্দ-সূর্যমুখীর

দ্বন্দ্বমথিত জীবনের বৈপরীত্যে শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির সুখী সংসারের চিত্র উপস্থাপিত। জীবন সামগ্র্য রূপায়ণই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব, হয়ত এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র এমন বিপরীত চিত্র গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্কিম-উপন্যাসে ঘটনার আধিপত্য প্রবল বলেই এই রীতি গ্রহণ-ই সহজ ও স্বাভাবিক। অবশ্য বর্তমান উপন্যাসে শ্রীশচন্দ্রকমলমণির উপাখ্যান বিস্তৃত নয়, অথচ কমলমণির সঙ্গে কাহিনীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান। কমলমণির নিকট সূর্যমুখীর পত্র অথবা কমল-মণির গোবিন্দপুর আগমন—উভয় ঘটনা নগেন্দ্র-কুন্দ-সূর্যমুখীর জীবনের সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত। অবশ্য শ্রীশচন্দ্রকমলমণি উপা-খ্যানের প্রভাব মূল কাহিনীতে পরিলক্ষিত নয়, তবু এ-উপাখ্যানের জন্যই সংকটের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশিত হয় অতি সহজে।

প্লট-প্রধান উপন্যাসে কাহিনীর কার্যকারণের প্রতি সবিশেষ মনো-যোগের জন্য মানুষের অন্তর নামক বস্তুটি কিঞ্চিৎ অবহেলিত হয় ঔপন্যাসিকের কাছে, এবং বিষবৃক্ষে চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনার অধীন হওয়ায় পাত্র-পাত্রীর বৈশিষ্ট্য বিশেষ ঘটনার পটে উত্থিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনুসন্ধেয়। কিন্তু মাত্র ঘটনায় চালিত মানুষ যন্ত্র বিশেষ, রক্তমাংসের মানুষ যেমন ঘটনার দ্বারা চালিত, তেমনি ঘটনার স্রষ্টাও মানুষ। এই দ্বান্দ্বিক নিয়ম বঙ্কিমচন্দ্রর অজানা নয় নিশ্চয়, অথচ উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও কৌশল অনায়ত্ত, অথবা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তখনও সে-কৌশলের সুযোগ্য ব্যবহার-পদ্ধতি অনাবিষ্কৃত ব'লেই ঘটনাবাহুল্যই বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রস্থানভূমি, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় সক্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ উপন্যাসে পত্র ব্যবহার। "দুর্গেশনন্দিনী"-তে বিমলার পত্র ঘটনার গ্রন্থিমোচনের এবং "কপালকুণ্ডলা"-য় ব্রাহ্মণ বেশীর পত্র জটিলতা সৃষ্টির সহায়ক, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে

চরিত্রের মানসিক আলোড়নের চিত্র অনুপস্থিত। “বিষবৃক্ষ”-এ লেখক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিপূরক রূপে পত্রের ব্যবহারে পূর্ব-উল্লিখিত সেই দ্বান্দ্বিক নিয়মের প্রায় নিকটবর্তী হয়েছেন, কারণ শ্রীশচন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের নিকট নগেন্দ্রর পত্র, এবং কমলমণির নিকট সূর্যমুখীর পত্র আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের সহায়ক হয়েও নগেন্দ্র সূর্যমুখীর মানসিক অবস্থার পরিচিতি-জ্ঞাপক তথা নির্দেশকও বটে। অর্থাৎ পত্র লেখক বা লেখিকার সেই বিশেষ মুহূর্তের মানসিক উত্তাপ, মানসিক আলোড়নের চিত্র ছত্রে ছত্রে প্রসারিত। পত্রের একই সঙ্গে দু-টি গুণ “দুর্গেশনন্দিনী” বা “কপালকুণ্ডলা”-য় লক্ষিত নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের এবম্বিধ কৌশল গ্রহণ কৃতিত্বের নিঃসন্দেহে। মনেহয় “রজনী” উপন্যাসের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের আধিক্যের অঙ্কুর “বিষবৃক্ষ”-এর প্রকরণে নিহিত।

অন্যদিকে পটভূমিকার তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র স্থাপনায় বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর আগ্রহ বর্তমান উপন্যাসের বহু পরিচ্ছেদে প্রতিফলিত। এই প্রথম তিনি পারিবারিক কাহিনীর গণ্ডী সমগ্র গ্রামের পটভূমিকায় স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। নগেন্দ্রর পারিবারিক জীবনের কাহিনী দেবেন্দ্র হীরার সাহায্যে গ্রাম্যসমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যান্য উপন্যাসে পারিবারিক চিত্র প্রায় বিচ্ছিন্ন রূপে চিত্রিত, যেন সে-পরিবারের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের কোনও যোগ নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে “বিষবৃক্ষ” উপন্যাসে আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এখানে পল্লীসমাজ কাহিনীতে নানাভাবে সম্পৃক্ত, এমনকি তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক আবহাওয়া সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক সজাগ—ব্রাহ্ম-আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের আলোচনায় তা স্পষ্ট। বস্তুত, ঘটনা -প্রধান উপন্যাসে এমন সদাজাগ্রত সচেতন দৃষ্টি সর্বদা প্রখর রাখা দুষ্কর। পটভূমি, ঘটনা ও পাত্র-পাত্রী উপস্থাপনায় বঙ্কিমচন্দ্র

বহুলাংশে মোহমুক্ত ব'লেই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য, কারণ এই প্রথম বাংলা উপন্যাসে সমকাল ও সমসাময়িক জীবনের বিস্তৃত পটভূমিকায় জীবন্ত মানুষের সমস্যা উপস্থাপিত, এবং পরবর্তী বহু সামাজিক উপন্যাসের আদর্শ "বিষবৃক্ষ" তা বলাই বাহুল্য।

তথাপি সমালোচক বিষবৃক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ, সংশয় মুক্ত নন, এর কারণ অবশ্য বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নিহিত। উপন্যাসটির বক্তব্য অতিসীমিত এবং সে-বক্তব্যও লেখকের উদার সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল মনের পরিচায়ক নয়, বরং সে- বক্তব্য নীতিবিদগণেরই চর্চার বিষয়ঃ "যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফল ভোগ পর্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গনে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ, ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। * * * ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্র বিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগ শোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্তসংযমপক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতি জন্যা, প্রকৃতি শিক্ষা জন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযম পক্ষে শিক্ষাই মূল।" (ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ)। এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর-কুন্দ এবং দেবেন্দ্র-হীরার কাহিনী গৃহীত। বিষবৃক্ষের বিষময় ফল দেখানোর জন্য প্রথম কাহিনী-ই যথেষ্ট, এবং কুন্দর মৃত্যুতেই সে কাহিনীর সমাপ্তি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নৈতিক-তত্ত্ব সমান গুরুত্বের, সেজন্য গৌণ আখ্যায়িকার জের মূল কাহিনী শেষ হওয়ার পরও দুর্বার, এবং ঔপন্যাসিকের নিকট অপরিহার্য। কিন্তু হীরার উন্মাদ দশার প্রলাপ ও মৃত্যুকালে দেবেন্দ্রর বিভীষিকা দর্শন কোন

ক্রমেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না, ওইরূপ দুর্দশার চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন একমাত্র নীতিবিদগণের। শিল্প-সাহিত্যে লেখকের বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকলেই উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, নৈতিকতার আধিক্য ও প্রচার সে পথের অন্তরায়। উদ্দেশ্য সিদ্ধি একমাত্র লক্ষ হলে আর্টের ক্ষতি অনিবার্য। "বিষবৃক্ষ" কলা কৌশল প্রয়োগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হওয়া সত্ত্বেও লেখকের তত্ত্ব প্রমাণের অতি আগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নৈতিক তত্ত্ব প্রমাণের জন্য উপন্যাস অন্যদিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নগেন্দ্র-কুন্দ সম্পর্ক পরিবর্তনের অতর্কিতার বিশ্বাসযোগ্য বিশ্লেষণের অনুসন্ধান যেকোনও সমালোচকের পক্ষে সাধ্যাতীত, নগেন্দ্রর কুন্দর প্রতি আকর্ষণ বিকর্ষণের কাহিনী আমরা শুধু লেখকের কথা অনুযায়ী মানতে বাধ্য। রূপজমোহসৃষ্টি ও মোহভঙ্গের কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণ হতে গেলে সেই সমস্যা ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় সমস্যা হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু লেখক এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন না ব'লে ঘটনাগুলি শুধু ঘটনার চৌহদ্দিতে আবদ্ধ। তাই তাৎকালীনতার পরিচয় প্রদান শুধু উল্লেখ মাত্রই, তার প্রভাব নগেন্দ্রর জীবনে অবর্তমান, সেজন্য গ্রাম্যপটভূমিকা রচনাও নিরর্থক হয়। আসলে, বঙ্কিমচন্দ্র পরিবেশ অধীন মন ও পরিবেশ সৃষ্টিকারী মন—এই গতিশীল সম্পর্ক সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন ব'লে প্রেম ভালোবাসা প্রভৃতি অনুভূতির বিষয়গুলি তাঁর কাছে নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে বিচার্য হয়, তাই কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রর প্রেম সংযমহীনতার পরিচয়, তাই প্রচলিত নৈতিক আদর্শচ্যুত হওয়ার পরিণাম ভয়াবহ ব্যর্থতা।

"বিষবৃক্ষ" বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৌশলের পরাকাষ্ঠার অন্যতম নিদর্শন সন্দেহ নেই, এরপর তিনি একটি দুটি উপন্যাসেই মাত্র

এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের মানদণ্ডের বিচারে "বিষবৃক্ষ" অ-সাধারণ উপন্যাস নিশ্চয়ই নয়, তবু এ-উপন্যাসের ব্যর্থতার কারণগুলি অনুধাবনের যোগ্য, কারণ সেই অনুধাবনে আমরা বিশেষ উপকৃত হতে বাধ্য।

"বিষবৃক্ষ", "ইন্দিরা", "যুগলাঙ্গুরীয়"-র পালা শেষ করে "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-রাজ্যে প্রত্যাবর্তন আশ্চর্য জনক নয় ; এইরূপ প্রত্যাবর্তন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ রোমান্স-রাজ্যে বঙ্কিম-প্রতিভা স্বচ্ছন্দ বিহারী। তবু "দুর্গেশনন্দিনী"র মত সম্পূর্ণ রোমান্স রাজ্যে আগমন একমাত্র "রাজসিংহ" উপন্যাসে পরিলক্ষিত। "চন্দ্রশেখর" অর্ধ রোমান্স, তথাপি এ-উপন্যাসে রোমান্সের আতিশয্য প্রকট, যদিও উপন্যাসের মূল কাহিনী পরিবার কেন্দ্রিক। কিন্তু রোমান্সের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, "ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরই অধিক নির্ভর। অন্তরের বীরোচিত বিকাশগুলি, মনের উঁচুসুরে বাঁধা ঝংকারগুলি, জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা সমারোহ— * * *" (বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ: ৫৩), "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে স্বতই লক্ষিত।

"চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের পটভূমি ইতিহাসের এক অনিশ্চিত মুহূর্ত, তখন বাংলা দেশে মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের মুখে, অথচ ইংরেজ-রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। একটি শক্তি বিলীয়মান, অন্যটি অদৃঢ় ; ফলে সে-সময় সর্বব্যাপী অরাজকতার মর্মস্থলে সাধারণ জীবনের উপর অনিশ্চয়তার ছায়া গভীর। এই অনিশ্চয়তা উদ্ভূত সংকটই "চন্দ্রশেখর"-এর মূল উপজীব্য। অন্যান্য ঘটনা প্রধান উপন্যাসের মত "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে দু-টি আখ্যায়িকা বর্তমান, তন্মধ্যে মুখ্য আখ্যায়িকা (চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপ

কেন্দ্রিক) পরিবার কেন্দ্রিক, গৌণ আখ্যায়িকার (দলনী-মীর কাশেম কেন্দ্রিক) পটভূমি রাজনীতির ঘূর্ণিকেন্দ্র নবাবী দরবার। রাজনৈতিক ঝটিকা যে উভয় ক্ষেত্রে সমান বিধ্বংসী—দু-টি কাহিনী নির্বাচনে সে-ইঙ্গিতই স্পষ্ট। সেজন্য দু-টি কাহিনী সমান্তরাল নয়, একটি ক্রিয়ারই দু-টি অবিচ্ছেদ্য পরিণাম। বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ দলনীর পত্র সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য, "এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাথিলেন।" শৈবলিনীর ট্র্যাজিডি "প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। * * এজন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।" দলনীর ট্র্যাজিডিও প্রায় অনুরূপ "তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই না কেন?" অর্থাৎ একই চাওয়া এবং না পাওয়া উভয়ের ট্র্যাজিডির মূলে, অথচ বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের চরিত্র স্থাপনায় সম্পূর্ণ দু-টি বিপরীত চিত্র রচনা করেছেন। দলনী পতি-প্রেমে নিষ্ঠ, শৈবলিনী বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পর-পুরুষে আসক্ত। স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় দলনীর অতি-আশঙ্কা ও তার নিবারণের প্রচেষ্টার মধ্যে ট্র্যাজিডির সূত্র-পাত, শৈবলিনী স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা, এবং প্রেমিক প্রতাপের আশায় ফস্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগী। একজন ফুলের মত কোমল নিষ্পাপ, দ্বিতীয় জনের হৃদয়-ফুলে কীটের বাসা এবং ঔপন্যাসিকের মতে শৈবলিনী পাপীয়সী। বিপরীত চিত্রে কাহিনীর সমগ্রতা দান বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম একটি প্রিয় কৌশল, এ-কৌশল তাঁর প্রায় সব উপন্যাসে ব্যবহৃত। "চন্দ্রশেখর"-এ এই রীতির প্রয়োগ চাতুর্যপূর্ণ ও সুষ্ঠু, একমাত্র "বিষবৃক্ষ"ও "রাজসিংহ"-এর প্রণালীর সঙ্গে যা তুলনীয়।

দু-টি উপাখ্যানের সংযোগী চরিত্র চন্দ্রশেখর, নিরাশ্রয় দলনীকে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় দেবার মুহূর্ত থেকে দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। শৈবলিনী ফস্টর কর্তৃক অপহৃত হবার পর বিন্যস্ত হয় দলনীর দুর্গ প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘটনা। লেখক এক সময় শৈবলিনীর, অন্যসময় দলনীর কাহিনী বিন্যাসে কৌতূহল সৃষ্টিতে যত্নবান, যেজন্য প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধারের অব্যবহিত পরেই শৈবলিনী ভ্রমে দলনীর ইংরেজগণের হস্তে বন্দী হওয়ার কাহিনী বর্ণিত। পুনরায় শৈবলিনী কর্তৃক প্রতাপের উদ্ধার, উভয়ের গঙ্গাবক্ষে স্বচ্ছন্দ সন্তরণ, শৈবলিনীর নির্জন গিরিপ্রদেশে গমন ও পরিশেষে তার উন্মাদ হওয়ার চিত্র সম্পূর্ণ নিঃশেষ না করেই বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গার নির্জন তীরে দলনীর অসহায়তার চিত্র অঙ্কনে মনোযোগী হন এবং দলনীর আত্মদানের পর মূল-কাহিনীর নায়ক প্রতাপের আত্মবিসর্জন উপন্যাসের গতি অব্যাহত রাখার পক্ষে অনুকূল। লেখক যুগপৎ উভয় নায়িকার দুর্ভাগ্যের কাহিনী যোজনা করায় পাঠক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সজাগ ও মনস্ক থাকেন।

চন্দ্রশেখর এই দুই কাহিনীর সংযোগী চরিত্র মাত্রই নয়, শৈবলিনী ও দলনীর জীবনের নিয়ামক-ও বটে। উপক্রমণিকা অংশে প্রতাপকে উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে শৈবলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনের ট্র্যাজিডি রচিত হয়। পুনরায় রমানন্দ স্বামীর নির্দেশে পলাতকা শৈবলিনীর নবজীবন লাভে চন্দ্রশেখরের ভূমিকাই মুখ্য। অন্যপক্ষে চন্দ্রশেখরের আশ্রয় দানেই দলনীর জীবনে জটিলতার সৃষ্টি হয়, পুনরায় দলনী ফষ্টর কর্তৃক বিজন সৈকতে পরিত্যক্ত হলে চন্দ্রশেখরের নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের মূঢ়তার জন্য দলনীর বিষপানে আত্মদান নিষ্ঠুর পরিহাসেরই বিষয়। অর্থাৎ

দুটি কাহিনী পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কিত। কোনও একটি কাহিনীকে অন্য কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ, এবং এই অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ দুটি নারী-জীবনের একটি সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ সংকটের সূত্রে গ্রথিত। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, এবং সেই প্রেমকে পুষ্পিত পল্লবিত ও রক্ষা করার অতি আগ্রহে দলনী অবশেষে রাজনীতির নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত, গুরগণ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাতেই দলনী জীবনের সেই শোচনীয় পরিণামের সূচনা, এরপর একের পর এক ঘটনায় পরিচালিত ভাগ্যহীনার জীবন অবশেষে আত্মহত্যায় নিঃশেষিত হয়। দুর্গ প্রবেশের পথ রুদ্ধ হওয়ার পর থেকে বিষপানে আত্মদান পর্যন্ত ঘটনাগুলির অপ্রতিরোধ্য গতি দলনীর জীবন দলিত মথিত করার পক্ষে যথেষ্ট। এই ঘটনাগুলির সম্মুখে অসহায় শক্তিহীনা দলনী আপন নির্মম নিষ্পাপ চরিত্রেরই বলি হয়ে যায়।

শৈবলিনীর সংকটের যে আভাষ উপক্রমণিকা অংশে বিধৃত, সেই আভাষে শৈবলিনীর এমন পরিণতি স্বাভাবিক। দলনীর ট্র্যাজিডি বহির্ঘটনা সঞ্জাত, কিন্তু শৈবলিনীর ট্র্যাজিডির মূল তার অন্তরে। লেখক এই সুযোগে শৈবলিনীর অন্তর যে কলুষিত সে-বিবরণদানে বেশী উৎসাহী ছিলেন, সেজন্য শৈবলিনীর ট্র্যাজিডি তার জীবন থেকে উত্থিত না হয়ে লেখকের মর্জি অনুসারে অঙ্কিত হয়েছে, তাই আর্ট হিসাবে সর্বদা সার্থক নয়। শৈবলিনী বিবাহিতা, অথচ বিবাহিত-জীবনে সে অতৃপ্ত, প্রতাপের প্রতি তার ভালোবাসা এখনও অম্লান। বিবাহিত জীবনে স্বামী প্রেম না পাওয়া নারীজীবনের তৃপ্তি নয়, এতদূর দয়াদাক্ষিণ্যের পর অকস্মাৎ নীতি বোধে আক্রান্ত বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর প্রেম আনুভূতিক মানদণ্ডে বিচারের পরিবর্তে প্রচলিত নীতি ধর্মের মানদণ্ডে বিচার করেন ব'লেই যোগবল আধ্যাত্মিক

শক্তি তাঁর অবলম্বন হয়। সজীব মানবিক সম্পর্ক পরিহারের জন্য বঙ্কিম-উপন্যাসগুলি বহুসময় প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং চরিত্রগুলি সে-প্রচারের হাতিয়ার মাত্র, উপন্যাসের প্রারম্ভে স্বাভাবিক শৈবলিনী তাই উন্মাদ শৈবলিনীতে রূপান্তরিত, এই রূপান্তরের জন্য সংঘটিত ঘটনাগুলি আমাদের সমস্ত ধারণা যুক্তি বুদ্ধি বিপর্যয়কারী। দলনীর প্রতি লেখকের সহানুভূতি থাকার ফলে দলনীর ট্র্যাজিডি স্বাভাবিক, আমাদের করুণা উদ্রেককারী; কিন্তু শৈবলিনী লেখকের চোখের বালি ব'লে তার পরিণতি এমন ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর।

রোমান্সে ঘটনার আধিপত্য প্রবল ব'লেই লেখক বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য ঘটনার প্রভেদ প্রায়শই বিস্মৃত হন, যেজন্য অবিশ্বাস্য ঘটনার অবতারণা সে সব ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপার। "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে ঘটনা অতি দ্রুত ঘটানোর ফলে পাঠানদের গড়মান্দারণ জয় ঘটনাটি বিশ্বাস্য হলেও আলোচ্য উপন্যাসে তেমন ঘটনা কোনসময়ে সেই অধ্যাস সৃষ্টি করে না। দলনী বেগমের দুর্গ-প্রবেশের পথ রুদ্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরে চন্দ্রশেখরের আবির্ভাব অবিশ্বাস্য নিশ্চয়ই, তবু আকস্মিক সাক্ষাৎ বহুসময় সম্ভব ব'লে ওই ঘটনাটি স্বাভাবিক মনে করায় ক্ষতি নেই ফষ্টরের নৌকা থেকে শৈবলিনীর উদ্ধার, পরবর্তী সময়ে শৈবলিনী কর্তৃক প্রতাপের উদ্ধার, গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর অবাধ সন্তরণ, মুসলমানগণ কর্তৃক আমিয়টের নৌকা আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনাগুলি কোনও যুক্তির সাহায্যে সমর্থনীয় নয়। লেখকের অতর্কিত সুযোগ গ্রহণের সংখ্যাও একাধিক (দলনীর প্রতাপের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ, রমানন্দ স্বামীর প্রতাপ-শৈবলিনীর অবাধ সন্তরণ অবলোকন), এই সংযোগগুলি যুক্তিসম্মত নয়।

উপন্যাসে রমানন্দ স্বামীর প্রয়োজন লেখকের অলৌকিক অদ্ভুত বাসনা চরিতার্থের জন্য—রমানন্দ স্বামীর কৃতকর্মগুলি ও চন্দ্রশেখরের উপর রমানন্দর প্রভাব তারই সাক্ষ্য। "বিষবৃক্ষ"-এ এমন মহাপরোপকারী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও সেই মহাপুরুষের কর্মকাণ্ড সামগ্রিক উপন্যাসের ঘটনাবলীর তুলনায় তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎ-কর, কিন্তু উন্মাদিনী শৈবলিনীর রোগমুক্ত হওয়া (রমানন্দ স্বামীর মন্ত্রপুত ঔষধ প্রয়োগ) তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শৈবলিনীর জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য থাকা চন্দ্রশেখরের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও যোগবলে সেই বিবরণ জানা নিশ্চয়ই আর্ট হিসাবে, স্বাভাবিকতার অভাবে, নিম্নস্তরের। কারণ, এ-পদ্ধতি কৃত্রিম এবং শৈবলিনীর সচেতন অবস্থার সঙ্গে এই সুপ্ত-অবস্থার যোগ শূন্য। এমন অঘটন ঘটিয়ে পরোপকার সাধন যেন রমানন্দ স্বামীর ব্রত, এমন কি নবাব-দরবারে ফষ্টরেব স্বীকারোক্তি আদায়ও রমানন্দ স্বামীর দৃষ্টিসম্মোহনের ফল। এগুলি যাদু-মঞ্চে প্রদর্শনের যোগ্য, কিন্তু উপন্যাস যাদু-প্রদর্শনের মঞ্চ নয়, সেজন্য রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র আপন কল্পনা শক্তির পরিচয় দিলেও সমালোচকের নিকট তা অদ্ভুত ও অর্থহীন। রমানন্দ স্বামীর রাহুগ্রাসে সেজন্য চন্দ্রশেখরের চরিত্র নিষ্প্রভ এবং রক্তমাংস শূন্য হয়ে পড়ে। গ্রন্থারম্ভে চন্দ্রশেখরের মধ্যে যেটুকু রক্তমাংস বর্তমান, রমানন্দ কর্তৃক সম্পূর্ণ পরিচালিত চন্দ্রশেখর তার অতীতের কঙ্কাল অপেক্ষাও অধম। চন্দ্রশেখরের সমস্যা (শাস্ত্রানুরাগ ও প্রেমের দ্বন্দ্ব) রমানন্দ স্বামীর প্রভাবে অবশেষে এক অদ্ভুত রহস্যে পরিণত, যে রহস্যের উদ্‌ঘাটন 'কমণ্ডলুস্থিত জল' দিয়েই সম্ভব। এবং তা কি সত্যি সম্ভব ? এমনকি প্রতাপ চরিত্র উপস্থাপনায় সেই একই আতিশয্যের স্পর্শ। শৈবলিনীর অন্তর দূষিত ব'লে সে কলুষিতা,

প্রতাপ অতি সৎ হয়েও সততার শরে বিদ্ধ। উপক্রমণিকা অংশে এবং পরবর্তী কয়েক পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রতাপের প্রেম প্রাণ-চঞ্চল মানুষেরই প্রেম, কিন্তু এই প্রেমের জয় বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনার বহির্ভূত, কারণ প্রতাপের "চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।" অর্থাৎ প্রতাপের শুদ্ধতাই লেখকের কাঙ্ক্ষিত, অতএব সেই প্রেমের ভবিষ্যৎ অশরীরী হওয়াই স্বাভাবিক। প্রতাপের জীবনে চন্দ্রশেখর অনেকখানি, তাই ত্রিকোণ প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতাপের সংযম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু মৃত্যুর সময় সেই সংযম মাত্রারিক্ত উচ্ছ্বাসে (শুদ্ধতার প্রতিমূর্তি হওয়া সত্ত্বেও) প্রেমের উষ্ণতায় পূর্ণ। কিন্তু এই উষ্ণতা প্রকাশের পথ রুদ্ধ, কারণ তা লেখকের অনভিপ্রেত, অথচ প্রতাপের চরিত্রে সেই উত্তাপের প্রকাশই উপন্যস্ত চরিত্রের পক্ষে প্রাকৃতিক তা যে কোনও পাঠকের বোধগম্য। প্রথম খণ্ড থেকে প্রতাপের কাছে শৈবলিনীর শপথ উচ্চারণ পর্যন্ত কাহিনী (নানা ত্রুটি উপেক্ষা করে অবশ্য) উপন্যাসের নিজস্ব নিয়মেই পরিচালিত, কিন্তু রমানন্দ স্বামীর সম্পূর্ণ আবির্ভাবের পর (শৈবলিনীর নির্জন প্রদেশে গমনের পর) কাহিনী লেখকের তত্ত্বপ্রমাণের কৌশল বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়, যেজন্য কাহিনীতে নায়িকার জীবনের পরিবর্তনে নায়িকার কোনও দায়িত্ব থাকে না, স্বামীর নির্দেশ ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবই সে ক্ষেত্রে মুখ্য।

শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, কারণ নীতির বিচারে সে কলুষিতা। অতএব সুদীর্ঘ চারটি পরিচ্ছেদে তার ব্যাপক আয়োজন। প্রায়শ্চিত্তের বিভীষিকা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার বিবরণে বঙ্কিমচন্দ্রর বর্ণনাভঙ্গী প্রশংসা যোগ্য, কিন্তু সেই প্রশংসনীয় বিবরণ উপন্যাসের অঙ্গ নয়, সমস্ত বর্ণনা ধর্মশাস্ত্রের বিধান হিসাবে

উপন্যাসে সংযুক্ত। এই প্রায়শ্চিত্তের প্রহারে শৈবলিনী উন্মাদ, এবং উন্মাদ হওয়া শৈবলিনীর উচিত, কারণ, সে লেখকের মতে পাপিষ্ঠা। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত বা রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক চিকিৎসায় শৈবলিনীর রোগমুক্তি শেষে বিরাট প্রহসনেই পরিণত হয়, উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে প্রতাপের কাছে শৈবলিনীর উক্তি ("আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—") অথবা রমানন্দ স্বামীর উক্তি ("যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তখন তাহার আকারেঙ্গিতে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উন্মাদ-গ্রস্তা নহে। এবং বোধহয়, তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।") —তার উজ্জ্বল নিদর্শন, এবং এইখানেই নীতিবিদ্ বঙ্কিম শিল্পী বঙ্কিমের নিকট পরাস্ত হয়েছেন। শৈবলিনী লেখকের অনেক তিরস্কারের পাত্রী হয়েও মানুষী সবলতা দুর্বলতা নিয়েই প্রাণবন্ত, এবং "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের সাফল্য বহুলাংশে শৈবলিনী এবং প্রতাপের মনুষ্যোচিত সংবেদন ও অনুভূতির প্রকাশে।

অলৌকিকতার স্পর্শবর্জিত "কৃষ্ণকান্তের উইল" বঙ্কিম-উপন্যাসে আশ্চর্য এক ব্যতিক্রম। দৈব, অদৃষ্টবাদ, ভাগ্যগণনা, মহাপুরুষের সাক্ষাৎ বঙ্কিম-উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, কিন্তু "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এ বঙ্কিমচন্দ্র এই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পাত্র-পাত্রীর কার্যকলাপ ও অনুভূতির চিত্র সামাজিক পটে স্থাপিত করে প্রায় নিরপেক্ষ দর্শকের মত বর্ণনায় প্রয়াসী হয়েছেন। "বিষবৃক্ষ"-এ পটভূমি বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও ওই উপন্যাসের আশাতীত ব্যঞ্জনার সম্ভাবনা বিশেষ কারণে বিনষ্ট—তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অথচ "কৃষ্ণকান্তের উইল"এর বিষয়বস্তু অতি সীমিত হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে অধিক সার্থক হয়েছেন। একটি ত্রিভুজ প্রণয়-কাহিনী "বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণ-

কান্তের উইল” উপন্যাসের উপজীব্য, এবং রূপজমোহ নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের দুঃখজনক পরিণতির জন্য দায়ী, অথচ উপস্থাপনার গুণে “কৃষ্ণকান্তের উইল” প্রথম উপন্যাস অপেক্ষা অধিক সফল। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনে কুন্দ যেমন বিপর্যয়ের আলম্বন বিভাব, রোহিণী তেমনি গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের জীবনে। কিন্তু নগেন্দ্র-কুন্দর প্রণয় উন্মেষের কাহিনী সম্পূর্ণ রূপে বাহ্যসম্পর্ক শূন্য এবং এই ঘটনায় সূর্যমুখীর ভূমিকাও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু গোবিন্দ রোহিণীর প্রেম বাহ্যসম্পর্ক শূন্য নয় এবং ভ্রমর এক্ষেত্রে সূর্যমুখীর মত নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চল নয়, কারণ গোবিন্দলালের প্রতি অভিমান ও সূক্ষ্ম সন্দেহ দাম্পত্য-জীবনে বিচ্ছেদেরই সহায় হয়েছে। এ-ছাড়া গ্রাম্য-জীবনের কুটিল রটনা ভ্রমর ও রোহিণীর জীবনে সমান প্রভাব বিস্তারকারী। আসলে, “বিষবৃক্ষ”এ নগেন্দ্র-কুন্দর আকর্ষণ বিকর্ষণের কাহিনী প্রায় সবটাই অন্তরালের ঘটনা এবং পাঠকের কাছে সংবাদ মাত্র, কিন্তু “কৃষ্ণকান্তের উইল”-এ গোবিন্দ রোহিণীর অনুরাগের সঞ্চার, বিকাশ ও পরিণতি ক্রমে ক্রমে পাঠকের সম্মুখে অনাবৃত, যেজন্য এ উপন্যাসে ঘটনা অন্যঘটনায় রূপান্তরিত, এবং পাত্র-পাত্রীর মানবিক সম্পর্কের পরিবর্তন বাহ্যজগতের প্রভাব স্বীকার করে স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত। বস্তুত, এ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। “বিষবৃক্ষ”-এ একাধিক কাহিনী জটিলতা বৃদ্ধি করলেও “কৃষ্ণকান্তের উইল”-এ গোবিন্দলাল রোহিণী ভ্রমর কেন্দ্রিক একটি মাত্র সরল কাহিনী উপস্থাপনার গুণে কম জটিল নয়, চরিত্রের অন্দরমহলে প্রবেশের চেষ্টায় সামান্য সরল গল্প বিক্ষোভ ও ঘূর্ণী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, এবং ঘটনার চাপ অতিশয় না থাকার জন্যই পরিবেশ সৃষ্টিকারী চরিত্রের সাক্ষাৎ এ-উপন্যাসে দুর্লভ নয়। একটি

সামান্য ঘটনা মানুষের জীবনে সংকট ও সমস্যা সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট, "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের আরম্ভ তেমনি একটা তুচ্ছ ঘটনার সূত্রে, অথচ তুচ্ছ ঘটনাটি (কৃষ্ণকান্তর উইল রচনা) তুচ্ছ নয়, সেই ঘটনা একটি পারিবারিক জীবনের শান্তি হরণকারী। প্রথমবার উইল লিপিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক ঘটনা সংঘটনের সমলয়ে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর ভাগ্য পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ যোগ্য। এ-উইলকে কেন্দ্র করেই হরলাল রোহিণীর সাহায্যপ্রার্থী, সেইসময় রোহিণীর জীবনে সুপ্ত কামনা জাগ্রত হয় হরলালের সংস্পর্শে, অবশেষে আশাভঙ্গের যে ব্যর্থতা, সেই ব্যর্থতার অপরূপ চিত্র বারুণীর তীরে রোহিণীর চিন্তায় প্রতিফলিত। অতৃপ্ত বাসনা কামনা মথিত রোহিণীর জীবনে এই সময় গোবিন্দ-লালের আবির্ভাব। গোবিন্দলালের সহানুভূতি ও সমবেদনার জন্যই গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রণয় উন্মেষ, দ্বিতীয়বার উইলচুরি সেই প্রণয়েরই স্বাক্ষর। এই অধ্যায়ের শীর্ষ বিন্দু (climax) ভ্রমরের উপদেশে রোহিণীর জলমগ্ন হওয়ার ঘটনা, এবং সেইসূত্রে রোহিণীকে উদ্ধার করার পর গোবিন্দলালের আকর্ষণ অনুভব। কৃষ্ণকান্তের শেষবার উইল পরিবর্তনে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সামান্য একটি তুচ্ছ ঘটনা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর ভাগ্যপরিবর্তনে সক্ষম। সমস্ত প্রথমখণ্ডের ঘটনা উইল রচনার ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং উইলের পরিবর্তনে পাত্র-পাত্রীর মানসিক জগৎ-ও আলোড়িত হয় কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো সেই ঘটনার সূত্রে অন্য ঘটনার দ্বারা।

উপন্যাসের প্রথমখণ্ডে গোবিন্দলালের সঙ্গে রোহিণীর সাক্ষাৎ, রোহিণীর প্রণয় উন্মেষ, জলমগ্না রোহিণীর উদ্ধারের পর গোবিন্দ-লালের প্রণয়-সঞ্চার ও রোহিণীকে ভোলার জন্য বিদেশ গমন,

ভ্রমরের অভিমান ও ভিত্তিহীন সন্দেহ, গোবিন্দলালের ভ্রমরকে ত্যাগ করার সঙ্কল্প এবং ত্যাগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রে ঘটে, সেজন্য আকস্মিক, অতর্কিত ঘটনা এ-খণ্ডে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চরিত্রগুলির কার্যকলাপ শুধু আপন গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, সেজন্য প্রতিকার্যের সমান ফল ভোগ করে সমস্ত চরিত্র। পাত্র-পাত্রীর স্বাভাবিক বিকাশে এবং চরিত্রের ক্রমবিবর্তনে লেখকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও কর্তামি আত্মগোপন করার ফলেই ঘটনার প্রতিটি স্তরের সঙ্গে মানসিক অবস্থার বিবরণ অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত, এবং গোবিন্দলাল রোহিণী এমনকি ভ্রমরকে মর্ত্যবাসী ব'লে মনে হয়। চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসহীন এমন অভিযোগ আলোচ্য উপন্যাস সম্বন্ধে করা যায় না, বরং গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সম্পর্ক পরিবর্তনের ইতিহাসে উভয়ের সাবয়ব উপস্থিতি বঙ্কিম-উপন্যাসে ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য।

প্রথমখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের পর থেকেই কাহিনীর একমুখীনতা পরিলক্ষিত। পর পর ঘটনাগুলি এমনভাবে সাজানো যে পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার মর্মস্থল থেকে উত্থিত, ঘটনার বেগ সংযত ও সংহত করার ফলে অতিক্রুত ঘটনা সংঘটনের কুফল (বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য ঘটনার একাকার) এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। ঘটনা স্বাভাবিক লয়ে ঘটে ব'লে ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও সেই প্রতিক্রিয়া জাত মানসিক আন্দোলনের চিত্র লেখকের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকে না। তাই চরিত্রগুলির পরস্পর সম্বন্ধপরিবর্তন পাঠকের গোচরীভূত হয়। এ-উপন্যাসে চরিত্রের মানসিক অবস্থার বর্ণনা ঘটনার প্রায় তুল্যমূল্য, সেজন্য চরিত্র সম্পর্কে লেখকের জবানী ছাড়া একটা ধারণা তৈরী করা অসম্ভব নয়, বরং ঘটনার

পরে চারিত্রিক পরিবর্তন বা পরিবর্তনের ইঙ্গিত রাখার ফলে চরিত্রগুলি ঘটনা ও পরিবেশের দাস হয়ে ওঠে না, সময় সময় ঘটনা বা পরিবেশের কর্তাও হয়। গোবিন্দলালের স্ত্রী বর্তমান, অথচ তার রূপতৃষ্ণা প্রবল। একদিকে স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকার সংকল্প, অন্যদিকে রোহিণীর আকর্ষণ। এই দ্বন্দ্বে গোবিন্দলাল মথিত, অবশ্য এই দ্বন্দ্বমথিত জীবনের আলেখ্য পুঙ্খানুপুঙ্খবর্ণিত নয়, শুধু ঘটনার ইঙ্গিতে এবং ফাঁকে ফাঁকে নায়কের অবস্থা কল্পনায় করা যায়। গোবিন্দলালের সমস্যা তাই একই সঙ্গে দেহ ও মনের। এই সংকটের প্রথমস্তরে গোবিন্দলালের কর্তব্যনিষ্ঠাই জয়ী হয়, কিন্তু এজন্য তার যন্ত্রণা সামান্য নয়। রোহিণীর ইঙ্গিতে "দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, ভুজঙ্গীয় সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।", এরপর অবশ্য গোবিন্দলালের মানসিক অবস্থার বিবরণ উপন্যাসে উহ্য, কিন্তু জলমগ্না রোহিণীকে উদ্ধারের পর গোবিন্দলালের অবস্থা এইরূপ ঃ "তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ভাবিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমার এ বিপদে রক্ষা কর! তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব, আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও —আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" অর্থাৎ রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ গোবিন্দলালের সহসাজাত আকস্মিক ঘটনা নয়, অজস্র প্রতিরোধ ও যন্ত্রণার পর গোবিন্দলাল পাপের প্রথম সোপানে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এখানেও এ-যন্ত্রণা ও প্রতিরোধের শেষ নয়, তাই তার প্রবাস যাত্রা—"মরিতে হয় মরিব; কিন্তু তথাপি

ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। *** বিষয়কর্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব।” কিন্তু গোবিন্দলাল সেই আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য, কারণ ভ্রমরের অভিমান, অকারণ সন্দেহ এবং পিতৃগৃহযাত্রা। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর গোবিন্দ-লালের ভুল বোঝাবুঝির অবসানের পরিবর্তে অনিবার্য বিচ্ছেদই গোবিন্দলালের উক্তিতে স্পষ্ট হয়, “আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।” এমনকি গোবিন্দলালের মাতাও এ-মিলনের পরিপন্থী, অতএব গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের বিচ্ছেদ কোনও আরোপিত বা আকস্মিক ঘটনা নয়, এবং রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণের কাহিনী তাই লেখকের ইচ্ছার খেয়াল নয়, উপন্যাসের নিয়মে পরিস্থিতি, ঘটনা ও চরিত্রের টানে উত্থিত স্বাভাবিক ঘটনা। অন্যদিকে, রোহিণীর কাহিনী (প্রথমখণ্ডে) কোনও পূর্বনির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী রচিত নয়। বিধবা রোহিণীর মনে বাসনা বহ্নি জ্বালানোর জন্য দায়ী হরলাল, অথচ হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখানের পরও সে সেই সুখস্বপ্নে বিভোর, তাই গোবিন্দলালের সহানুভূতি ও সমবেদনা তার কাছে প্রেমের ইঙ্গিত রূপে প্রতিভাত। “গোবিন্দ-লালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ় বর্ণে অঙ্কিত হতে থাকলেও রোহিণীও যন্ত্রণায় দীর্ণ, “আমি বিধবা—আমার ধর্ম গেল, সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি? *** আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।” তাই সে অকপটে গোবিন্দলালকে সব কথা বলতে অক্ষম, শুধু যন্ত্রণার চিত্রটি তার উক্তিতে লভ্য, “কি? ইহ জন্মে আমি বলিতে পারিব না—কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ

পাইলে খাইতাম।” রোহিণী যে গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তা, সে-চিত্রের বিশদ বিবরণ উপন্যাসে নেই, কিন্তু লেখক বিবৃতির মাধ্যমে এই আকর্ষণ যে আকস্মিক নয়, তা স্পষ্ট করে তুলেছেন (প্রথম খণ্ড নবম পরিচ্ছেদের প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য)। আবার ভ্রমরও লেখকের হাতের পুতুল নয়, তার সক্রিয় ভূমিকা বর্তমান। অর্থাৎ চরিত্রগুলি মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে অঙ্কিত ব'লে "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর পাত্র-পাত্রী সজীব, এবং একমাত্র সজীব মানুষের কাহিনীই উপন্যাসের মূল অবলম্বন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমখণ্ডে কোনও একটি চরিত্রের বিশেষ সাহায্য না নিয়ে তিনজনের (গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী) সহায়তায় কাহিনী বিবৃত করেন, ফলে লেখকের অযাচিত উপস্থিতি ও কাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশের সংখ্যা অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় কম, সেজন্য কাহিনীতে নাটকীয়তার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

কিন্তু প্রথম খণ্ডের আশ্চর্য সাফল্য দ্বিতীয় খণ্ডে বিঘ্নিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে যে বীজ উপ্ত, তার ফসলের পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ডে বিরাট কিছু না ঘটলেও সেখানে ঘটমান বর্তমান-ই সর্বৈব, যেজন্য উপন্যাসের গতি অবারিত ও অব্যাহত। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে ঘটনা বিরলতার মধ্যে রোহিণী হত্যা একমাত্র ও গুরুত্বপূর্ণ সংঘট্ট। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় অর্ধ অংশ ব্যয়িত হয়েছে ভ্রমরের শূন্যতা ও রিক্ততার কাহিনীর বিবরণে। ফলে এ-খণ্ডের প্রধান চরিত্র ভ্রমর, অথচ ভ্রমর এ-খণ্ডের কাহিনীর নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক কিছুই নয়, এমনকি ভ্রমর-কেন্দ্রিক কোনও ঘটনার উল্লেখও নেই। ভ্রমর এ-খণ্ডে নিষ্ক্রিয়, তার দুঃখময় জীবনের মন্থর গতি তাই বিবৃতি মাধ্যমে উপস্থাপিত। অথচ এই খণ্ডে উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (রোহিণী হত্যা) সরাসরি ঘটনার

সাহায্যে পাঠক সম্মুখে তুলে ধরা হয়। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে ভ্রমরের কোন সংযোগ সন্ধান অসাধ্য। অর্থাৎ ভ্রমর কেন্দ্রিক কাহিনী এসময় দিকভ্রষ্ট, ভ্রমর অবর্তমানে এবং ভ্রমরের অজানিতে এমন একটি ঘটনার আয়োজনে লেখকের অন্য উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই রোহিণী হত্যার পর গোবিন্দলালের পলায়ন ও বিচারের মধ্যবর্তী অধ্যায় অতি সংক্ষেপে বিবৃত, এবং এ-সময় গোবিন্দলালের কার্যকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিবরণ উপন্যাসে অনুক্ত থাকে। দ্বিতীয় খণ্ডের উপস্থাপনার রীতিপরিবর্তনও উপন্যাসের সাফল্যলাভের পথে অন্তরায় হয়েছে। বিবরণমূলক কাহিনী ও সরাসরি ঘটনা সংযোজনার মিশ্রণে বহু সময় গল্পের ভারসাম্যচ্যুত হওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং সে সময় ঔপন্যাসিকের নিজস্ব প্রয়োজন মাথা চাড়া দিলে তার পরিণাম ভয়াবহ হওয়া স্বাভাবিক, যেজন্য রোহিণী হত্যার সামগ্রিক চিত্রটি পাঠকের কাছে বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে ওঠে না। গোবিন্দলালের মানসিক অস্থৈর্য রূপজমোহ ভঙ্গের জন্য, তবু এই অস্থৈর্যে তার পক্ষে রোহিণীকে হত্যা করা সম্ভব নয়, এবং সামান্য অজুহাতে দ্বিতীয় কোনও প্রমাণের অপেক্ষায় না থেকে গোবিন্দলালের মত বিবেকবান পুরুষের পক্ষে রোহিণী হত্যা কখনোই অনায়াসে সম্ভব নয়। তদুপরি গোবিন্দলালের সংকট আত্মিক-সংকট, সেই সংকট, শুধুমাত্র রূপজমোহে সৃষ্ট—এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গোবিন্দলালের প্রতি অবিচার করার সামিল, অন্তত গোবিন্দলালের প্রারম্ভ ও পরিণতি গোবিন্দলালের হঠকারিতার সমর্থক নয়। অন্যদিকে এই ঘটনায় রোহিণী চরিত্রের ন্যায়ও লঙ্ঘিত। গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর ভালোবাসা অকৃত্রিম, এ-অকপটতার জন্য রোহিণীর হৃদয় বিদীর্ণ যন্ত্রণার চাপে। গোবিন্দলালের জন্য উইল পরিবর্তনের ও বারুণীর জলে আত্মহত্যার

প্রচেষ্টায় সেই অকৃত্রিমতাই প্রোজ্জ্বল। এমনকি গোবিন্দলালের প্রতি "বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না" এরূপ সংকল্পে যে রোহিণী অবিচল, সেই রোহিণী ক্ষণিক দেখায় নিশাকরের প্রতি আকৃষ্ট হয় কেন, তা বোঝা মুশকিল, "বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, নিশাকর রূপবান—পটলচেরা চোখ। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। * * * যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই।" রোহিণীর এ পরিবর্তনের যুক্তি কি? উত্তর, ঔপন্যাসিকের প্রয়োজন, কারণ রোহিণী পাপিষ্ঠা, তার শাস্তি হওয়া উচিত, তাই উপন্যাসের গতি স্তব্ধ, চরিত্রের ন্যায় বিপর্যস্ত। তাই প্রথম খণ্ডের অনবদ্য মানবিক সম্পর্কের ভিত্তির উপর স্থাপিত গোবিন্দলাল-রোহিণীর প্রণয় উপাখ্যান নীতিবিদের প্রচণ্ড প্রহারে বিকৃত ও অসমাপ্ত হয়। রোহিণী বিধবা, ফলে গোবিন্দলালের প্রতি তার প্রেম তথাকথিত সামাজিক নীতি বিরুদ্ধ, অতএব এ-অন্যায়ের ক্ষমা নেই লেখকের কাছে। সেজন্য উপন্যাসকে হত্যা করেও বক্তব্য ও মতাদর্শ প্রতিষ্ঠাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে, "রোহিণীকে যে এইরূপে সরাইয়া দিতে হইল, তাহাতে প্রমাণ হয়, চরিত্র অপেক্ষা ঘটনা, প্লট অপেক্ষা পরিণামই মুখ্য হইয়াছে, এবং সেই পরিণামের পক্ষে রোহিণীর মত চরিত্র একটা বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" (মোহিতলাল মজুমদার : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, পৃঃ ৪৪)। তাই পরিশিষ্ট অংশে গোবিন্দলালের সন্ন্যাসগ্রহণ বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত হিসাবে গ্রহণীয়, উপন্যাসের চরিত্র বিকাশের নিয়মের সঙ্গে যে পরিণতির সম্পর্ক নেই।

বক্তব্য ব্যতীত মাত্র পদ্ধতি গত আলোচনাতেও "কৃষ্ণকান্তের

উইল”-এ ত্রুটি লক্ষণীয়। প্রথম খণ্ডে কাহিনী একাধিক চরিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত, এবং সেখানে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর ভূমিকা সমান গুরুত্বের, এমনকি গ্রাম্য রমণীদের রটনার প্রভাবও কাহিনীতে পরিলক্ষিত। প্রথম খণ্ডে কখনো রোহিণী, কখনো গোবিন্দলাল বা ভ্রমরের প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাগুলি সাজানো ব'লে সচলতার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কগ্রন্থিগুলি সহজে উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে এই রীতি পরিবর্তন উপন্যাসের পক্ষে ক্ষতিকর নিঃসন্দেহে। প্রথম খণ্ডের উপনায়িকা ভ্রমর এ-খণ্ডে নায়িকায় রূপান্তরিত, এবং রোহিণী গোবিন্দলালের সজীব সম্পর্ক বিকাশের ধারা বা পরিণতি দ্রুত ঘটে ব'লে রোহিণী-গোবিন্দলাল দ্বিতীয় খণ্ডে লেখকের ক্রীড়নক মাত্র, এমনকি ভ্রমরের দুঃখ ভোগ দুঃখ বিলাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে মনে হয়। তাই দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের পদ্ধতি পরিত্যক্ত হওয়ায় উপন্যাসটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। (সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৪৫-৪৬ দ্রষ্টব্য।) তথাপি এসব ত্রুটি সত্ত্বেও “কৃষ্ণকান্তের উইল” বঙ্কিম-উপন্যাসে অনন্য এবং গোবিন্দলাল রোহিণীর সাবয়ব উপস্থিতি বঙ্কিম-উপন্যাসে ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য।

হিন্দুদের বাহুবল প্রতিপন্ন করা “রাজসিংহ” উপন্যাসের বিষয়বস্তু, “যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।” এই সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী উপন্যাসের পক্ষে উপযুক্ত কিনা তা তর্কাতীত নয়, তবু লেখক এ-বক্তব্য রূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছেন। চঞ্চলকুমারীকে উপলক্ষ্য করে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের মহাযুদ্ধ সংঘটনের মধ্যে সেই রূপায়ণের প্রয়াস লক্ষিত। এ-যুদ্ধ ইতিহাসসম্মত কিনা, বা এ-উপন্যাসে মূল ও স্থূল ঘটনা ইতিহাস বিধৃত কিনা—সে বিষয়টি বিশেষরূপে ঐতিহাসিকের বিচার্য। সাধারণভাবে আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্য “বঙ্কিম

কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র," বর্তমান সমালোচকের মতো ইতিহাস অনভিজ্ঞ ব্যক্তির শিরোধার্য। বস্তুত, বঙ্কিমের বক্তব্য উপন্যাসে রূপায়িত কিনা তাই এস্থলে বিচার্য, সেই বক্তব্য প্রতিপন্ন করার জন্য লেখকের শিল্প কৌশলের চাতুর্যময় প্রয়োগের বিষয়টি আমাদের আলোচনাধীন।

প্রথম খণ্ডে চঞ্চলকুমারী কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের চিত্র-দলন ঘটনাটি রাজপুত ও মোগলের মহাযুদ্ধের বীজ স্বরূপ। অতি সন্তর্পণে ঘটনার পর ঘটনার বিন্যাসে এই যুদ্ধ আসন্ন ও অনিবার্য হয় ব'লে উপন্যাসের গৌণ কাহিনী মুখ্য কাহিনী থেকে বিযুক্ত করা সম্ভব নয়। চঞ্চলকুমারীর হঠকারিতা ও সেই হঠকারিতার সুযোগের সদ্ব্যবহারে জেবউন্নিসা তৎপর। জেব-উন্নিসার কৌশলেই ঔরঙ্গজেবের আদেশ প্রচারিত হয়। এই আদেশের সূত্রে রাজপুত রমণীর সম্মান রক্ষার জন্য রাজসিংহের কাছে চঞ্চলকুমারীর পত্র প্রেরণ, এবং লিপিপাঠে চঞ্চলকুমারী উদ্ধারে রাজসিংহের সংকল্প রাজপুত ও মোগলের সংঘর্ষ অনিবার্য ও আসন্ন করে তোলে। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই হিন্দুদের বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ লেখকের অভিপ্রায়। অথচ অভিপ্রায়টি চূড়ান্ত হলে ঘটনাগুলি যান্ত্রিক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বর্তমান-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছেন মাত্র একটি কৌশলে, সেই কৌশলটি অতি দ্রুত ঘটনা সংঘটনের চাতুর্য। রন্ধ্রযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার অবিরাম প্রবাহে পাঠকের কৌতূহল বজায় রাখার লেখকের দক্ষতাই প্রমাণিত, এবং রন্ধ্রযুদ্ধে মাণিকলাল ও রাজসিংহের সাহসিক কর্মকাণ্ডে পাঠক বিমূঢ় এবং মুগ্ধ হয়। মাত্র একশত রাজপুত যোদ্ধার দু হাজার মোগল সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রশংসার বিষয়, এমনকি শেষরক্ষায় অক্ষম রাজসিংহের উক্তি, "দুইমুখে আমাদের

বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? * * এসো, আমরা তরবারি হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি; তোপ ত আমাদেরই হইবে—তারপর দেখা যাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি”, নিঃসন্দেহে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা। এই উক্তিতে উদ্দীপ্ত রাজপুত সেনার প্রাণবিসর্জনের সংকল্প রাজপুতদের অজেয় শক্তিরই ঘোষক। কিন্তু এই যুদ্ধ কি কেবলমাত্র বাহুবলে পরিচালিত? পরাক্রমের প্রকাশ অবশ্যই রাজপুত সেনাপতি ও সেনাদের কর্মে পরিলক্ষিত, কিন্তু সেই সঙ্গে বুদ্ধিবল, চাতুর্যের নিদর্শনও ন্যূন নয়, যুদ্ধে কেবল বাহুবলই একমাত্র আশ্রয় নয়, বুদ্ধিবল সমান প্রয়োজনীয়—মাণিকলালের প্রশ্নের উত্তরে রাজসিংহের উক্তি তার সাক্ষ্য, “যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। আমি-ও বাদসাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ-সকল সংগ্রহ করিও।” এবং বুদ্ধিবলের জন্য রাজসিংহের কাছে ঔরঙ্গজেব সপরিবারে অবরুদ্ধ হয়, দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ের মুল কৃতিত্ব মবারকের। ফলে প্রথম যুদ্ধে হিন্দুদের বাহুবল প্রমাণিত হলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে মবারকের ছদ্মবেশ ধারণই যুদ্ধের এরূপ ফলাফলের জন্য দায়ী, কারণ মবারক “মোগল সওদাগর সাজিয়া, মোগল সেনা রন্ধ্রপথে না লইয়া গেলে অনেক প্রাণিহত্যা হইত।” অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রেও চাতুর্যের আশ্রয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই চাতুর্যে বুদ্ধির জয়ই ঘোষিত। তাই লেখকের হিন্দুদের বাহুবল প্রতিপন্ন করার বিষয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবল ও চাতুর্য শব্দগুলি যুক্ত হওয়া সঙ্গত। যুদ্ধজয় বাহুবলে সম্ভব নয়, বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন ব’লেই যুদ্ধাদি ঘটনার বিবরণের মধ্যে অতি

অনায়াসে পাঠকের অনবধানতার সুযোগ নিয়েছেন, সেজন্য তার বক্তব্য উপন্যাসে হুবহু অনূদিত না হয়ে বিশেষ রূপান্তরিত। বস্তুত, প্রথম যুদ্ধের পর, বিশেষতঃ মবারকের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর, কাহিনী উপন্যাসের যথার্থ বিষয় জেবউন্নিসা-মবারক-দরিয়ার জটিল 'সম্পর্ক সন্ধানে ব্যাপৃত এবং গৌণ কাহিনী মুখ্য কাহিনী অপেক্ষা স্বল্পস্থান অধিকার করলেও কাহিনীটি গভীরতায় অতলান্ত, যেহেতু কাহিনীটি পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক নিরূপণের কর্মে নিয়োজিত, এবং মানব-মানবীর প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সক্রিয়, সেজন্য গৌণ কাহিনী মূল কাহিনীর ব্যাপ্তি ও বিস্তারের পাশে নিবিড় ও আন্তরিক। মূল কাহিনীর চরিত্র পূর্বাপর অপরিবর্তিত, •তাই ঘটনা স্রোতের প্রভাব উক্ত কাহিনীতে প্রায় শূন্য, অথচ গৌণ কাহিনীর চরিত্রগুলি ঘটনাবর্তে বিবর্তিত, সেজন্য সজীব। চরিত্র গুলির সজীবত্বের জন্য গৌণ কাহিনীর ফলশ্রুতি এত তীক্ষ্ণ ও গভীর, তাই পাঠক গৌণ কাহিনীর ট্র্যাজিক সমাপ্তিতে অভিভূত। এ-কাহিনীতে হিন্দুদের বাহুবল প্রতিপাদনের বা তত্ত্ব প্রমাণের চেষ্টা অবর্তমান। প্রেমের অগ্নিস্পর্শে তিনটি মানব-মানবীর ঈর্ষা-দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি আনুভূতিক তর-তমের প্রকাশ এ-উপাখ্যানের উপজীব্য, অথচ গৌণ কাহিনী মূল কাহিনীর সমান্তরালে বর্ণিত একটি স্বতন্ত্র কাহিনী নয়, বরং দুটি কাহিনী পরস্পরের সোদরের মত। ঔরঙ্গজেবের আদেশ প্রচারের (চঞ্চলকুমারীকে দিল্লী-আনা) মূলে জেব-উন্নিসা, এবং সেই আদেশ পালনের জন্য মবারকের রূপনগর যাত্রা, কিন্তু দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর মবারক দরিয়ার সংস্পর্শে নতুন মানুষ, সেই রূপান্তরই অবশেষে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে পড়ে। আবার দ্বিতীয় জন্মের পর মানিকলালের প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য মবারকের রাজপুত পক্ষে যোগদান যদিও কৃতঘ্নতা,

'তথাপি গৌণ কাহিনীর নায়কের কর্মেই (ঔরঙ্গজেবের রন্ধ্রমধ্যে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা) সম্ভব হলো চঞ্চলকুমারীর আশাপূরণ। অন্যদিকে জেবউন্নিসা ও মবারকের পুনর্মিলনের সহায় চঞ্চলকুমারী, এ-মিলন ক্ষণস্থায়ী, দরিয়ার প্রতিহিংসা নিবারণে যা ট্র্যাজিডিতে পরিণত। অর্থাৎ উভয় কাহিনী উভয়ের গতি-প্রকৃতির' দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু দ্বিতীয় কাহিনীর ট্র্যাজিক স্পর্শই পাঠকের কাছে গভীর অভিনিবেশের বিষয়। "রাজসিংহ" উপন্যাসের এবম্বিধ ফলশ্রুতি সম্পর্কে বিদিত ছিলেন ব'লেই হিন্দুদের বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অক্ষম বঙ্কিমচন্দ্র উপসংহারে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন, "অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই— হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।" ঔরঙ্গজেব অধার্মিক, রাজসিংহ ধার্মিক—এমন মন্তব্য রূপায়ণে সঙ্গত ঘটনাবলীর সংযোজনা প্রয়োজনীয়, অথচ তেমন ঘটনার বিবরণ উপন্যাসে বিরল। চঞ্চলকুমারীকে দিল্লী আনার আদেশ প্রচার কি ঔরঙ্গজেবের অধার্মিক মনের পরিচয়? উত্তর নঙর্থক, কারণ চঞ্চলকুমারীর চিত্র দলন যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে আত্ম-অবমাননাকর, আর সেই আত্ম-সম্মানহন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। অতএব এ-ঘটনাটি ঔরঙ্গজেবের অধার্মিক মনের পরিচায়ক নয়। শুধু একটি ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের অধার্মিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়, বাধ্য হয়ে সন্ধিস্থাপনের পর যখন ঔরঙ্গজেব সম্পূর্ণ স্বাধীন, তখন সন্ধিপত্র অবমাননা নিঃসন্দেহে অধার্মিক

মনের পরিচায়ক। কিন্তু এ-ঘটনা উপন্যাসের সমাপ্তিমুখের ঘটনা এবং এ-ঘটনার কোনও প্রভাবই উপন্যাসে পরিলক্ষিত নয়, বরং অন্দরমহলে যোধপুরী বেগমের পৌত্তলিকতা সহ্য করা ঔরঙ্গজেবের সহনশীলতার চিহ্ন। রাজসিংহের চরিত্রে বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা বিদ্যমান, কিন্তু তিনি যে ধার্মিক তার বিশেষ প্রমাণ উপন্যাসে নেই। অর্থাৎ উপসংহারে লেখকের বক্তব্য নিছক কথার কথা, অনুমিত সিদ্ধান্ত, উপন্যাসের চরিত্রায়ণে বা ঘটনা-সংস্থাপনে যা রূপায়িত নয়। বস্তুত উভয় প্রতিপাদ্য ঘটনার অতিরিক্ত চাপে উপন্যাসে অ-রূপায়িত থেকেছে। উপস্থাপনাপদ্ধতির দোষে বা গুণে লেখকের স্বীয় বক্তব্যের পরিবর্তে কাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী শিল্পায়ণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "রাজসিংহ"। ঘটনার নিজস্ব নিয়মে লেখকের প্রতিপাদ্য বিস্মৃত হওয়া আনন্দের বিষয় নয়, কারণ আপন বক্তব্য রূপায়ণ-ই লেখকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ; কিন্তু এক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য ঘটনার চাপে রূপান্তরিত হয়ে ঐশ্বর্যময় হয়েছে। "রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগ্রসর গতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।" (রবীন্দ্রনাথ)। দ্রুত লয়ে ঘটনা সঞ্চালিত হলেও ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী স্বয়ম্ভু নয়, কারণ সেই ঘটনাগুলি সামাজিক অর্থনীতিক রাজনৈতিক টানাপোড়নে উত্থিত। কিন্তু লেখক এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন না ব'লে ঘটনাগুলি ঘটনা হিসাবে মাত্র মূল্যবান, ওই ঘটনার সূত্রে জীবন-সামগ্র্য সন্ধান দুঃসাধ্য। কারণ ঘটনাগুলি এখানে শুধু

পরবর্তী ঘটনার জনক। ফলে "রাজসিংহ" উপন্যাসে গল্পের আকর্ষণ মুখ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্যদিকে "দুর্গেশ-নন্দিনী"তে দ্রুত ঘটনা সঞ্চালনে যে দোষ উদ্ভূত, আলোচ্য উপন্যাসে সেই দোষ প্রকট। যুযুধান দুপক্ষের মধ্যস্থলে চঞ্চল কুমারীর অকস্মাৎ আবির্ভাব, সৈন্যদলের সঙ্গে দরিয়ার আগমন, দরিয়া কর্তৃক মবারকের প্রাণরক্ষা, নির্মল কুমারীর প্রতি ঔরঙ্গজেবের আকৃষ্ট হওয়া প্রভৃতি কোনমতে সমর্থনীয় নয়। ঔরঙ্গজেবের মত কট্টর ধর্মান্ধের পক্ষে যোধপুরীবেগমের পৌত্তলিকতা সহ্য করা বিস্ময়ের নিঃসন্দেহে। এই সহনশক্তি ঔরঙ্গজেবের উদার মনেরই পরিচায়ক, অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবকে অসহিষ্ণু অধার্মিক রূপে অঙ্কিত করার প্রয়াসী ছিলেন, তাই এ-বিষয়টি স্ববিরোধী রূপে গণ্য। লেখক লোমহর্ষক ঘটনা নির্বাচনে পক্ষপাতী, সেজন্য চরিত্রের স্বকীয় বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত এবং ঘটনাবলী-ই চরিত্রগুলির নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। "রাজসিংহ"-এ সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ঘটনা উপেক্ষিত, ঘটনাগুলি অসাধারণ ও উদ্দীপ্ত মুহূর্তের ব'লে লেখকের দৃষ্টি চমক সৃষ্টির প্রতি নিবদ্ধ, যেজন্য ঘটনার ন্যায় বহুসময় লঙ্ঘিত। তবু উপন্যাসটির শেষ রক্ষা হয়েছে জেবউন্নিসা-দরিয়া-মবারকের কাহিনীতে। তিনটি চরিত্র তথাকথিত ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রে মঞ্চে আবির্ভূত হলেও চরিত্রগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, এবং একমাত্র এইজন্য "রাজসিংহ" উপন্যাসের গুণে সমৃদ্ধ। জেবউন্নিসা-মবারক-দরিয়ার কাহিনীতে পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, তাই এ-কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় গুণ পরিলক্ষিত। মূল কাহিনীর ব্যাপ্তি ও বিস্তারের পাশে গৌণ কাহিনী আনুভূতিক পরিবর্তনের চিত্র, সেজন্য কাহিনীটি তীক্ষ্ণ ও গভীর, এবং মূল কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে

ফাঁকে বিবৃত ব'লে সেই স্বল্পস্থানে সময় ও স্থান সংকোচন এ-কাহিনীতে স্বাভাবিক, ফলে কাহিনী বহুপরিমাণে নাটকীয় হয়ে ওঠে। হয়ত দরিয়া অনেকটা নিয়তির তাৎপর্য পায় ব'লে মবারক—জেবউন্নিসার প্রণয়-উপাখ্যান গতিযুক্ত নাটকীয়তার সূত্রে। তাই ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে গৌণ কাহিনী পাঠকমনে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই কাহিনীর জন্য "রাজসিংহ"-এর গল্প বলার আকর্ষণে কিঞ্চিৎ তাৎপর্য সন্ধান পণ্ডশ্রম নয়, নচেৎ উপন্যাসটি অন্যান্য দিকে "দুর্গেশনন্দিনী"র সঙ্গে তুলনীয়। "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসের ঘটনার অহেতুক দ্রুতলয়ে চলা, এবং ঘটনার দ্বারা চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করা "রাজসিংহ" উপন্যাসে সমভাবে লভ্য, এবং উভয় উপন্যাসে সেই একই দোষ (বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য ঘটনার একাকার) বর্তমান। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের মত "রাজসিংহ" উপন্যাস হিসাবে সার্থক নয়; কিন্তু যুদ্ধ, মোগল অন্তঃপুর, শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি বর্ণনায় "রাজসিংহ" অতুলনীয়।

গ. ঔপন্যাসিকের পরাজয়ঃ

"আনন্দমঠ" বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ সন্তান সম্প্রদায়ের যবন-কবলিত মাতৃভূমি উদ্ধারের বিষয় উপন্যাসের মূল উপজীব্য। দেশপ্রেম-কে কেন্দ্র করে আনন্দমঠের সৃষ্টি, এবং উপন্যাসের কাহিনী মঠকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, সেজন্য জীবানন্দ শান্তি, মহেন্দ্র কল্যাণী, কল্যাণী-ভবানন্দ প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পর্যবসিত না হয়ে সত্যানন্দর মাধ্যমে আনন্দমঠের আদর্শের অনুপ্রেরণায় সুগ্রথিত।

সত্যানন্দ চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্কামনা সিদ্ধ করার সহায়ক ব'লে সত্যানন্দ প্রায় ব্রহ্মের মত ব্যাপ্ত চরাচরে, প্রতিটি চরিত্রের সংকট কালে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ (সত্যানন্দ নিযুক্ত প্রতিনিধি) উপস্থিতি একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষে স্বাভাবিক, এমন মানুষের সাক্ষাৎ মরজগতে দুর্লভ। সত্যানন্দ কর্তৃক কল্যাণী উদ্ধার, সিপাহীদের শকট থেকে মহেন্দ্রর মুক্তি, মহেন্দ্র-কন্যার বিষভক্ষণের পর সত্যানন্দর আবির্ভাব, কারাগারে মহেন্দ্রকে আশ্বাসদান, ধীরানন্দর প্রহরী বেশে কারাগারে প্রবেশ, কল্যাণীর প্রতি ভবানন্দর দুর্বলতা জন্মানোর পর সত্যানন্দর ভবানন্দর প্রতি ধীরানন্দর মারফৎ প্রখর দৃষ্টিরাখা এবং পদচিহ্ন গ্রামে মহেন্দ্র-আবাসে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা ও নির্মাণ প্রভৃতি ঘটনাগুলি আজগুবি রোমাঞ্চ বা গোয়েন্দা গল্পের উপকরণ, কিন্তু উপন্যাসে লেখকের দায়িত্ব গভীর। ঔপন্যাসিক বাস্তবের কিছু হের ফের করলেও কাহিনী বা চরিত্রের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে অক্ষম, কারণ পাঠককে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস করানো তাঁর কর্তব্য। এ-কর্তব্য বিচ্যুতি নিশ্চয়ই ঔপন্যাসিকের পক্ষে গৌরবের নয়। সত্যানন্দ অসীম ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর সহায় সন্তান সম্প্রদায়। দীক্ষিত ও অদীক্ষিত—দুইশ্রেণী মিলিয়ে সন্তানদের সংখ্যা অগণ্য, কিন্তু অগণ্য ব'লেই সমস্ত কর্মে তাদের সহজ অনায়াস সাফল্য ঔপন্যাসিকের কাঙ্ক্ষিত হলেও উপন্যাসে সেই কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন প্রয়োজন, নিছক লেখকের খেয়াল ও প্রয়োজন বলেই গ্রাহ্য—এমন মত অন্তত আমাদের কঠোর সমালোচনারই বিষয়, কারণ সমালোচকের বিষয় উপন্যাস, উপন্যাসে কাহিনী-চরিত্র ইত্যাদি মাধ্যমে রূপায়িত লেখকের বক্তব্য। মহাপুরুষ চরিত্র সম্পর্কে সমালোচকের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই মহাপুরুষের কর্মকাণ্ড পরিবেশ ঘটনা প্রভৃতি

উত্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেবলমাত্র লেখকের মনস্কামনা সিদ্ধির উপায় হলে তার ব্যর্থতা প্রথমাবধি তা বলাই বাহুল্য।

নারী চরিত্রে সত্যানন্দর প্রতিরূপ শান্তি। শান্তি অবশ্য সর্বচারী নয়, কিন্তু নারী হিসাবে তার ভূমিকা সম্পর্কে পাঠকের সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ শান্তির অতীত জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা। 'কিন্তু সে-বর্ণনা কোন ক্রমে বিশ্বাস্য নয়, কারণ বঙ্গরমণী কুলে তেমন ললনা আকাশ কুসুমের মত অলভ্য, তাই কাপ্তেনের বন্দুক অকস্মাৎ হস্তগত করা, বৈষ্ণবী সাজে ইংরেজ শিবিরে প্রবেশ করে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা, সেই সংবাদ নিয়ে পদচিহ্ন অভিমুখে যাওয়া, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বামীর পাশে থাকা প্রভৃতি ঘটনাগুলি আকস্মিক ত বটেই, বরং এগুলি অলৌকিক শক্তির লীলা বলাই শ্রেয়, এবং সে সব ঘটনার কার্যকারণ যোগাযোগ ঔপন্যাসিক অজস্রবার নানাভাবে দিলেও কদাচ বিশ্বাস্য বা বাস্তব নামের উপযুক্ত। এমনকি স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ইহজগতের যে কোনও নারীর পক্ষে অস্বাভাবিক, "ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই।" শান্তির এ-উক্তি কেতাবী বুলি, হয়ত আদর্শ হিসাবে এ-উক্তির জুড়ি মেলা ভার, কিন্তু ছদ্মবেশে আনন্দমঠে প্রবেশের (স্বামী সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায়) পর এমন উক্তি লেখকের পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তম হলেও নারী হিসাবে শান্তির সমগ্র আচার আচরণ আমাদের কাছে প্রহেলিকা বিশেষ। তাই জীবানন্দর নবজন্মের পর শান্তির উক্তি, "আমরা আর গৃহী নই, এমনই দুইজনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চির ব্রহ্মচর্য পালন করিব" অন্ততঃ রক্তমাংস যুক্ত নারীর উক্তি নয়, লেখক সৃষ্ট প্রাণহীন আদর্শবাদীর যান্ত্রিক উক্তিমাত্র।

শান্তি ও সত্যানন্দ-র মাধ্যমে আনন্দমঠের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত বহুলাংশে, তাই এমন আদর্শবান পুরুষ নারী পরিচালিত আশ্রম আদর্শমঠের দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক ব'লেই এই পরিপূর্ণ আদর্শ চরিত্রের মধ্যে সজীব মানুষের চিত্র তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হওয়া স্বাভাবিক। ভ'ানন্দ তেমন একটি চরিত্র। আনন্দমঠের দীক্ষিত সদস্য হয়েও ভবানন্দ যে মানুষ, সে-প্রমাণ কল্যাণীর প্রতি আসক্তির ঘটনায় বিধৃত। কিন্তু রূপজমোহ ও তদৃজাত প্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের অনভিপ্রেত ছিল, সেজন্য তার প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক, "আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাক, আমি যাই।" এজন্য ভবানন্দর মৃত্যুবরণ অনিবার্য এবং ভবানন্দর চিত্ত কলুষিত ব'লে সে বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত, তাই ভবানন্দর মৃত্যুর পর ঔপন্যাসিকের মন্তব্য, "হায়! রমণীরূপ লাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকে ধিক!" নীতিবিদ বঙ্কিমেরই পরিচায়ক। অথচ জীবানন্দ ব্রতভঙ্গকারী হওয়া সত্ত্বেও শান্তির প্রভাবে সে স্থিতধি এবং ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাই জীবানন্দর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি অগাধ। শান্তি ও জীবানন্দর হিমালয়ের উপর কুটির নির্মাণ করে দেবতা আরাধনায় জীবন যাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণের পর লেখকের মন্তব্যে ("হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দর ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?") ঔপন্যাসিকের পূর্ণ সহানুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার গভীরতা প্রতিফলিত। অথচ তুলাদণ্ডের বিচারে ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে সমান দোষে ব্রতভঙ্গকারী। কিন্তু ভবানন্দর প্রণয় রূপজমোহ সঞ্জাত ব'লে এক যাত্রার পৃথক ফলের বন্দোবস্ত। চরিত্রের প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর স্বকীয় বিকাশের

পথে অন্তরায় বিশেষ। প্রতিটি চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা নিষ্প্রাণ জীব। জীবানন্দর মধ্যে কখনো কখনো ব্যক্তি মানুষটি উঁকি মারলেও শান্তিরূপী বিবেক সেই আবেগ অনুভূতি দমনের পক্ষে যথেষ্ট, ফলে জীবানন্দ কলের পুতুলে পরিণত হয়েছে। লেখকের আদর্শ ও তত্ত্ব হাসিল করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট চরিত্রের এরূপ ভাগ্য অবধারিত।

অন্যদিকে, উপন্যাসের প্রথমখণ্ডে উপস্থাপিত দুর্ভিক্ষ চিত্রটি অতি বাস্তব এবং দুর্ভিক্ষ যে ধনী দরিদ্র সকলের জীবনে বিপর্যয়কারী ঘটনা, তেমন ইঙ্গিত দিয়ে লেখক পাঠককে উদ্দীপ্ত করলেও মহেন্দ্র, কল্যাণীর পদচিহ্ন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাস্তব চিত্র লেখকের কাছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, এবং কাহিনী তখন থেকেই ঔপন্যাসিকের আদর্শ প্রচারের কর্মে নিয়োজিত। সেজন্য মহেন্দ্র-কল্যাণীর ক্ষুদ্র উপাখ্যানে আকস্মিক ঘটনার সংখ্যা নেহাৎ স্বল্প নয়। কল্যাণী অপহরণ, সন্তান সম্প্রদায় কর্তৃক কল্যাণী উদ্ধার, কন্যা ও কল্যাণীর বিষপান, জীবানন্দর শুধুমাত্র কন্যাকে গ্রহণ, ভবানন্দর সেবাশুশ্রূষায় কল্যাণীর নব জীবন লাভ ইত্যাদি ঘটনা আকস্মিকতারই নামান্তর এবং শেষ দুটি ঘটনা লেখকের প্রয়োজনেই সংঘটিত—ভবানন্দর পরিণতিই তার সাক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত "আনন্দমঠ"-এ অবাস্তব ঘটনার উদাহরণ অনায়াসে উদ্ধার যোগ্য। রণবিদ্যায় শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যগণের অদীক্ষিত, রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত বাঙালী লুঠেরার কাছে পরাজয় বরণ বঙ্কিমচন্দ্রের খেয়াল খুশীরই নিদর্শন। যুদ্ধে যতই অরাজকতা উপস্থিত হোক না কেন, যুদ্ধ জয়ের জন্য যথার্থ ও উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। সন্তান সম্প্রদায়ের এরূপ জয় দেশ প্রেমিকগণের আত্মশ্লাঘার বিষয় হলেও ঔপন্যাসিকের পক্ষে অগৌরবেরই বিষয়, যেহেতু উপন্যাস লেখকের কল্পনা বিলাসের

যথেচ্ছ লীলাক্ষেত্র নয়। তদ্রূপ দীক্ষিত সন্তানদের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, প্রলোভন জয় ইত্যাদির পরিচয় ঔপন্যাসিকের আদর্শবাদ প্রচারের সহায় হলেও এমন আদর্শবাদীর সাক্ষাৎ পাওয়া স্বর্গরাজ্যেও দুষ্কর। দেশপ্রীতির প্রতি অত্যধিক মমত্ব থাকার ফলে উপন্যাসের বাস্তবতাবোধ পদে পদে লাঞ্ছিত, যেজন্য আনন্দমঠের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে লেখক নীরব, এবং মুসলমান শক্তি-কেন্দ্রর অনতিদূরে আনন্দমঠের এমন সক্রিয়তা একমাত্র কল্পনা রাজ্যেই সম্ভব।

আসলে, "আনন্দমঠ" উপন্যাসের পরিকল্পনায় গোড়ায় গলদ, যেজন্য লেখকের কাছে সমস্ত বিষয়টি কুয়াশাবৃত প্রহেলিকা ও রহস্য বিশেষ। দেশপ্রেম "আনন্দমঠ"-এর মূল উপজীব্য। দেশপ্রেমের সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অথচ দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার ধারণা আধুনিক ধারণা, আধুনিক যুগের সামগ্রী। বঙ্কিমচন্দ্র সে-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন, "সমাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নয়, বিলাতী আমদানী। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, ৮)। কিন্তু লেখক স্বয়ং এই আধুনিক যুগের ধারণা ও সামগ্রী বিস্মৃত হয়ে উপন্যাসের ঘটনা মুসলমান শাসনের অন্তিমকালে স্থাপিত করায় যত অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ দেশভক্তি বা স্বাধীনতা সংগ্রামের আকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্ব-কালের আকাঙ্ক্ষা ও আকৃতি, সেই আকাঙ্ক্ষাটি ইংরেজ শাসনের সুদীর্ঘকাল অত্যাচারের ফসল। তাই এই ধারণাটিকে স্ব-কালের প্রায় একশত বৎসর পূর্বের ঐতিহাসিক পটে প্রতিষ্ঠা করা ইতিহাস ও সত্য বিকৃতি করার সামিল, ইতিহাসকে এমন পিছিয়ে নেবার জন্যই অযথা কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর

করতে হয়, সেজন্য সমস্ত পরিমণ্ডল ও পরিবেশ অ-সত্য এবং বাস্তববোধ শূন্য। সেজন্য স্থূল ঐতিহাসিক ঘটনাটি বঙ্কিমের কাছে বিকৃত। এ-সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য, "তাঁহার 'সন্তানেরা' বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগ শাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত, কিন্তু যেসব "সন্ন্যাসী ফকিরেরা" সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূমে নহে) এসব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদগীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। * * * সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত, মাতৃভূমি উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টদের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই ব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র।" (ভূমিকা, পৃ: ।৶০ সাহিত্য পরিষৎ সং)। বঙ্কিমের সমকালের মানুষ হয়ত বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে দেশউদ্ধারের জন্য এমন আকুল ছিল, হয়ত এই আকুলতায় বঙ্কিম-মানসের অভীপ্সা প্রতিফলিত, কিন্তু সেই অভীপ্সাকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা অন্যায় ও সত্য নয়। উপন্যাসটির এই অ-বাস্তবতার জন্য দায়ী তাই বঙ্কিমচন্দ্রর প্রচণ্ড আদর্শবাদ, অথচ এ আদর্শ-বাদেরও গোড়ায় গলদ, কারণ স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ধারণাও অস্পষ্ট, "স্বদেশী রাজা অনেকসময় স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীরাজা অনেকসময় স্বাধীনতার মিত্র।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, ৮)। সেজন্য সত্যানন্দর কাতর প্রার্থনার উত্তরে মহাপুরুষের উক্তিতে, "ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমায় অনুসরণ কর", আমরা

বিমূঢ় হতে বাধ্য এবং ইংরেজ শাসনের প্রায় এক শতাব্দী পরে বঙ্কিমচন্দ্রের এ ধারণা নিশ্চয়ই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয় এবং ইংরেজ শাসনে নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ যে সম্ভব নয় বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য রচনায় সে-বিষয়ে ইঙ্গিত ইতস্তত ছড়ানো ছিটনো আছে। বরং মহাপুরুষের একটি উক্তি, "আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তি কাহারও নাই", সে-সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য ব'লে বিবেচিত। তাই সন্তান সম্প্রদায়ের পরাজয় বরণ অথবা সংগ্রাম থেকে বিরত থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যেজন্য এত প্রয়োজন (সন্তান সম্প্রদায়ের সংগ্রাম ও মাতৃভূমি উদ্ধারের সংকল্প) সেই আয়োজন শেষে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার মত, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সন্তান সম্প্রদায়কে বিজয়ী আখ্যায় ভূষিত করতে অক্ষম হলেন। বস্তুত অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধারণা ও সেই ধারণার অনুপ্রেরণায় কাহিনী ও চরিত্র নির্বাচন কিছুই উপন্যাস রচনার অনুকূল নয়, সেজন্য আনন্দ-মঠের দেশভক্তি বা জাতীয় সঙ্গীত রাজনীতিবিদদের আত্মশ্লাঘার বিষয় হলেও উপন্যাস-সমালোচক "আনন্দমঠ"কে উত্তীর্ণ উপন্যাস-রূপে শিরোপা দিতে অক্ষম, কারণ "আনন্দমঠ" উপন্যাসের পরিবেশ, চরিত্র বা কাহিনী উপন্যাসোচিত বিশ্বাস্যতায় সম্যক প্রকাশিত নয়।

"আনন্দমঠ" উপন্যাসের অবাস্তবতার ছায়া "দেবীচৌধুরাণী" উপন্যাসেও বর্তমান। নায়িকা প্রফুল্লর জীবনের তিনটি স্তর উপন্যাসে বর্ণিত। প্রথমস্তরের কাহিনী একটি ভাগ্যহতা রমণীর আলেখ্য, যে রমণী দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার আঘাতে নিপীড়িত। দ্বিতীয়স্তরে এই ভাগ্যহতা রমণী অকস্মাৎ সৌভাগ্যের উচ্চ চূড়ায় উপনীত। প্রথমে বৈরাগীর ধনপ্রাপ্তি ও পরে ভবানী পাঠকের সঙ্গে পরিচয় ও শিক্ষাদীক্ষায় প্রফুল্ল নিষ্কাম আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেবীচৌধুরাণী-তে

রূপান্তরিত, শেষস্তরে দেবীর গৃহাসক্তি ও সেই আসক্তির ফলে পুনরায় প্রফুল্লর সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বর্ণিত। কিন্তু গ্রন্থারম্ভের প্রফুল্লও গ্রন্থশেষের প্রফুল্ল এক ব্যক্তি নয়। প্রথম প্রফুল্ল নিতান্ত রমণী, যার আহার, নিদ্রা ও স্বামীর প্রতি আকর্ষণ দুর্বার। কিন্তু রূপান্তরিত প্রফুল্ল "নিষ্কাম ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়া যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।" অর্থাৎ অদীক্ষিত প্রফুল্ল-র দীক্ষিত প্রফুল্লে উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনী "দেবীচৌধুরাণী" উপন্যাসের মূল উপজীব্য, এবং এ-উত্তরণের চিত্র দ্বিতীয় স্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা উচিত, কারণ সংসারী প্রফুল্ল যে নিষ্কামধর্মে উত্তীর্ণ, তার সূচনা ও পরীক্ষা দ্বিতীয় স্তরে বর্ণিত হয়েছে। কল্পিত ডাকাতের ভয়ে প্রফুল্লর ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ থেকেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা, এবং এ-অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ের যাবতীয় বাস্তবচিত্র অচিরে ম্লান করে অবাস্তবতায় পর্যবসিত হয়। পর্বের আরম্ভ একটি আকস্মিক ঘটনায় (ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ ও বৃদ্ধের মৃত্যুর পর ধনলাভ), পর্বের শেষও একটি আকস্মিক যোগাযোগে (স্বামী ও শ্বশুরকে ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষার সময় ঝড়ঝঞ্ঝার আবির্ভাব) এবং এই দুই আকস্মিকতার প্রথমদিকে ভবানী পাঠকের সঙ্গে প্রফুল্লর সাক্ষাৎ ও ভবানী পাঠকের কাছে গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ বর্ণিত। ভবানী পাঠকের শিক্ষান্তে প্রফুল্ল-সত্তার আত্ম-বিসর্জন, দেবীচৌধুরাণীর আবির্ভাব। কিন্তু প্রফুল্ল থেকে দেবী সত্তায় রূপান্তরের বাহ্যিক বিবরণ (খাওয়া-শোওয়া, পঠন-পাঠন,

মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ হলেও প্রফুল্লর মানসিক রূপান্তরের কাহিনী উপন্যাসে উহ্য, পাঠক শুধু এই শিক্ষণের বিষয় অবগত হয়ে দেবীচৌধুরাণীর সাক্ষাৎ পান। কিন্তু দেবী প্রফুল্ল প্রথম-স্তরের প্রফুল্ল নন, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অন্য এক নারী। অথচ দেবীচৌধুরাণীর আচার-আচারণে সেই রূপান্তরিত প্রফুল্লর চিত্র সন্ধান পাওয়া তুঃসাধ্য, কারণ প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী হয়ে উঠলেও তার অন্তরে অন্তরে সেই পতিপ্রাণা প্রফুল্ল সত্তাই বিরাজিত। এ-শিক্ষা প্রফুল্লর জীবনে কোনও প্রভাব বিস্তার করে নি, তার স্বপক্ষে বহু উদ্বৃতি উদ্ধারযোগ্য। দেবীগিরিতে তার অনিচ্ছা একাধিক সংলাপে প্রকাশিত, বিদায় মুহূর্তে রঙ্গলালকে প্রফুল্লর উপদেশ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, "আর কখনও লাঠি ধরিও না। তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন। ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। তুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন—তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার লইও—কিন্তু তুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও।" অর্থাৎ ভবানী পাঠকের শিক্ষায় প্রফুল্ল অপরিবর্তিত, দেবীগিরি প্রফুল্লর জীবনে নির্মোক মাত্র, দেবীচৌধুরাণী আসলে মর্মে মর্মে প্রফুল্লই। অথচ এই শিক্ষাদানই উপন্যাসের বাস্তবিকতার পক্ষে প্রতিবন্ধক বিশেষ। ভবানী পাঠকের চরিত্র, রঙ্গলাল এবং সমগ্র ডাকাত-দলের সঙ্গে বাস্তবের যোগ শূন্য, এমন ন্যায়পরায়ণ দস্যুদল, আদর্শ প্রণোদিত মানুষ কেতাবী মানুষ, কিন্তু দেবীচৌধুরাণীর জীবনে এ-শিক্ষার প্রয়োজন কি-? উত্তর—নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষা। 'কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যে-পদ্ধতি অনুসৃত, সেই পদ্ধতিতে অনুশীলন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচারিত হলেও উপন্যাসে এটি আরোপিত তা বলাই বাহুল্য। প্রথমস্তরের প্রফুল্লর পতিপ্রাণ সত্তা শেষস্তরের

প্রফুল্লর সদৃশ, যদিও শেমন্তরের প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

একটি ভাগ্যহতা নারীর নানা দুঃখময় পরিস্থিতি ও দুর্ঘটনা অতিক্রম করে অবশেষে স্বামীর সুখ সান্নিধ্যলাভ এবং সংসার জীবনে পুনঃপ্রবেশের কাহিনী "দেবীচৌধুরাণী" উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্ব আরোপ সত্ত্বেও স্বতই পরিলক্ষিত, সেজন্য উপন্যাসে বাস্তব চরিত্র ও চিত্রের সাক্ষাৎ দুর্লভ নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র এই 'চিত্রে সন্তুষ্ট নন, তাই গ্রন্থ শেষে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র ; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম্। * *" ঘোষণায় ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছেন। গ্রন্থশেষে এই ঘোষণার প্রয়োজন একমাত্র গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের প্রচারের জন্য, অথচ উপন্যাসের কাহিনীতে বিশেষতঃ নায়িকার চরিত্রে তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ, বরং সাগরবৌ, নয়ানবৌ ব্রহ্মঠাকুরাণীর চিত্রের বাস্তবতা পাঠকের কাছে মরুদ্যান বিশেষ। উপন্যাস তত্ত্ব প্রতিদানের বাহন হলে সে-উপন্যাসের ভাগ্য মন্দ, এবং তেমন গ্রন্থ ধর্মপ্রচারের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও সৃজনশীল সাহিত্যে তার মান অতি নিম্নে—এমন্তব্য নিশ্চয়ই সর্বজনমান্য। বঙ্কিম-ভক্ত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও "দেবীচৌধুরাণী" সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত নন, "এই উপন্যাসখানিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসের স্বেচ্ছা-পরাজয় বলা যাইতে পারে। গল্প রচনার সেই যাদু শক্তি ইহাতেও আছে—বঙ্কিম কাব্য রসও ইহার 'কোন কোন অংশে উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু সেই কবিশক্তিকে একরূপ জোর করিয়া তিনি এই উপন্যাসে শাস্ত্রোপদেশের ভার বহিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার অন্তর্গত অভিপ্রায় এই যে—দেশ ও সমাজ

এই দুয়েরই কল্যাণ-সাধনই নিষ্কাম কর্মের সাধনা বটে, তাহাতেই মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা, কিন্তু কর্মের ছোট-বড় নাই—তাহাতে ঘনঘটা বা বীরত্বাভিমান নিষ্প্রয়োজন; * * * এই তত্ত্বটি বুঝাই-বার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ কবি নয়—ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকায় ঐ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, কাব্যই উহার উৎকৃষ্ট বাহন—মহাভারতকার তো তাহাই করিয়াছেন। ফলে যাহা ঘটিয়াছে তাহার মত দুর্ঘটনা সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে আর কোথাও ঘটে নাই।" (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, পৃ: ৬০-৬১)।

"সীতারাম" উপন্যাসের মূল কাহিনী সীতারাম-শ্রী কেন্দ্রিক। এ-উপন্যাসে রূপজমোহের আতিশয্যে নায়কের অধঃপতনের চিত্র ঔপন্যাসিকের বর্ণনীয় বিষয়ের প্রধান উপজীব্য। এই কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত গঙ্গারামের কাহিনীতে সেই একই চিত্র অঙ্কিত। গঙ্গারামের অবৈধ প্রণয় আদৌ শুভ নয়, লেখক সেই প্রতিপাদ্য প্রমাণে প্রয়াসী। সীতারামের পত্নীপ্রেম যদিও বৈধ, তবু সেই পত্নীপ্রেমে ইন্দ্রিয়লালসা প্রকট ব'লে সীতারামের পতন অনিবার্য, অবশ্য সীতারামের প্রণয় বৈধ হওয়া সীতারাম শেষে মহাজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু গঙ্গারামের প্রণয় অবৈধ, সেজন্য তার শাস্তি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু গঙ্গারামের কৃতঘ্ন হওয়ার সংকল্প আকস্মিক। গঙ্গারাম যদিও আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর, তবু মুরলার কথা শুনে ("পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু আমি রমাকে ছাড়িব না",) বিশ্বাসঘাতক হওয়ার চিত্রটি বিশ্বাস্য নয়, কারণ মুরলার উক্তিকে চরম ব'লে ধরা গঙ্গারামের মত চরিত্রের পক্ষে অস্বাভাবিক। অন্তত এ-বিষয়ে গঙ্গারামের কিছু সংশয়ের উদ্রেক হলে পরিবর্তনটি স্বাভাবিক হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু ঔপন্যাসিকের প্রয়োজন, অতএব সেই মত পরিবর্তন আবশ্যক

ও অনিবার্য। অথচ গঙ্গারামের চরিত্রে বিশ্বাসঘাতক হওয়ার বীজ বিচারের দৃশ্যে পালানোর মধ্যে লভ্য। রমার প্রতি গঙ্গারামের প্রথমদিকের আচরণ সংযত ও সুস্থ এবং সেই চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গারামের সহসা রূপতৃষ্ণা জাগার ঘটনা আকস্মিকতারই নামান্তর।

সীতারাম চরিত্রে অবশ্য এমন স্ববিরোধিতা প্রকট নয়, কিন্তু মূল কাহিনী আকস্মিক, অবাস্তব ও অস্বাভাবিক ঘটনায় পূর্ণ, যেজন্য সীতারাম-শ্রীর কাহিনী বহুসময় ভোজবাজির মত মনে হয়। শ্রীর বৈতরণী-তীরে গমন, সেই স্থানে জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, শ্রী ও জয়ন্তীর সঠিক সময়ে (মুসলমাম আক্রমণের পূর্বে) সীতারামের রাজধানীতে আবির্ভাব, দেবীরূপে জয়ন্তীর সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা, সীতারামের অকস্মাৎ উপযুক্ত ক্ষণে তোপের সামনে আসা ও নগর রক্ষা প্রভৃতি ঘটনাবলীর কার্যকারণ সূত্র সন্ধান পণ্ডশ্রম। উপন্যাসে একমাত্র সীতারামের চরিত্রে বাস্তবতা বর্তমান, অন্তত শ্রীর প্রতি আকর্ষণে সীতারামের ক্রমে রাজ্য, প্রজা সম্পর্কে উদাসীন নির্বিকার হয়ে আত্মসুখ সন্ধানে অধঃপতিত হওয়ার চিত্রটি কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল। অবশ্য সীতারামের ট্র্যাজিডি বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য হলে উপন্যাসটির সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সীতারামের উত্তরণের কাহিনীর প্রতি নীতিবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রহী ব'লে দুর্গ আক্রমণের মুহূর্তে সীতারামের চৈতন্যোদয় ঔপন্যাসিকের নীতির শাসনানুযায়ী সম্ভব হলেও উপন্যাসগুণ বর্জিত হিসাবেই বিবেচ্য হবে।

দৈব ও গণনার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ উপন্যাসটির অন্যতম দুর্বলতা। "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" ব'লেই শ্রী সীতারামের পরিত্যজ্য, কিন্তু শ্রী যার মৃত্যুর কারণ, সে গঙ্গারাম—তার ভাই।

শাস্ত্রবচন বঙ্কিমের কাছে ধ্রুব সত্য, তাই শাস্ত্রবচনের মর্যাদা রক্ষা তাঁর প্রধান কর্তব্য, অতএব শ্রী ও জয়ন্তীকে দেখে "গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল।" কিন্তু কেন? এমন অহেতুক সরে দাঁড়ানো কি যোগবলের প্রভাব? পাঠক গঙ্গারামের দ্বিতীয় বিচারের সময় জয়ন্তীর যোগবলের শক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। জয়ন্তীর ত্রিশূল গঙ্গারামের বক্ষস্পর্শ করামাত্র স্বীকারোক্তি মুখ নিঃসৃত হওয়ার ঘটনা যোগশক্তির প্রভাব ঘোষণা করলেও উপন্যাসে এমন অলৌকিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা কার্যকারণের ঊর্ধ্বে, সুতরাং উপন্যাসোচিত নয়। বস্তুত "আনন্দমঠ", "দেবীচৌধুরাণী", "সীতারাম" উপন্যাস তিনটি অনুশীলন তত্ত্ব প্রচারের মাধ্যম হওয়ায় উপন্যাসগুলি অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, অবাস্তব ঘটনার ভাণ্ডার হয়ে ওঠে, ফলে তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে গল্পরচনার যে শক্তি তাঁকে প্রথম ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই গল্পরচনা শক্তি শেষ তিনটি উপন্যাসে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। লেখকের অযাচিত উপস্থিতি ও তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য টীকা ভাষ্যদান অতিরিক্ত হলে উপন্যাসের নিয়ম কিঞ্চিৎ ব্যাহত হলেও সময় সময় ক্ষমার্হ; কিন্তু তত্ত্বপ্রচার লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য হলে জীবনসামগ্র্য বা জীবনের সজীব- মুহূর্ত প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দু-টি উপন্যাস ব্যতীত ("কপালকুণ্ডলা"-য় তিনি একটা আশ্চর্য সমস্যা রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন) সমস্ত উপন্যাসে লেখকের বক্তব্যের (বিশেষতঃ নৈতিক তত্ত্ব) আধিপত্য উপন্যাসগুলির সাফল্য লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছে। বঙ্কিম-উপন্যাসে নীতির প্রশ্নই মূল প্রশ্ন এবং সে-নীতি সনাতন ধর্ম

অনুমোদিত। ফলে শুভ এবং অশুভর দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে জীবন হিসাবে চিহ্নিত ছিল, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ঔপন্যাসিক নিয়মে স্থাপিত নয় ব'লে সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবন্ত না হয়ে লেখকের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। ফলে বঙ্কিম-উপন্যাসে প্রায় সময়ে চরিত্র (শৈবলিনী, গোবিন্দলাল প্রভৃতি দু-একটি ব্যতিক্রম) দ্বন্দ্বহীন। নীতির প্রশ্ন জীবনের প্রশ্ন থেকে মূল্যবান বলে বঙ্কিম-উপন্যাসে অঘটনের এত ছড়াছড়ি। সূচনায় বহু উপন্যাস অতি স্বাভাবিক ও বাস্তব হয়েও মধ্যবর্তী কোনও এক অধ্যায়ে বিপর্যস্ত হয় লেখকের তত্ত্ব প্রমাণের আগ্রহের জন্য। তত্ত্বের জন্য কাহিনীর পরিবর্তন এবং তত্ত্ব প্রকাশের জন্য কাহিনী নির্বাচিত হলে সে-উপন্যাসের দুর্গতি পদে পদে। আকস্মিক ও অসম্ভব ঘটনার জন্যও বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রগুলির বিকাশ বহুসময় ব্যাহত, এবং সময় সময় চরিত্রগুলির উত্তর-চিত্র পূর্ব-চিত্রের বিবর্তনে রচিত নয়, সহসা লেখকের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়। নিয়তি লেখকের একমাত্র অবলম্বন, অথচ এই নিয়তি তাড়িত চরিত্রগুলির কার্যধারা দৈব, স্বপ্ন, অমুলপ্রত্যক্ষ, অদৃষ্ট গণনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব'লে সম্পর্কগুলির মূল্যায়ন সর্বদা সৃষ্টিশীল সাহিত্যের নিয়মে ঘটে না, বরং সেইসব ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের ইচ্ছাই স্বরাট হয়ে দাঁড়ায়। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষ ও পরিবেশের দ্বান্দ্বিক নিয়ম, মন ও পরিবেশের বিকাশমান সম্পর্ক সম্বন্ধে উদাসীন থেকে নিশ্চল আদর্শবাদী নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট ছিলেন, সেজন্য উপন্যাসগুলি সফল উপন্যাস হয়ে ওঠে নি।

এতদসত্ত্বেও বঙ্কিম-উপন্যাস আমাদের একান্ত বিচার্য, কারণ উপন্যাস তাঁর কাছে অবসর বিনোদনের বস্তু ছিল না। "কৃষ্ণ-কান্তের উইল"-এর বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে তাঁর উক্তি,

"কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যামাত্র। একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া, কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস-পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ-সকল উপন্যাস পাঠ না করিলে বাধিত হই" যে কোনও সৎ লেখকেরই বক্তব্য। উপন্যাস যে সিরিঅস সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রতীতি আমাদের শ্রদ্ধেয়, তাই শতক্রটি সত্ত্বেও বঙ্কিম-উপন্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সমালোচকের অবশ্য কর্তব্য, এবং একথাও অস্বীকার করা দুঃসাধ্য যে, "চোখের বালি" পর্যন্ত রচিত বাংলা উপন্যাস বঙ্কিম প্রভাবিত, এমনকি উক্ত উপন্যাসে বঙ্কিমের মৃদু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে একারণেও বঙ্কিম-উপন্যাস আমাদের যত্ন ও সশ্রদ্ধ সমালোচনার বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বয়স্ক মনন অদ্যাপি আমাদের অনুধাবন যোগ্য, কারণ সেই মননের যোগ্য বিশ্লেষণে আমরা উপকৃত হতে বাধ্য, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাব-ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তাঁর কাছে উপন্যাস মননেরই অঙ্গীভূত ছিল।

ঘ. প্লটের শ্রেণী বিভাগ :

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে বক্তব্য রূপায়ণে যতখানি মনোযোগী এবং আগ্রহী ছিলেন, বঙ্কিম পরবর্তী ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে সে-আগ্রহ ততোধিক অবর্তমান, অথচ রমেশচন্দ্র দত্ত কিংবা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে উপন্যাস রচনা বিলাস ব্যসনের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের উপন্যাসে ঘটনা ও কাহিনীর টানই অতিশয় প্রবল, বক্তব্য সেখানে প্রায়ই অনুপস্থিত। হয়ত বঙ্কিমের মত কল্পনাশক্তির অভাব বা দৃষ্টিভঙ্গীর অস্বচ্ছতা এজন্য দায়ী, সেজন্য "চোখের বালি" পর্যন্ত রচিত বাংলা উপন্যাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা প্রায়

শূন্য। এমনকি বঙ্কিম-উপন্যাসে আখ্যান-ভঙ্গীতে যে নতুন রীতির সূত্রপাত "ইন্দিরা" বা "রজনী"-তে, শত শত উপন্যাসের মধ্যে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল, দু-তিনটি উপন্যাসে তেমন প্রচেষ্টা বা অন্য নতুন প্রচেষ্টা অবশ্য আমাদের আশার স্থল, কিন্তু প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যার অনুপাতে সে প্রয়াস নগণ্য, এমনকি রমেশচন্দ্র ও তারকনাথ প্রভৃতি দু-একজন ঔপন্যাসিকের জীবনাগ্রহও অনেকের মধ্যে অবর্তমান, সেই সব ঔপন্যাসিকের মূল এবং একমাত্র অবলম্বন, আকর্ষণ এবং আশ্রয় কাহিনী এবং ঘটনা। বস্তুত, বঙ্কিমের পর রচিত সকল উপন্যাসের প্রধান ও মূল আকর্ষণ কাহিনী ও ঘটনা। কাহিনী ও ঘটনার কার্যকারণে উত্থিত প্লটের বৈশিষ্ট্য বিচারই তাই এ-অংশে আমাদের উপজীব্য।

কাহিনীর সংখ্যা, একাধিক উপকাহিনীর অস্তিত্ব ইত্যাদি উপন্যাসের বাহ্য লক্ষণ মিলিয়ে প্লটকে সাধারণভাবে জটিল, সরল ও যৌগিক তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। তিন শ্রেণীর প্লটের পর্যালোচনা করে যে-সাধারণ ধর্ম জটিল, সরল ও যৌগিক প্লটে বর্তমান, সেই সব বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে অসংখ্য প্লট-প্রধান উপন্যাসের মধ্যে আলোচনার যোগ্য দু-তিনটি উপন্যাসের প্লট গঠন সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করলে সমালোচকের অভিপ্রায় পাঠকের বোধগম্য হবে ব'লে আশা করা যায়।

জটিল প্লট ঃ

দুই কিংবা ততোধিক কাহিনীর সংযোগে নির্মিত প্লট জটিল রূপে গণ্য। প্লটের জটিলতা অবশ্য উপকাহিনীর সংখ্যাধিক্যের উপরও নির্ভরশীল। কাহিনীগুলি উপন্যাসের প্রারম্ভে বিপরীত

কোটিতে স্থিত হলেও সব কাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত করানোই ঔপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ বিভিন্ন কাহিনী, উপকাহিনীর চরিত্রদের ভাগ্যচিত্র অঙ্কিত হলেও মূল কাহিনীর নায়ক কিংবা নায়িকা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা কাহিনীর পরিচালক, সেজন্য মূল কাহিনীর নায়ক নায়িকা উপন্যাসের নায়ক নায়িকা রূপে পরিচিত হয়। কাহিনী বা উপকাহিনীগুলি আপাত অসংলগ্ন মনে হলেও বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে একটা যোগসূত্র বিদ্যমান, যে যোগসূত্র ছিন্ন করলে কাহিনীগুলি স্বতন্ত্র, স্বাধীন কাহিনীতে পরিণত হয়, কোনও একটি চরিত্রের দ্বারা সংযোগ সাধন করা জটিল প্লটের সাধারণ নিয়ম।

প্লট-প্রধান বাংলা উপন্যাসের অধিকাংশই জটিল লক্ষণযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা", "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "দেবীচৌধুরাণী" ব্যতীত সব উপন্যাসের প্লটই জটিল। জটিল প্লট রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কৌশলই রমেশচন্দ্র দত্তর প্রায় সব উপন্যাসে অনুসৃত। বিপরীত কাহিনীর উপস্থাপনায়, মহাপুরুষ অবতারণায়, পাঠককে সম্বোধন করে উপদেশ বিতরণে, আদর্শবাদী নায়ক-নায়িকার চরিত্র-চিত্রণে রমেশ-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবই পরিলক্ষিত। এমন কি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অন্তত শেষের দু-টিতে বঙ্কিমের স্বদেশ প্রেমের এবং আদর্শ প্রণয়ের চিত্র-ই অনুসৃত হয়েছে। রমেশচন্দ্র বঙ্কিম প্রদর্শিত পথের প্রথম কৃতী অনুগামী নিঃসন্দেহে।

"বঙ্গবিজেতা" রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্য থাকা স্বাভাবিক, এবং রমেশচন্দ্রর ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান প্রশ্নাতীত সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের প্রচুর পরিবেষণ উপন্যাস রচনার পথে বিশেষ অন্তরায়—তার প্রমাণ "বঙ্গবিজেতা"। ইতিহাস প্রচুর স্থান

জুড়ে থাকে ব'লে কাহিনী নিস্তরঙ্গ ও প্রাণহীন, যদিও এ-উপন্যাসে কাহিনী ও ঘটনার প্রাচুর্য স্বতঃই লক্ষণীয়, অথচ সে-কাহিনী ইতিহাসের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। মহাশ্বেতা-সরলা-ইন্দ্রনাথ (সুরেন্দ্রনাথের ছদ্মনাম) ও সতীশ-শকুনি-বিমলা কেন্দ্রিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি নাতি দীর্ঘ উপাখ্যান টোডরমল্ল ও ইন্দ্রনাথের। সিদ্ধান্ত করা কঠিন নয় যে, "বঙ্গবিজেতা"-র প্লট জটিল। এছাড়াও, অনেক অবান্তর ঘটনা ও বর্ণনার আধিক্য উপন্যাসে প্রকট। চন্দ্রশেখরের ভূমিকা ও উপেন্দ্র-কমলার কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। একমাত্র সুরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব প্রমাণের জন্যই কি উপেন্দ্র-কমলার কাহিনী রচিত ? "বঙ্গবিজেতা" সার্থক উপন্যাস নয়, এই উপন্যাসে ভবিষ্যত ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রকে আবিষ্কার করা দুষ্কর।

"শতবর্ষ" সংকলনের দু-টি উপন্যাস "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" ও "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা" কথঞ্চিৎ আশা ব্যঞ্জক। "দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ" করার উদ্দেশ্যে উপন্যাস দু-টি রচিত, সেজন্য দেশ-প্রেমের জ্বলন্ত চিত্র উভয় উপন্যাসের উপজীব্য, যদিও সে-দেশপ্রেম আধুনিক কালের বিচারে সংকীর্ণ ও পক্ষপাত দুষ্ট বলে মনে হবে। শিবজী বা রাণা প্রতাপের স্বদেশপ্রেম হিন্দুর স্বধর্ম প্রেম রূপেই গণ্য, তথাপি উভয়ের শৌর্য-বীর্য, স্বাধীনতা রক্ষার স্পৃহা লেখকের সংকীর্ণ স্বার্থজাত নয়; এ-দৃষ্টির সীমাবদ্ধতায় তৎকালীন সামাজিক বা রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা প্রতিফলিত। হয়ত ইংরেজ শাসনের স্বরূপ সঠিক ধরতে না পারা এর মূল কারণ। অবশ্য এর অন্য কারণ থাকা সম্ভব, কিন্তু সে-প্রশ্নের উত্তর বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত বিষয়।

"মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত", এবং "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা", সীমিত অর্থে হলেও, স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল আলেখ্যরূপেই বিবেচিত। বিষয়বস্তুর স্বাধর্ম্যের জন্য উপন্যাস দু-টির প্লটের তুলনামূলক আলোচনা করা যুক্তি সঙ্গত। "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" উপন্যাসের মূল কাহিনীর নায়ক রঘুনাথ। রঘুনাথের সঙ্গে সরযুর সাক্ষাৎ ও প্রণয় উন্মেষ, শিবজীর দুর্গ-বিজয়, উৎসবে পুরস্কার বিতরণের সময় চন্দ্ররাও-এর আবির্ভাব, বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে রঘুনাথের শাস্তিলাভ, এই আখ্যায়িকার বর্ণনীয় বিষয়। এ-কাহিনী অবশ্য অন্যদিকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ হয় রঘুনাথের ছদ্মবেশ ধারণের পর। সীতাপতি গোস্বামী (রঘুনাথের ছদ্মনাম) কর্তৃক শিবজীর প্রাণরক্ষা, শিবজীর বিচার, চন্দ্ররাও-এর আত্মহত্যা ও রঘুনাথের সঙ্গে সরযুর মিলন—সমগ্র মূল কাহিনীর বিষয়। এই কাহিনীর সঙ্গে গ্রথিত অন্য কাহিনীটি শিবজী কেন্দ্রিক। শিবজী কর্তৃক সায়েস্তা খাঁ-র পরাভব, শিবজী—আরংজীব সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকারের সময় শিবজীর বন্দী হওয়া এবং কৌশলে পালানো উক্ত আখ্যায়িকায় লিপিবদ্ধ। কাহিনী দু-টি সুগ্রথিত ব'লে উপন্যাসের পক্ষে দু-টি কাহিনী অপরিহার্য। শুধুমাত্র কাহিনী দু-টি পরস্পর পরস্পরের প্রভাবাধীন-ই নয়, লেখকের ইচ্ছা ও বাসনা শিবজী ও রঘুনাথ উভয় চরিত্রের কার্যাবলীতে সমান পরিস্ফুট। হয়ত শিবজীর মধ্যে দেশ রক্ষার বা স্বদেশ প্রেমের উচ্ছ্বাস বেশী, কিন্তু নীরব কর্মী রঘুনাথের কর্মে কি সেই একই উচ্ছ্বাস প্রকাশিত নয়? পক্ষান্তরে "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা" উপন্যাসের মূল কাহিনী (তেজসিংহ-দুর্জয়সিংহ কেন্দ্রিক) ও গৌণ কাহিনী (প্রতাপসিংহ কেন্দ্রিক) সমান্তরালে প্রবাহিত ও দ্বিধা বিভক্ত। পারিবারিক বিবাদ ও কলহের চিহ্ন জাতীয় বিপর্যয়ের সময় লুপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, তেজসিংহ-দুর্জয়-

সিংহের কাহিনীতে প্রতাপসিংহের কাহিনীর অবতারণায় সেই ধারণা প্রকাশিত, অথচ গৌণ কাহিনীটির উচ্চতান মূল কাহিনীতে প্রায় অশ্রুত। লেখকের বক্তব্য যে গৌণ কাহিনীতে রূপায়িত, সে-কাহিনীর প্রভাব মূল কাহিনীতে অবর্তমান। উভয় উপন্যাসের মূল কাহিনী পরিবার কেন্দ্রিক বা রাজনীতির আবেষ্টনমুক্ত, কিন্তু গৌণ কাহিনী উভয় উপন্যাসে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

অবশ্য "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত"-এর মূল কাহিনীর নায়ক শৌর্য বীর্যে স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপ্ত, কিন্তু এমন আদর্শবাদী চরিত্রেও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। একদিকে কর্তব্যের প্রতি অপূর্ব নিষ্ঠা, অন্যদিকে সরযুর প্রতি প্রেম—রঘুনাথের মনে নিশ্চয়ই উদ্বেগ সৃষ্টিকারী, নচেৎ শিবজী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সে এত বিচলিত বা চিন্তিত হয় কেন? অথচ তেজসিংহের কাহিনী এমন যন্ত্রণায় স্থাপিত নয়। বরং তেজসিংহের চরিত্রে দুর্জয় ঘৃণাই প্রকট, যেজন্য চরিত্রটি এক রঙা, সেজন্য সূর্যমহল পতনের, স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধে তেজসিংহ দুর্জয় সিংহের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আন্তরিকতা উত্থিত নয়, তেজসিংহের মনোভাব পরিবর্তনে এক্ষেত্রে চারণী দেবীর উপদেশাবলী প্রায় একমাত্র নিয়ামক শক্তি। বিনা অপরাধে রঘুনাথের শাস্তিলাভের জন্য শিবজীর মত পাঠকও অনুতপ্ত, সে-রকম অনুতাপের বিষয় "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"-য় একটিও নেই। আসলে "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"-য় প্রতাপের কাহিনী সুগ্রথিত বা সুলিখিত নয়। রাণা প্রতাপের বীরত্ব ও দেশের জন্য তার ত্যাগ বর্ণনার জন্য ঔপন্যাসিকের সম্বল কয়েকটি যুদ্ধ চিত্র, এবং দারিদ্র্য বর্ণনা। শিবজীর মতই প্রতাপের প্রতি রমেশচন্দ্রর সহানুভূতি প্রবল। শিবজীর চরিত্রে উচ্ছ্বাস বর্তমান, কিন্তু রাণা প্রতাপ সম্পর্কে

লেখকের উক্তিগুলি মাত্রারিক্ত উচ্ছ্বাসে সিক্ত, "প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয়, মহাভারতের বীরদিগের কথা মনে পড়ে। * * * প্রতাপসিংহের বীরত্ব কথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর, কিন্তু উপন্যাস নহে।" রমেশচন্দ্র উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার জোয়ার তো'লেন ব'লে হৃদয় অনুভবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাগুলি উপেক্ষিত এবং প্রেমের চিত্রগুলি প্রায় দ্বন্দ্বহীন। তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর কাহিনীর মতই রঘুনাথ-সরযুর প্রেমোপাখ্যান বর্ণহীন, তবু সরযুর প্রতীক্ষার দৃশ্যগুলি কিঞ্চিৎ উপভোগ্য সময় সময়। উভয় উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণে আতিশয্য দোষ বর্তমান, কিন্তু কাহিনীর সুগ্রন্থনে এবং মোটামুটি ভাবে উচ্ছ্বাসের মাত্রা কিঞ্চিৎ কম ব'লে "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" এর প্লট "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"-র প্লট অপেক্ষা উন্নত পর্যায়ের।

বঙ্কিম প্রভাব মুক্ত ঔপন্যাসিক প্রতাপচন্দ্র ঘোষের "বঙ্গাধিপ পরাজয়" অনেকের মতে বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ উপন্যাস, এবং ক্যালকাটা রিভিউ-এর সমালোচকের মত "বঙ্গাধিপ পরাজয়" বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম উপন্যাস। মন্তব্যটি অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই। সাধারণ পাঠক কিংবা পরবর্তী বহু সমালোচক উপন্যাসটির গুরুত্ব সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না, তার প্রমাণ সাধারণ পাঠকের কাছে পুস্তকটির নাম অজ্ঞাত এবং সমালোচকও উপন্যাসটি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ। তবু উপন্যাসের ভূমিকায় লেখকের মন্তব্যে তাঁর ঔপন্যাসিক সচেতনতা বিধৃত, এ-সচেতনতা গতানুগতিক নয়, বরং মন্তব্যগুলি স্বাতন্ত্র্য দ্যোতক: "নির্দিষ্ট নিয়মের পরতন্ত্র না হইয়া কেবলমাত্র স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থটি রচিত হইল। অলঙ্কারের অনুরোধে স্বভাবকে পরিত্যাগ

করা হয় নাই। গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মনোবৃত্তি স্পষ্ট বর্ণনা না করিয়া তাহাদিগের বাক্যেও আচার ব্যবহারে প্রকাশ করা হইয়াছে। * * গ্রন্থের আরম্ভ অবধি শেষ পর্যন্ত যেমত যেমত ঘটনা উদিত হইয়াছে, গ্রন্থোলিখিত ব্যক্তিগণের স্বভাবও যাহার যেরূপ অবস্থান্তরে রূপান্তর সম্ভব, তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। * * * সামান্য ঘটনা কালে প্রতুল হয়, গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়িলে পাঠকবর্গে স্বীকার করিবেন। * * * বহু নায়ক নায়িকা থাকায় একের একবার উল্লেখের অনেকপরে আবার তাহার পুনরুল্লেখ হইয়াছে। সামান্য নিয়ম পরতন্ত্র হইলে প্রতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে তাহাকে রঙ্গভূমিতে আনা কর্তব্য হয়; কিন্তু এগ্রন্থে তাহার অনুরোধ করা হয় নাই। স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহে যে যেমত নয়ন গোচর হইয়াছে, তাহার তখনই উল্লেখ আছে।

"গ্রন্থের ভাষায় একটি-ও অশ্লীল কথার প্রয়োগ নাই। পবিত্র সংস্কৃতজাত শব্দই অধিক ব্যবহার হইয়াছে, কেবল যেখানে সামান্য বাঙ্গালা কথা ব্যতীত প্রাকৃত ভাব প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, সেইখানেই অপভ্রংশ শব্দই নিযুক্ত হইয়াছে। অতি উচ্চ পবিত্র সংস্কৃত কথায় বর্ণনা হইতে হইতে কোথায় একটি সামান্য ইতর ভাষার কথা ব্যবহার হইয়াছে। পাঠক মহাশয় হঠাৎ সেটীকে দোষ বলিবেন না, সেস্থলে সে ইতর কথাটি না দিলে ভাব সেমত প্রকাশ পায় না।" (ভূমিকা, পৃ: ।০-৵০) ভূমিকায় প্রতাপচন্দ্রের কৌশল উদ্ঘাটিত হয়েছে, কিন্তু ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা উপন্যাসটির সার্থকতার পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছে, কারণ উচ্চ ভাব-সম্পন্ন সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ বাংলাভাষার পক্ষে ক্ষতি-কর, যেহেতু বাংলাভাষার গদ্যশৈলী ভিন্নধর্মী, এর ফলেই সংস্কৃত ঘেঁসা শব্দের পাশাপাশি ইতর ভাষার (লেখকের মতে) প্রয়োগে

অতিদক্ষতা প্রয়োজন, যে দক্ষতার পরিচয় "বঙ্গাধিপ পরাজয়"-এ অনুপস্থিত, সেজন্য উপন্যাসটি বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হয়েছে। বহু চরিত্র ও ঘটনাস্থলের প্রাচুর্য উপন্যাসের প্লট জটিল করে তোলে, সময় সময় ইতিহাস ও তথ্যের বাহুল্য বিরক্তিকর, এবং অনেক ক্ষেত্রে লেখক ইতিহাসকে অনুসর· করতে গিয়ে ইতিহাসের দাসে পরিণত হয়েছেন। তথাপি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা যে পরিশ্রম সাপেক্ষ, সেকথা "বঙ্গাধিপ পরাজয়"-এর ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। কিন্তু ভূমিকা অনুযায়ী উপন্যাস বিচার করতে যাওয়া পণ্ডশ্রমের সামিল। সাধারণ অন্যান্য প্লট-প্রধান উপন্যাসের মতই উপন্যাসটিতে প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুসৃত, মাত্র কয়েকটি অতীত কাহিনী লোকমুখে বিবৃত ব'লে পদ্ধতিগত কিছু নতুনত্ব লক্ষণীয়।

"বঙ্গাধিপ পরাজয়" উপন্যাসের কেন্দ্র চরিত্র প্রতাপাদিত্যের কাহিনীই রবীন্দ্রনাথের "বউঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাসের মূল উপজীব্য, যদিচ উভয় গ্রন্থকারের লক্ষ ও লিখন পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের নির্বাচিত কাহিনী যুদ্ধ বিগ্রহের পটভূমিকায় স্থাপিত প্রতাপাদিত্যের অস্থির চঞ্চল ও নির্মম জীবন ; অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষের কাহিনী, যেজন্য বসন্তরায়ের আলেখ্য "বঙ্গাধিপ পরাজয়"-এ উহ্য, অথচ সেই বসন্তরায়ই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য রূপায়ণের মাধ্যম, যদিও পূর্বোক্ত উপন্যাসে (বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর কাহিনী শুরু হলেও) বসন্তরায়ের মহত্ত্ব পরোক্ষভাবে বর্ণিত। রবীন্দ্রনাথ ঘটনার ঘনঘটা পরিত্যাগ করলেও তিনি এ-উপন্যাসে রীতিমত গল্পরচনায় মনোযোগী, অবশ্য এ গল্পরচনা বক্তব্যহীন শুধু গল্পই নয়।

"বউঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাসে উদয়াদিত্য-সুরমা, বসন্তরায়—বিভার শান্ত সরল কাহিনী ও রামচন্দ্র—রমাই ভাঁড়ের লঘুচিত্ত

নির্বুদ্ধিতার আখ্যায়িকার সংযোগী পুরুষ আত্মম্ভরী নিষ্ঠুর প্রতাপ। এই নিষ্ঠুরতার কবল থেকে পুত্র, পিতৃব্য, জামাতার নিষ্কৃতি নেই, এবং উপন্যাসটিতে প্রতাপাদিত্যের আচরণ উত্থিত ট্র্যাজিডি বর্ণিত হয়েছে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ নানা ঘটনার সংঘাতে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, লুণ্ঠন প্রভৃতি মাধ্যমে প্রেম-ঈর্ষাব আলেখ্য রচনায় মনোযোগী, "বউঠাকুরাণীর হাট"-এ ঘটনা থাকলে সে-ঘটনা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ বক্তব্য রূপায়ণে নিযুক্ত, কিন্তু তখনও রবীন্দ্রনাথ আপন ঔপন্যাসিক প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নন ব'লে প্লট অনুযায়ী চরিত্র সৃজনে ব্যর্থ হয়েছেন। কাহিনীর জটিলতার শীর্ষে চরিত্রগুলির সহজ সারল্য উপন্যাসটির সাফল্যের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। জটিল প্লটের জন্য আবশ্যক জটিল চরিত্রের, কিন্তু এ-উপন্যাসে "চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি।" মন্তব্যটি স্বয়ং ঔপন্যাসিকের।

"বউঠাকুরাণীর হাট"-এ বঙ্কিম প্রভাব অনুভূত হলেও এ-উপন্যাসে ঘটনার সংখ্যা হ্রাস, ঘটনার ঘাত-সংঘাতের পরিবর্তে আদর্শের সংঘাতে পাঠকদের আলোড়িত আকর্ষিত করার প্রচেষ্টা উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য। অবশ্য উপন্যাসটি সফল বা সার্থক নয়, তবু এ-বৈশিষ্ট্যগুলি ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের মাইলস্টোন হিসাবে বিবেচ্য।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী" আয়তনের বিচারে বাংলা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ উপন্যাস। অধুনা অবশ্য উপন্যাসে রামায়ণ মহাভারতের সাক্ষাৎ সুলভ ঘটনা, তথাপি "শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী"-র আয়তন হেলার বস্তু নয়, অথচ উপন্যাসটি যে কোনও ঔপন্যাসিক মানদণ্ডে অসার্থকরূপে বিবেচিত, কারণ বহুপৃষ্ঠা ব্যয়িত

হলেও "শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী" গ্রন্থে লেখকের জীবন দৃষ্টি বা বক্তব্য সন্ধান করা প্রায় দুঃসাধ্য। ঘটনার পর ঘটনা, কাহিনীর পর কাহিনী সজ্জিত, অথচ কেন কাহিনী এবং ঘটনার ঘনঘটা, সে-প্রশ্নের উত্তরে 'গল্প বলাই উপন্যাসের উদ্দেশ্য' ব্যতীত অন্য কোনও উত্তর দেয়া সমালোচকের অসাধ্য। বস্তুত, শুধু-মাত্র কাহিনী বিবৃত করাই এই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। উপন্যাসটিতে বহু কাহিনী বর্তমান, তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ-রঘুদয়ালের, ভবানীপ্রসাদ-দীনদয়ালের, শিয়ালমারা-কালীবাসি-সনাতনের এবং লক্ষ্মী-রাজপুত্রের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের প্রথম তিনভাগে সমস্ত চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ভাগের শেষে প্রথম কাহিনীর সঙ্গে তৃতীয় কাহিনী উল্লিখিত, যদিও উভয় কাহিনী এখণ্ডে সংযুক্ত। চতুর্থভাগ থেকে কাহিনীগুলি সংযুক্ত হওয়ার পালা আরম্ভ এবং কাশী নগরকে কেন্দ্র করে কাহিনীগুলি ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পঞ্চমভাগে বিভিন্ন কাহিনীর গ্রন্থিবন্ধনে ও ষষ্ঠ ভাগে মূল কাহিনী, উপকাহিনী, বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও উপাখ্যানগুলির দৃঢ় সংযোগে অবশেষে উপন্যাসের প্লট মণ্ডলায়িত হয়। এমন জটিল প্লটের উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত। কিন্তু জটিলতার মধ্যে লেখক পাঠকের কৌতূহল সজাগ রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং সে-বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তৎসত্ত্বেও "শ্রীশ্রীরাজ লক্ষ্মী" উপন্যাসে প্রচুর অবান্তর বিস্তৃত কাহিনী ও ঘটনার নিদর্শন বর্তমান, যেমন—মোহর ভাঙানোর সময় রামপ্রসাদের দুর্ভোগ চিত্র (প্রথমভাগ), সর্পদংশনে জমিদার-পুত্রের চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ (প্রথমভাগ), রঘুদয়ালের দণ্ডাঘাতে হস্তী নিপাতের ঘটনা (দ্বিতীয়ভাগ), রঘুদয়ালের সন্ধানে পুলিশ কর্মচারীর তৎপরতা (চতুর্থভাগ), রঘুদয়ালের অর্থপ্রাপ্তির ঘটনা (পঞ্চমভাগ), নকল ও আসল রঘুদয়াল উপাখ্যান (ষষ্ঠভাগ)।

বিরাট উপন্যাসে অবান্তর কাহিনী বা ঘটনা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেগুলি উপেক্ষা করার স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, শেষে পাঠক হয়ত এর থেকে কিছু লাভ করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে সে আশা অমূলক। ঔপন্যাসিক চরিত্র-চিত্রণে কিঞ্চিৎ সচেতন হলে অন্তত কয়েকটি উজ্জ্বল চরিত্রের সন্ধান মেলা কঠিন হতো না। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকার ফলে উপন্যাসটি গল্পের জঞ্জালে পরিণত হয়েছে।

সরল প্লট ঃ

"সরল উপন্যাসে শুধু একটি মাত্র আখ্যায়িকা থাকিবে এবং তাহার অতিরিক্ত কোন থাকিলে তাহা যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করা হইবে এবং তাহা যে সর্বতোভাবে মূল কাহিনীর অন্তর্গত তাহা সূচিত হইবে।" (সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৫৮)। সরল প্লটে ঘটনাগুলি এমন ভাবে সাজানো হয় যাতে প্রথম ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনার, দ্বিতীয় ঘটনা তৃতীয়টির কারণ রূপে গণ্য করা যায়। প্লট-প্রধান উপন্যাসে, বিশেষতঃ বক্তব্য রহিত গল্প সর্বস্ব উপন্যাসে, সরল লক্ষণযুক্ত প্লট আবিষ্কার করা প্রায় দুঃসাধ্য ; কারণ ঔপন্যাসিকের বাসনা যেখানে একমাত্র পাঠকের গল্প শোনার স্পৃহা নিবারণ করা, সে-ক্ষেত্রে মাত্র একটি কাহিনী নির্বাচন লেখকের ইচ্ছা এবং পাঠকের ইচ্ছা পূরণের অন্তরায়, যেহেতু গল্পের "তারপর" -এর আকর্ষণ নেহাৎ তুচ্ছ নয়, এবং পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করার একমাত্র উপায় কাহিনীর পর কাহিনী, ঘটনার পর ঘটনার তন্তু বয়ন। অন্যপক্ষে ব্যক্তিস্বরূপ প্রকাশে যেখানে ঔপন্যাসিক আগ্রহী, সেখানে এই সরল প্লট তাঁর বক্তব্য রূপায়ণের প্রতি-

বন্ধক নয়, কারণ মনস্তত্ত্বের জট ছাড়ানোর চেষ্টায় সেইসব উপন্যাসে কৌতূহল নামক আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে না, ফলে গল্পের ক্ষতিপূরণে মনোবিকলনের ভূমিকা সেইসব ক্ষেত্রে সর্বৈব না হলেও প্রধান হয়, তাই বহু মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের প্লট সরল লক্ষণযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল", "ইন্দিরা" উপন্যাসের প্লট সরল। "কৃষ্ণকান্তের উইল" দুইখণ্ডে বিভক্ত। গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ভ্রমরের দ্বন্দ্বমথিত জীবনের ফলশ্রুতি দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যান। সেজন্য প্রথম খণ্ডের কাহিনীর পরার্ধরূপে দ্বিতীয় খণ্ড বিবেচ্য। "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এ পাত্র-পাত্রীর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনার প্রচেষ্টার জন্য উপন্যাসটিকে এত জটিল মনে হয়। "ইন্দিরা" উপন্যাসের প্লট অতিরিক্ত সরল। ইন্দিরার শ্বশুরালয় গমন, পথে দস্যু কর্তৃক ভাগ্যবিপর্যয়, বিপর্যস্তভাগ্যকে সঙ্গী করে কলকাতা আগমন ও পরিশেষে নানা বাধা বিঘ্নের পর স্বামী সান্নিধ্য লাভ "ইন্দিরা" উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, ঘটনার বাহুল্য নেই, এবং ঘটনাগুলি একটানা সরল রেখায় বর্ণিত।

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস "বিষ বিবাহ"-এর নায়িকা রাজকন্যা রাধা বিরহে কাতর। বহু রাজপুত্র তার পাণিপ্রার্থী, কিন্তু তার হৃদয় সমর্পিত শ্রেষ্ঠী কিষণলালের প্রেমে। গাগোর দুর্গ আক্রমণে নবাবের উৎসাহ ও উক্ত দুর্গ অধিকারের পর রাধা-রূপমোহে নবাবের ভয়াবহ পরিণতি ও রাধার আত্মবিসর্জনে গল্পের সমাপ্তি। ছোট উপন্যাস, উপন্যাসের নায়িকা রাধা, এবং রাধাকে কেন্দ্রকরে উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত। অন্য কোনও উপকাহিনী অথবা আধা ঘটনা বিন্যাস আখ্যান-অংশে অলভ্য। তাই বর্ণিত কাহিনীও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এ-সংক্ষেপণ

সময় সময় অতিশয় ব'লে “বিষবিবাহ” উপন্যাস নামের অযোগ্য। সময় সম্পর্কে অতি স্বাধীনতা গ্রহণ এবং পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ঘটনাকালকে ইচ্ছা মত দু-তিন বৎসর এগিয়ে দেয়া সিদ্ধির পথে অন্তরায় হয়েছে। কিষণলাল ও রাধার প্রণয়-উপাখ্যানটি বিবৃতিমূলক ও সংক্ষিপ্ত, অথচ এ-উপাখ্যান কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হলে “বিষবিবাহ” উপন্যাস পদবাচ্য হতো সন্দেহ নেই। এমনকি কিষণলালের নিকট মুসলমানগণের দুর্গ আক্রমণের সংবাদ জানা ও সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান আক্রমণের দৃশ্য যোজনা যথেষ্ট সতর্কতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় নয়। ঔপন্যাসিক কিঞ্চিৎ স্থির হলে এবং ধীরগতিতে কাহিনীর স্রোত প্রবাহিত করলে “বিষবিবাহ” উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করতো।

সেই একই দোষে দুষ্ট ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী রচিত “মধুযামিনী”। হিঙ্গলা ও অরুণা দুই বান্ধবীর কাহিনীতে হিঙ্গলার স্বার্থহীনতা ও অরুণার স্বার্থপরতা এক রঙে চিত্রিত, যেজন্য কুমার কেন্দ্রিক ঘটনা-বলীর জটিলতায় দুই বান্ধবীর কাহিনী অসম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যহীন হয়েছে। অপরিচিতের আগমনে পুলকোদ্গম সহসা প্রস্ফুটিত বলেই উপন্যাসটি মাধুর্য বঞ্চিত। তবু কুমারের দাস্যবৃত্তি গ্রহণ ও ভগিনীর অসুস্থতার সংবাদে অন্যত্র গমনের ঘটনায় লেখক অরুণা হিঙ্গলার কাহিনীতে আবর্ত রচনা করেন, কিন্তু সংঘাতটি অতি নাটকীয়তায় বিফল, কারণ অরুণার আচার্যদেবের কাছে যাওয়া সমর্থনযোগ্য হলেও হিঙ্গলাকে ডাইনিরূপে প্রমাণ করার চেষ্টা অবাস্তব ও রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। তেমনি অবাস্তব ঘটনা পরীক্ষা-ক্ষেত্রে কুমারের অশ্বারোহী সৈন্যসহ আগমন। এ-উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলির অতি সংক্ষেপকরণ, সেজন্য ‘‘মধুযামিনী” কোন কোন ক্ষেত্রে উপন্যাস লক্ষণযুক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে ছোটগল্পের মত।

শরৎচন্দ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসগুলির মধ্যে "চন্দ্রনাথ", "পরিণীতা", "বৈকুণ্ঠের উইল", "নিষ্কৃতি", "অরক্ষণীয়া", "বড়দিদি" এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন গ্রন্থের মধ্যে "দত্তা"-র প্লট সরল। রবীন্দ্রনাথের শেষ চারটি উপন্যাসের প্লট সরল লক্ষণযুক্ত। উল্লিখিত উপন্যাসগুলি "চোখের বালি" উপন্যাসের পর রচিত এবং উপন্যাসগুলিতে গল্প-ই একমাত্র আকর্ষণ নয়, সেজন্য এ-সব উপন্যাসের আলোচনা যথাস্থানে করাই সংগত।

যৌগিক প্লট ঃ

জটিল ও সরল প্লটের বৈশিষ্ট্য যে-সব উপন্যাসে যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, সেইসব উপন্যাসের প্লটকে যৌগিক বলাই শ্রেয়। যৌগিক প্লট মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত, অবশ্য জটিল প্লটের বৈশিষ্ট্য যৌগিক ক্ষেত্রে অধিক বর্তমান। তাই জটিল ও যৌগিক প্লটের বিভাগ সর্বদা ঋজু ও দৃঢ় নয়। তবু বর্তমানে আলোচ্য যৌগিক প্লটের উপন্যাসগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ঃ উপন্যাসগুলিতে দু-টি কাহিনী বর্তমান, কিন্তু প্রায়শই প্রথম কাহিনীর পরিণতির মুখে বা সমাপ্তির পর দ্বিতীয় কাহিনীর অবতারণা যেন নিয়মের মত, জটিল প্লটে দু-টি কাহিনী এমন পদ্ধতিতে উপস্থাপিত নয়, পূর্ববর্তী আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়েছে নিঃসন্দেহে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "স্বর্ণলতা" তৎকালের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন বহু সমালোচক, সেজন্য গ্রন্থটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। "স্বর্ণলতা"-র উপক্রমণিকা অংশে লেখক অতি সংক্ষেপে শশিভূষণ ও বিধুভূষণের পরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সরাসরি কাহিনী বর্ণনায় নিযুক্ত।

মুখ্যতঃ একটি পরিবারকে কেন্দ্র ক'রেই আখ্যানটি রচিত। মনোহারি দোকানে সওদা নিয়ে প্রমদা ও সরলার মধ্যে কলহের সূত্রপাত। কলহের পরিণামে উভয় ভ্রাতা পৃথক অন্ন ও পৃথক বাস গ্রহণ করে। প্রমদার মাতা ও ভ্রাতা গদাধরচন্দ্রের এসময়ে মঞ্চে আবির্ভাব সরল কাহিনীকে জটিল করার পক্ষে যথেষ্ট, কারণ প্রমদার মাতা ও ভ্রাতার আসার জন্যই সরলার ট্র্যাজিডি অবশেষে ভয়াবহ ও করুণাচ্ছন্ন এবং উপন্যাসে এ-কাহিনী সুমণ্ডলায়িত হয় সরলার মৃত্যুতে। অথচ "স্বর্ণলতা" গ্রন্থটি যে পাত্রীর নাম অনুসারে, সেই পাত্রীর সঙ্গে পাঠকের সামান্য পরিচয় হয় দশম পরিচ্ছেদের অতি স্বল্প অবসরে। সরলার মৃত্যুর পর গোপালের (বিধু-সরলার পুত্র) সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও সেই সাক্ষাতের সূত্রে স্বর্ণলতার সঙ্গে গোপালের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা দ্বিতীয় কাহিনীর উপজীব্য। গোপাল ও স্বর্ণলতার পরিণয়ে গ্রন্থের সমাপ্তি, তবু এই মিলন অধ্যায় কণ্টকাকীর্ণ শশাঙ্কর অতি তৎপর সক্রিয়তার জন্য। অর্থাৎ উপন্যাসে দু-টি কাহিনী বর্তমান—প্রথম কাহিনী শশিভূষণ—বিধুভূষণের পরিবার কেন্দ্রিক, দ্বিতীয়টি স্বর্ণলতা-গোপালের প্রেমোপাখ্যান। এই দু'টি কাহিনীর মধ্যে প্রথম কাহিনী মূল কাহিনী। আয়তনে শশিবিধুর কাহিনী দ্বিতীয় কাহিনী অপেক্ষা দীর্ঘতর, এই দীর্ঘতায় লেখক স্বভাবতই বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন কাহিনীর সম্ভাব্যতা ও চরিত্রদের প্রতি। আর কাহিনী অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে ব'লে তারকনাথ গল্পের খাতিরেও পরিবার-চিত্রটি উজ্জ্বল করার বিষয়ে ভাবিত হয়েছেন, তাই প্রারম্ভের একটি সামান্য ঘটনা ঔপন্যাসিকের কাছে প্রতুল, এবং তুচ্ছ ঘটনার প্রলয়করী শক্তি সম্পর্কে আমরা সকলেই তখন ওয়াকিবহাল হই। সেজন্য মনোহারি দোকানকে ছুতো করে যে-

কলহের সূত্রপাত, সেই কলহই একান্নবর্তী পরিবারকে তছনছ করার ক্ষেত্রে নিয়ামক ঘটনা, এবং তারকনাথ অসহায় দারিদ্র্য পীড়িত সরলার বিষাদান্তক জীবনে সেই তুচ্ছ ঘটনার অভিঘাত কি ভয়ঙ্কর কার্যকরী—সেই চিত্র অঙ্কনে মনোযোগী ছিলেন। তাই সরলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবার আলেখ্যটি গল্পের নিয়মে বিবর্ণ হতে বাধ্য। লেখক, অনেকের মতে, পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় বক্তব্যটি রূপায়ণে সচেষ্ট, ফলে পরিবার-কাহিনী সরলার মৃত্যুর পর বিস্তৃত, এবং সেজন্যই স্বর্ণলতা-গোপাল কাহিনীর অবতারণা। প্রথম কাহিনীর প্রমদা ও শশিভূষণের শাস্তি পাওয়া উচিত, কারণ তারা অসৎ। কিন্তু সরলার দুর্ভোগ যন্ত্রণা কিসের জন্য ? সরলা কি অসৎ ? অন্তত তার অসততার কোনও প্রমাণ উপন্যাসে নেই, অতএব পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয়ের জন্য সরলার মৃত্যুর পর কাহিনীর অতি বিস্তারণ শুধু গল্পবলার জন্যই রচিত হয়েছে। তবু প্রথম কাহিনীতে যেটুকু ঔপন্যাসিক দক্ষতা বিদ্যমান, দ্বিতীয় কাহিনীতে তার কোনও চিহ্ন তো নেই, বরং দ্বিতীয় কাহিনী রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের একটি লোমহর্ষক গল্পে পরিণত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় কাহিনীর সংযোগী পুরুষ প্রথম কাহিনীর একটি নগণ্য চরিত্র গোপাল। কিন্তু যোগসূত্রটি নিতান্ত ক্ষীণ। হেমচন্দ্র ও গোপালের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ আকস্মিকতায় পূর্ণ, এজন্যই গোপালের প্রতি হেমচন্দ্রের অতি উৎসাহের কারণ রহস্যাবৃত, অথচ হেমচন্দ্রের সহানুভূতিই দ্বিতীয় কাহিনীর ভিত্তিভূমি। এ-ছাড়া শশাঙ্কর ভূমিকা লেখকের বক্তব্য প্রচারের প্রয়োজনে রচিত। শশাঙ্কর আবির্ভাব লেখকের অমনোযোগেরই একটি দৃষ্টান্ত। আসলে, দ্বিতীয় কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখক সচেতন নন ব'লেই স্বর্ণলতা অপহরণ, গোপালের দুর্ভোগ ভোগ, শশাঙ্কর ভয়াবহ পরিণতির

বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক হলেও ঘটনাগুলি অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক নিঃসন্দেহে। এইসব অতি-নাটকীয় ঘটনার সংস্থানে উপন্যাসের মূল-কেন্দ্র তাই স্থানচ্যুত, এবং "স্বর্ণলতা" উপন্যাস রোমাঞ্চকর রহস্য উপন্যাসের সহোদর ব'লে মনে হয়, অথচ প্রথম কাহিনী নিঃসন্দেহে সম্ভাবনাময় উপন্যাসের সুনির্বাচিত কাহিনী।

তবে কি সরলা-বিধুভূষণের জীবনের ট্র্যাজিডির বারিসেকরূপে গোপাল-স্বর্ণলতার মিলনোপাখ্যান রচিত? কিন্তু তেমন বৈপরীত্য দেখানোর অভিপ্রায় লেখকের থাকলে প্রথম কাহিনীর বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় কাহিনী অবতারণা করতেন না। গৌণ কাহিনীর প্রভাব মূল কাহিনীতে অবর্তমান, এমনকি প্রথম কাহিনীরও কোন প্রভাব গৌণ কাহিনীতে নেই। দুটি কাহিনী দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত সংযোগহীন।

প্রথম কাহিনীর সঙ্গে দ্বিতীয় কাহিনীর এই সামঞ্জস্যের অভাবের আরও একটি উদাহরণ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "ফুলজানি" উপন্যাস। "ফুলজানি"-র নায়ক পুরন্দর। ফুলজানির সঙ্গে পুরন্দরের বিবাহের তোড়জোড়ের মধ্যে কাহিনীর সূত্রপাত। কিন্তু কাহিনী জটিল হয়ে ওঠে পুরন্দরের বিবাহের পর মহেশ ঘোষ (পুরন্দরের পিতা) যখন নিস্তারিণীর (ফুলের মাতা) কাছে আসেন ও জমিজমা বন্দোবস্ত সংক্রান্ত উপদেশ ও প্রস্তাব দেন। উক্ত প্রস্তাবে নিস্তারিণীর অসম্মতির ফলে মহেশ্বরের উষ্মা ও সেই উষ্মার জন্য পুরন্দরের অন্যত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত, শিক্ষা সমাপনান্তে পুরন্দরের গৃহ প্রত্যাগমন ও কালীর সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন ও পুরন্দরের উন্মাদ হওয়ার সংবাদ প্রচার প্রভৃতি ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়। অতঃপর দুমাস বিরতির পর যে কাহিনী বিবৃত, সেই কাহিনীতে মহেশ্বরের নৌকা লুণ্ঠন ও মৃত্যু, জগদ্ধাত্রীর (পুরন্দরের মাতা)

চিতারোহণ, পুরন্দরের অসুখ ও ফুলজানির সেবাযত্ন এবং পুরন্দরের সুস্থতার পর উভয়ের মিলন প্রভৃতি বর্ণিত। মোটামুটিভাবে বহু ত্রুটি সত্ত্বেও এ-পর্যন্ত কাহিনী-বৃত্ত চলনসই সম্পূর্ণ বলা চলে, কিন্তু লেখক সপ্তম, অষ্টম ও পরিশিষ্ট অংশে মতিবিবির ষড়যন্ত্র, ময়ূরপঙ্ক্ষী দর্শনার্থে ফুলকুমারীর যাওয়া ও অপহরণ, ফুলের মুর্শিদাবাদ আসা, হাসেমের তত্ত্বাবধানে জীবন রক্ষা, হাসেমের সঙ্গে মতিবিবির কথোপকথন এবং পুরন্দর ও ফুলজানির (সংলাপরত অবস্থায়) গুরগণ খাঁর হাতে বন্দী হওয়া, ফুলজানিকে বিষদান, নবাবী বিচারে পুরন্দরের প্রাণদণ্ড ও ফুলকুমারীর বিষপান প্রভৃতি ঘটনা সংযুক্ত করায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি যথার্থ বলে মনে হয়, "এ সমস্ত কেন ? আগাগোড়া গল্পের সহিত ইহার কী যোগ ? প্রথম হইতে এমন কি সকল অনিবার্যকারণ একত্র হইয়াছিল যাহাতে গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্যম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল ? গ্রন্থকার যদি বলিতেন গ্রামে হঠাৎ একটা মড়ক হইল এবং সকলে মরিয়া গেল তবে কাব্য হিসাবে উহার সহিত ইহার প্রভেদ কি ? ১৬৬ পৃষ্ঠায় বইখানি সমাপ্ত। ১২২ পাতায় নিস্তারিণী তীর্থে গেলেন, তারপর ৪৪টি পত্রে গ্রন্থকার হঠাৎ একটি সম্পূর্ণ নূতন কাণ্ড ঘটাইয়া পাঠকগণকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। পূর্বে ইহার কোন স্থত্রপাত ছিল না, ফুলকুমারীর চরিত্রের সঙ্গে ইহার কোন যোগ ছিল না। ততক্ষণ গ্রন্থকার ১২২ পৃষ্ঠায় যে একটি সুন্দর সরল সমগ্র কাব্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসবশত শেষের ৪৪ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে একটি আকস্মিক বজ্র নির্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।" (আধুনিক সাহিত্য, পৃ: ১০৭-১০৮)।

"ফুলজানি" উপন্যাসে দু-টি কাহিনী, অতএব উপন্যাসটির প্লট সরল নয়। অন্যদিকে জটিল প্লটে দু-টি কাহিনী সর্বদা পরস্পরের

প্রভাবাধীন না হলেও অন্তত একটি কাহিনীর প্রভাব অন্যকাহিনীতে পরিলক্ষিত হয়। "ফুলজানি"তে সে-প্রচেষ্টা দুর্নিরীক্ষ্য। ষষ্ঠখণ্ডে প্রথম কাহিনী সমাপ্ত, এবং পরবর্তী চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় যে-কাহিনী বর্ণিত, সে-কাহিনী মূলকাহিনীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, ফলে উপন্যাসটির প্লট জটিল নয়, তাই "ফুলজানি"-র প্লট যৌগিক নামেরই উপযুক্ত।

"আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্রপূজার বিরোধ" (রাজর্ষি, সূচনাপর্ব, পৃ: ৪) এবং এই বক্তব্য রূপায়ণের পক্ষে প্রথম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ যথেষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথের মতেও "উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।" (ঐ, পৃ: ৪)। কিন্তু লেখকের বক্তব্য রূপায়ণের অতি উৎসাহে মূল আখ্যায়িকা অতি সম্প্রসারিত, যেজন্য মোগল সৈন্যের আক্রমণ, শাহসুজার রাজধানী বর্ণনা, নক্ষত্ররায়ের সিংহাসন লাভ, গোবিন্দ মাণিক্যের স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ, বিল্বনঠাকুরের উপদেশ বিতরণ উপন্যাসের পক্ষে অবাঞ্ছিত, কারণ এ-সব বর্ণনা উপন্যাসের শ্রীবৃদ্ধি না ঘটিয়ে ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়েছে। অবশ্য চরিত্র সৃষ্টির ব্যর্থতাও এক্ষেত্রে স্মরণীয়, কারণ রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের আদর্শগত সংগ্রামের পশ্চাতে যেসব পাত্রী-পাত্রী অংশ গ্রহণকারী, তাদের দ্বন্দ্ব ও দোলাচলতা চিত্রণের একান্ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই পদ্ধতি ব্যবহারে যথেষ্ট মনস্ক ছিলেন না ব'লে উপন্যাসটি ব্যর্থ ও অসফল হয়েছে।*

---

*বঙ্কিম-উপন্যাস প্রসঙ্গে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত-র বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত-র উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম, অরবিন্দ পোদ্দার-এর বঙ্কিম-মানস, এবং সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাংলা উপন্যাসের কালান্তর প্রভৃতি গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের নব পর্যায়

ক. মনস্তত্ত্ব ও মনোবিকলন :

বাংলা উপন্যাসের প্রত্ন পর্যায়ে ঘটনার আধিপত্য প্রবল, যেজন্য ঘটনার নিবিড় চাপে অধিকাংশ সময় চরিত্রগুলি ঘটনার শিকার অথবা ঔপন্যাসিকের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। রক্ত মাংস যুক্ত মানুষের ঘটনা সৃষ্টিকারী ক্ষমতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকার ফলে এইসব ঔপন্যাসিক মানুষ ও পরিবেশের গতিশীল ও বিকাশমান সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্র উপস্থাপনায় ব্যর্থ হয়েছেন, তাই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী অধিকাংশ সময় ঔপন্যাসিকের তত্ত্বপ্রমাণের প্রাণহীন নিমিত্ত মাত্র। অবশ্য বহু উপন্যাসে তত্ত্ব মেলাও ভার, এবং সেগুলির অবস্থা আরও করুণ। অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঘটনা প্রবাহ রচনাতে চরিত্র উপেক্ষিত হওয়ার সমান্তরালে আকস্মিক, অতর্কিত প্রভৃতি অচিন্তিত অসম্ভাব্য বিষয়ের আবির্ভাবের সম্ভাবনা অধিক, যেজন্য উপন্যাসের নিজস্ব নিয়ম এবং ঘটনা চরিত্রের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক লঙ্ঘনের আশঙ্কা অমূলক নয়। উপন্যাস একজন ব্যক্তির সৃষ্টি হলেও উপন্যাসস্থ পাত্র-পাত্রী বা ঘটনাবলীর নিজস্ব বেগ ও গতি বর্তমান। ঔপন্যাসিক নিশ্চয়ই নিজস্ব পরিকল্পনা ও সৃজিত আখ্যানের তর-তম প্রভেদ বা ব্যবধান মোচনের কর্তা, কিন্তু সেজন্য লেখকের কর্তামি সর্বৈব হলে উপন্যাসে জীবন সামগ্র্য সন্ধান সাধ্যাতীত ও পণ্ডশ্রম। সেইরূপ রচনা যে কোনও আদর্শ বা মত প্রচারের উৎকৃষ্ট পুস্তক হলেও উপন্যাস নয়, যেহেতু উপন্যাস মানুষের সাংগ্রামিক চিত্রের মাধ্যমে সমস্যা রূপায়ণের শিল্পরূপ।

অন্যপক্ষে পাঠক শুধু ঘটনার স্রোত অবলোকন করে তুষ্ট নয়, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল নানাবিধ প্রশ্নে আলোড়িত। পাত্র-পাত্রীর অবয়ব, অতীত ইতিহাস, প্রকৃতি জানার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের ভাবনা চিন্তা অনুভব, এবং ঘটনার অভিঘাতে মনের প্রতিক্রিয়া অথবা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে পাত্র-পাত্রীর বাসনা জানার আগ্রহ পাঠকের হওয়া স্বাভাবিক, এবং "This detailed presentation of his feeling and mental process is what in fiction is called psychology" (J. W. Beach : The Twentieth Century Novel, p. 25). আর চরিত্রের আনুভূতিক প্রক্রিয়া বা মানসিক প্রণালী উহ্য রাখলে উপন্যস্ত পাত্র-পাত্রীর সামগ্রিক জীবনের পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। পাত্র-পাত্রীর সজীবত্বর অনেকখানিই মনস্তত্ত্বে বিধৃত, কারণ অভিজ্ঞতা বস্তু নির্ভর হলেও অভিজ্ঞতার আত্মমুখীন বিষয়টিও অনুধাবন যোগ্য। ঘটনা উৎক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে বা বিশেষ মুহূর্তে পাত্র-পাত্রীর মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে, সেই প্রতিক্রিয়া উপস্থাপিত করা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব এবং এক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচিত পদ্ধতি মনোবিকলনমূলক। এ-পদ্ধতি চরিত্রের আচার আচরণ বিশ্লেষণ করে ব'লেই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে আকস্মিক অতর্কিত অসম্ভব ঘটনার সংখ্যা প্রায় শূন্য। বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে অমনোযোগী বা অচেতন ছিলেন—এমন সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের অন্তর নামক বস্তুটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, অবশ্য ওই উপন্যাসে ঘটনা আত্যন্তিক ব'লে লেখক সুযোগ পেয়েও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হন। এমনকি "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে শৈবলিনীর দ্বন্দ্বমথিত জীবনের বিবরণে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ অবকাশ উপেক্ষিত, অথচ

অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় মনোবিশ্লেষণের সুযোগ এ-উপন্যাসে অনেক বেশী ছিল, তবু ঘটনার ঘন ঘটার মধ্যে কয়েকজনের উৎকণ্ঠা প্রকাশের সময় মানসিক অবস্থার চিত্র স্বতঃ প্রকাশিত। "বিষবৃক্ষ"-এ যা বীজ অবস্থায় স্থিত, "চন্দ্রশেখর"-এ তা অঙ্কুরোদ্গমের পথে।

কিন্তু পর পর দু-টি উপন্যাসে ("রজনী" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল") মনোবিকলনের আধিক্য স্বতঃই লক্ষণীয়। "রজনী" উপন্যাসে অবলম্বিত রচনা-পদ্ধতি ভিন্ন, এখানে লেখক বিভিন্ন বক্তার মাধ্যমে ঘটনা পরিবেশনে প্রয়াসী, সেজন্য বিভিন্ন বক্তার মন স্পর্শযোগ্য অনায়াসে। তাই পরিষৎ-সংস্করণের সম্পাদকদ্বয়ের মতে "রজনী" বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে (রজনীর কথা) রজনীর বক্তব্যে যেমন ঘটনার গতি লক্ষণীয়, তেমনি কয়েকস্থানে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে রজনীর মানসিক অবস্থার বিবরণও লিপিবদ্ধ। শচীন্দ্রের প্রথম স্পর্শের সময়, জলমগ্ন হওয়ার পূর্বমুহূর্তে রজনীর অনুভূতি, নিবিড় সুখ ও দুঃখ বোধের আলেখ্যটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এছাড়া, ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে দু-এক ছত্রে রজনীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার চিত্র কয়েকস্থানে লভ্য। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের পর থেকে ঘটনা বিবৃতির প্রতিই বক্তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। অমরনাথ, শচীন্দ্র বা লবঙ্গলতার বক্তৃতাগুলিতে মানসিক বিবরণের অপেক্ষা ঘটনার বর্ণনা প্রদানের প্রচেষ্টা সমধিক লক্ষণীয়। কোন কোন স্থানে অমরনাথ বা শচীন্দ্রর প্রতিবর্তী চিন্তা দার্শনিকতার নামান্তর, এবং ওইসব প্রতিফলনের মধ্যে চরিত্রের বকলমে লেখকের বক্তব্যই প্রকাশিত। চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শচীন্দ্রর কথা আপাতদৃষ্টিতে মনস্তত্ত্বমূলক মনে হলেও, আসলে এগুলি

লবঙ্গর ভাষায় "সন্ন্যাসীর কীর্তি।" আরও কয়েকটি স্থানের প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসাগুলি নাটকের স্বগতোক্তির মতই এক প্রকারের উচ্চারিত সংলাপ। তবু স্বীকার্য, "রজনী" উপন্যাসে লেখক ঘটনা বাহুল্যর মধ্যে মনোবিকলনের সাহায্যে চরিত্রের স্বকীয় বিকাশে অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় বহুলাংশে সফল হয়েছেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে এ-প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। উপন্যাসে ঘটনা বাহুল্য কিঞ্চিৎ বর্জিত, এবং মাত্র দু-তিনজনের জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই কাহিনী বিন্যস্ত। উপন্যাসে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রণয়-উপাখ্যান ঘটনাবহুল নয়। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের মনোভাবের পরিবর্তন, দয়ামায়া ও সমবেদনা থেকে প্রেমে পরিণতি গ্রন্থের অন্তরালের ঘটনা নয়; এগুলি বঙ্কিমচন্দ্র পাঠক সম্মুখে অনেকখানি অনাবৃত করেন ব'লে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের মানসিক অবস্থার চিত্র আমাদের গোচরীভূত। বহির্ঘটনার প্রভাবে মানসিক আন্দোলনের স্বরূপ চিত্রণে লেখক সময় সময় সু ও কু-এর দ্বন্দ্ব উত্থাপিত ক'রে মানসিক সংঘট্টগুলি অতি নিপুণভাবে তুলে ধরেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের চেয়ে আপন বক্তব্য প্রকাশে আগ্রহী, সেজন্য উপন্যাসটির বহু স্থানে পাত্র-পাত্রীর মানসিক অবস্থার বিবরণে লেখকের দার্শনিকতাই প্রচ্ছন্ন থাকে।

১. "মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে! ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে যুবা, আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দন কানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এদিকে মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচী বেধে, অর্ধবিন্দু ঔষধ ভক্ষণে, এ নশ্বরজীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ-চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে—

কিন্তু আন্তরিক মৃত্যু কামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।"

২. "গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এইজন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তিসকল উদ্বেলিত-সাগর ও তরঙ্গ তুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয় কর্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব।"

৩. "রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসমিত কাহিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্য হইয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে।"

আরও অসংখ্য উদ্ধৃতি সহযোগে দেখানো সম্ভব যে, এ-গুলি পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব মানসিক অবস্থার সঠিক পরিচয় নয়, লেখকের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম মাত্র।

"চোখের বালি" যে অর্থে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর মনোবিকলন সে-স্তরের নয়। তবু "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এ

লেখক গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মানসিক অবস্থার বিবরণ দানে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন, উপন্যাস পাঠেই তা স্পষ্ট। দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের গোবিন্দলালের অমূল-প্রত্যক্ষের বর্ণনা -পদ্ধতি আধুনিকদেরও ঈর্ষণীয়। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ অবশ্য লেখকের ভাষাতেই কৃত, এবং মানসিক প্রক্রিয়ার বিবরণও মনোবিকলনের অন্তর্গত, তথাপি এ-সব ক্ষেত্রে চরিত্র সম্পর্কে লেখকের সাধারণ-বিবৃতি ও সেই সুবাদে আপন-বক্তব্য অক্ষরান্তরিত করার অর্থ চরিত্রের স্বকীয় বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হওয়া। প্রকৃত মনো-বিশ্লেষণ মানুষের আত্মার প্রতিফলন, যে-মানুষ ব্যক্তিত্বের সমস্যায় আলোড়িত, যার উৎস তার অন্তরে ও সমাজ জীবনে। বঙ্কিমচন্দ্র এ-সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না ব'লেই বঙ্কিম-উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের সমস্যা নেই, সেখানে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সমস্যাই প্রধান, এবং সে-সমস্যাও লেখকের নৈতিক তত্ত্বের অন্তর্গত। সেজন্য তাঁর রচনারীতি জীবন সামগ্র্য প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নয়, তাই বঙ্কিম-উপন্যাসে ঘটনা এত প্রবল। তবু মধ্যে মধ্যে মানুষের অন্তরাত্মার প্রতিচ্ছবি চিত্রণের জন্য যে দু-একটি উপন্যাস তাৎপর্যপূর্ণ, "কৃষ্ণকান্তের উইল" সেই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

"রজনী" বা "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির সামান্য আভাস পেলেও বঙ্কিম অনুসৃত রীতির পরিপূর্ণ বিকাশের উদাহরণ "চোখের বালি" নয়, কারণ বঙ্কিম অনুসৃত পদ্ধতি ও "চোখের বালি" উপন্যাসে অবলম্বিত রবীন্দ্র-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিনোদিনী চরিত্রে বঙ্কিমের প্রভাব কিঞ্চিৎ বর্তালেও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লক্ষ ও উদ্দেশ্যের ব্যবধান সমুদ্র প্রায়, এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দু-টি উপন্যাসে বঙ্কিম প্রভাবিত হলেও, তাঁর স্বকীয়ত্ব সেই অপরিণত

রচনাতেও প্রকট। ওই দু-টি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার আদর্শ লক্ষণীয়, এবং "চোখের বালি" উপন্যাসে সেই আদর্শ-ই সমস্ত ত্রুটি দুর্বলতা মোচন করে স্বয়ং প্রকাশিত। "বিষবৃক্ষ" ও "বিষবৃক্ষ" পরবর্তী উপন্যাসগুলি বঙ্কিমের কাছে সমাজ শাসন ও নীতি শিক্ষার অন্যতম উপায় স্বরূপ বিবেচিত, এর ফলে বঙ্কিম-উপন্যাসে স্বাভাবিক সাবলীলতা অনেক সময় বিঘ্নিত, সেজন্য আমাদের পরিতাপের অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-প্রিয়তাও সর্বজনবিদিত, "মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া, প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া"—এই তত্ত্বের শাসনে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টা বহুসময় পীড়িত, কিন্তু জগৎ ও জীবনাগ্রহ, এবং সেই সূত্রে মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তুগুলির জটিলতা মোচন ও জীবন সামগ্র্য অনুসন্ধান রবীন্দ্রনাথের লক্ষ ব'লে এই তাত্ত্বিক-শাসন সামাজিক-অনুশাসনে পরিণত নয়, যদিও তত্ত্ব-প্রিয়তার জন্য তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের ফলশ্রুতি আমাদের অতৃপ্তির কারণ, এজন্য অবশ্য রবীন্দ্র-মানসের অন্তঃশীলা অন্তর্দ্বন্দ্ব মূলত দায়ী। তথাপি তিনি নীতিবিদের ভূমিকা গ্রহণ করেন না, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিত্ব উত্থিত সমস্যা তাঁর মূল উপজীব্য ব'লে বঙ্কিম অনুসৃত পদ্ধতির অভিব্যক্তির উচ্চতম স্তরেও "চোখের বালি"-র মতো উপন্যাসের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়; "চোখের বালি" বাংলাভাষার শুধুমাত্র প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস-ই নয়, উপন্যাসের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বাংলা উপন্যাসের মুষ্টিমেয়র মধ্যে অন্যতম একটি। এক অর্থে "চোখের বালি" বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাস্তব উপন্যাস।

অন্যদিকে ঘটনা উপস্থাপনার পদ্ধতিও উপন্যাসের নব পর্যায়ে ভিন্নতর। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে ঘটনার কোনও স্বকীয় মূল্য নেই, চরিত্র রূপায়ণে পাত্র-পাত্রীর পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণে এবং দেশ-

কালের পটে সন্ন্যস্ত করায় ঘটনার মূল্য চূড়ান্ত, যেজন্য লেখকের খেয়াল-খুশী মত ঘটনার অবতারণা বা ঘটনার মোড় ফেরানো প্রায় অচল এক্ষেত্রে। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব উত্থিত সমস্যা বা ব্যক্তিত্বের সমস্যা নব পর্যায়ের উপজীব্য ব'লে চরিত্রের ঘটনার ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া অসম্ভব, কারণ তেমন সম্ভাবনায় জীবন সামগ্র্য অন্বেষণ নিরর্থকই নয় পণ্ডশ্রমও, যেহেতু সেক্ষেত্রে মানুষের আংশিকতাই উদ্ঘাটিত। তাই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক, কারণ এ-শ্রেণীর উপন্যাসে চরিত্রের সমস্যা মূল সমস্যার অন্তর্গত, ফলে তথাকথিত আখ্যানবৃত্ত সীমিত হতে বাধ্য, যেহেতু এস্থলে সমস্যা চরিত্র বিকাশের ন্যায় ও যুক্তি নির্ভর।

খ. প্রথম বাস্তব উপন্যাস :

"বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় প্রাচীন ও আধুনিক পর্যায়ের "বিষবৃক্ষ" ও "চোখের বালি" উপন্যাসে শান্তসুখী দাম্পত্য জীবনে বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী চরিত্র বিধবা মহিলা। সূর্যমুখী-নগেন্দ্রর জীবনে কুন্দর আবির্ভাব, এবং আশা-মহেন্দ্রর জীবনে বিনোদিনীর আবির্ভাব জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথম ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ ও তার ভয়াবহ পরিণাম, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ না ঘটিয়ে প্রায় সেই একই পরিণাম চিত্রণে উপন্যাস দু-টির কাহিনীতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত, অথচ উভয় ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও ঔপন্যাসিক লক্ষ ভিন্ন হওয়ায় দ্বিতীয় উপন্যাস প্রথমটির হুবহু অনুসরণ বা অনুলিপি নয়, বরং সমস্যা রূপায়ণের ভিন্নতায় উপস্থাপনা পদ্ধতি ভিন্ন হতে বাধ্য, "চোখের বালি" তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নগেন্দ্রর জীবনে কুন্দর

আবির্ভাব, এবং কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রর অতিশয় আকর্ষণ-ই নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনে ট্র্যাজিডির জন্য দায়ী, অথচ নগেন্দ্র-কুন্দর প্রণয় উন্মেষের কাহিনী পাঠক সম্মুখে ধীরে ধীরে উন্মোচিত না হয়ে প্রায় সংবাদ হিসাবে বিবৃত, যদিও প্রথম দুর্বলতার সংবাদ নগেন্দ্রর পত্রে লভ্য। হরদেব ঘোষালের কাছে পত্রে নগেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে আপন হৃদয় উদ্ঘাটিত না করলেও পত্রের ভাষা ও ভাবে নায়কের দুর্বলতাই প্রকট, "কুন্দ যে নির্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধহয়, অথচ আমার বোধহয় এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধহয় যেন, কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া আর কিছু আছে।" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। এরপর একাদশ পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রর কুন্দর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সংবাদ পাঠক অবগত হন। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি সম্পূর্ণ নেপথ্যের ঘটনা, এবং এ-সংবাদটি নায়ক-নায়িকার আচার-আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না ক'রে সূর্যমুখীর পত্রে পরিবেশিত, "সেই স্বামী কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোনো অভিলাষ থাকে তবে সে স্বামীর স্নেহ, সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।" অর্থাৎ তিন বৎসর পর মূল কাহিনীর পট উত্তোলনে নগেন্দ্র কুন্দর প্রেমাসক্ত এমন চিত্র পাঠক লেখকের বিবৃতি অনুযায়ী বিশ্বাস করতে বাধ্য, এর-পরের অধ্যায়গুলি নগেন্দ্রর ক্রমপরিণতির ইতিহাস, যে-ইতিহাসে নগেন্দ্রর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, অবশ্য কয়েকটি পত্রে নগেন্দ্রর রূপান্তরের চিত্রও পাওয়া যায়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে হরদেব ঘোষালের পত্রের উত্তরে নগেন্দ্রর পত্রের অংশ বিশেষ ("আমার উত্তরে রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি") থেকে জানা যায় মাত্র একটি অধ্যায়ের

মধ্যেই নায়কের আকর্ষণ তীব্র ও প্রবল হয়ে উঠেছে, সূর্যমুখীর পত্রও এ-সংবাদের সমর্থক, "একবার এসো! কমলমণি!' ভগিনি! তুমি বই আমার সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো।" বস্তুত, একাদশ অধ্যায়ে নগেন্দ্রর প্রেম-উন্মেষের কাহিনী নিশ্চয়ই ঘটনার এমন এক পর্যায়ে বিবৃত, যখন নগেন্দ্র এ-ব্যাপারে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের আবেগ-মথিত মনের চিত্র উপন্যাসের অন্তরালের ঘটনা, এই-ঘটনায় পাত্র-পাত্রীর জীবনে ট্র্যাজিডির সূত্রপাত হয়েছে, অথচ ষোড়শ পরিচ্ছেদের স্বল্প পরিসরে মাত্র নায়কের চিত্তচাঞ্চল্যের চিত্র অঙ্কিত। "না" শীর্ষক পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রর মানসিক স্থৈর্য বিঘ্নিত হবার চিত্রটি স্পষ্ট, "শুন কুন্দ! আমি বহুকষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। * * * এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।" নগেন্দ্রনাথ কুন্দর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, এবং কুন্দর গৃহত্যাগে সূর্যমুখীর সঙ্গে নগেন্দ্রর বিরোধ তাপের শীর্ষে উঠেছে; অবশেষে নগেন্দ্র ও কুন্দর পরিণয়ে এই প্রেম-কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপর প্রায়শ্চিত্তের পালা। নায়কের প্রেম-উন্মেষ যেমন আকস্মিক, কুন্দর প্রতি বিকর্ষণও তেমনি আকস্মিক ঘটনা। হয়ত প্রেমের উষ্ণতা হ্রাস পেলে এ-বিকর্ষণ যেকোনও ব্যক্তির জীবনে স্বাভাবিক, কিন্তু উপন্যাসে আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ ও বিস্তারের প্রয়োজন, অথচ আকর্ষণের মত বিকর্ষণের কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত অথবা ঘটনার আবর্তে অঙ্কিত নয়, ফলে সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের ঘটনায় নায়কের মোহগ্রস্ত মন ও চক্ষুর আবরণ উন্মোচন হওয়ার ব্যাপারটি তাই যথেষ্ট বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না। এই একটি ঘটনা মোহভঙ্গের অন্যতম কারণ হলেও একমাত্র

কারণ নয়, মোহভঙ্গ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা বা মানসিক অবস্থার বিবরণ। তাই নগেন্দ্রনাথের চিন্তা, "আমাকে সূর্যমুখী বরাবর ভালোবাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন? লোহার শিকলই ভালো", ভাবালুতার নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায় মাত্র। পরবর্তী দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে হরদেব ঘোষাল ও নগেন্দ্রর পত্র ও পত্রোত্তরে উক্ত ঘটনার যবনিকাপাত হয়েছে।

কুন্দ-নগেন্দ্রর প্রণয়োপাখ্যানের বিশ্লেষণে এ-কথা স্পষ্ট যে, যে-ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণের প্রয়োজন ঐকান্তিক ছিল, ঔপন্যাসিক সে-ঘটনা অন্তরালে রাখেন ব'লে পাত্র-পাত্রীর অন্তর জগতের সংবাদ পাঠকের কাছে অজ্ঞাত থাকে, এবং এজন্যই মনেহয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাত্র-পাত্রীর অন্তর যথেষ্ট মনোযোগের বিষয় ছিল না। নগেন্দ্র-কুন্দর প্রণয়-উন্মেষের ধারাবাহিক বিবরণ অনুপস্থিত, সেজন্য লেখক দেবেন্দ্র-হীরার উপাখ্যান এবং কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রর ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা সংযুক্ত ক'রে পাত্র-পাত্রীর মনোজগতের বিবরণের ঘাটতি পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন, বিশেষ ক'রে হীরার সাহায্যে নগেন্দ্রর চিত্তচাঞ্চল্য তীক্ষ্ণ ও তীব্রতর করার ঘটনাগুলি তারই ইঙ্গিত দেয়। বস্তুত, ঘটনাপরম্পরার বিবরণে বঙ্কিম বেশী মনোযোগী ছিলেন বলে পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্ব ও অন্তরের চিত্র সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে।

বরং "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের প্রথম খণ্ড মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের অধিক নিকটবর্তী। নায়ক গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রেম-উন্মেষ অন্তরালের ঘটনা নয়, এমনকি গোবিন্দলালের প্রণয়-উন্মেষের ঘটনা আকস্মিকতা-বর্জিত। গোবিন্দলাল ক্রমে ক্রমে এবং ঘটনাবর্তে রোহিণীর প্রণয়াসক্ত, এই প্রণয়-উন্মেষের মূলে ভ্রমর ও পরিপার্শ্বের অবদান যথেষ্ট, উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ

ঘটনা পাঠকের সামনে অনাবৃত ব'লে পাত্র-পাত্রীর অন্তরের চিত্র ঔপন্যাসিকের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে, সেজন্য গোবিন্দলালের আকর্ষণের কাহিনী অতর্কিত আকস্মিক ঘটনা বা আচরণে পূর্ণ নয়। যেখানে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ উপেক্ষিত হয়েছে, সেখানে ছোট ছোট ঘটনা ও সেই ঘটনাজাত প্রতিক্রিয়া বা ঘটনার ফল লিপিবদ্ধ হওয়ায় পাঠক পাত্র-পাত্রীর হৃদয়ের উত্তাপ ও শীতলতা পরোক্ষভাবে আভাসে ইঙ্গিতে লাভ করেন। কিন্তু রোহিণীর প্রণয় সহসা উন্মেষিত, এবং রোহিণীর আকর্ষণের কাহিনী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত নয়, "গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয় পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক্, পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।" লেখকের এমন মন্তব্যে রোহিণীর আকর্ষণের কাহিনী বিবৃত ব'লে রোহিণীর ক্ষেত্রে প্রথম খণ্ডেই মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়, অথচ এ-পদ্ধতি পরিহার করায় উপন্যাসের ক্ষতি হয়েছে। সেজন্য "কৃষ্ণকান্তের উইল" বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের মর্যাদা-লাভে বঞ্চিত হয়েছে, অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ডে এ-সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট। তাই রোহিণী-হত্যা উপন্যাসের যুক্তিহীনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের রচনা-পদ্ধতি পরিবর্তন অবশ্য এজন্য মূলত দায়ী এবং রচনাভঙ্গী-পরিবর্তনের মূলে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের নীতির প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধের প্রসঙ্গ অনিবার্যরূপে স্মরণীয়। তাই "কৃষ্ণকান্তের উইল" বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক সত্তা ও নৈতিক সত্তার দ্বন্দ্বে নৈতিকতার বলিবিশেষ। বস্তুত, তত্ত্ব-

প্রতিপাদন মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য হলে সৃষ্টিশীল সাহিত্য, শিল্প আড়ষ্ট ও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পাত্র-পাত্রীর সজীব সম্পর্কের রহস্য উন্মোচন, সামান্য ঘটনার বিপুল আলোড়ন ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাত্র-পাত্রীর স্থির-সম্পর্কের পরিবর্তন, এবং পরিবর্তনের সূত্রে পাত্র-পাত্রীর ঘটনা-সৃষ্টিকারী ক্ষমতার কথা রবীন্দ্রনাথ ঢক্কা নিনাদে প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন না, তাই পাত্র-পাত্রী জৈবনিক বিকাশের ন্যায় তাঁর করায়ত্ত, সেজন্য ঘটনাবাহুল্য বর্জিত হয়েছে উপন্যাসের সৃষ্টিশীল নিয়মে। ঘটনার চাপ হ্রাস পাওয়ার অর্থ চরিত্রগুলির চলা-ফেরার স্বাধীনতা অর্জন, অর্থাৎ চরিত্রগুলি শুধুমাত্র ঘটনার দাস না হয়ে স্বকীয়ত্ব লাভের পথে অগ্রসর হয়েছে। এজন্যই, একমাত্র জীবন-সামগ্র্য সন্ধানে "নামতে হলো মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।" (সূচনা, চোখের বালি)। মানুষের অন্তরের কথা পূর্ণ মর্যাদা পাওয়ার ফলে বাংলা উপন্যাস এক নিমেষে কৈশোর অতিক্রম করে পা দিল যৌবনে।

"চোখের বালি" উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা পরিহার, পাত্র-পাত্রীর সংখ্যাহ্রাস, পাত্র-পাত্রীর মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র চিত্রণ, চরিত্রের স্বতন্ত্র স্বকীয় বিকাশ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাথমিক পাঠেই গোচরীভূত হয়, এবং এইসব বৈশিষ্ট্যেই "চোখের বালি" অন্যান্য ঘটনা-প্রধান উপন্যাস থেকে পৃথক, "মানব বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায় নি।" (ঐ)

বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রর বিবাহ স্থির হওয়া সত্ত্বেও নায়কের তৎকালীন অনিচ্ছায় সে-বিবাহ স্থগিত থাকে এবং পরবর্তী সময়ে

আশার সঙ্গে মহেন্দ্রর বিবাহ হয়। মাতৃপরায়ণ মহেন্দ্র বিবাহের পর পত্নীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হওয়ার ফলে রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষার উদ্রেক ও ঈর্ষার জন্য পুত্রের প্রতি অভিমানও হওয়া স্বাভাবিক। তাই রাজলক্ষ্মীর কলকাতা ত্যাগের ইচ্ছা ও স্বগ্রামে যাওয়ার বাসনা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। রাজলক্ষ্মীর কলকাতা প্রত্যাবর্তন ও সেই সঙ্গে বিনোদিনীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব আশা-মহেন্দ্রর জীবনে সংকটরূপে সূচিত হয়, কারণ বিনোদিনীর আগমনের পর আশা-মহেন্দ্রর সুখী দাম্পত্য-জীবনের ভিতে ফাটল ধরে। বিনোদিনী শিক্ষিতা ও সুন্দরী, তদুপরি মহেন্দ্রর সঙ্গে একদা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ব'লে আশা-মহেন্দ্রর জীবনে বিনোদিনীর অনুপ্রবেশ সহজ হয়। অন্যদিকে বিয়ের কিছু পরেই বিনোদিনী বিধবা হওয়ায় তার কামনা-বাসনা অতৃপ্ত থাকে; ফলে বিনোদিনী যৌবনের নিয়মেই অতিসহজে কামনা-বাসনার শরে আক্রান্ত হয়, অন্যদিকে আশার মুখে তাদের সুখময় দাম্পত্য-জীবনের বিবরণ শুনে বিনোদিনীর অচরিতার্থ বাসনা তীক্ষ্ণতর হওয়া স্বাভাবিক, অর্থাৎ মহেন্দ্র-আশার জীবনে বিনোদের অতিমন্থর অনুপ্রবেশের স্তরগুলি উপন্যাসের নিয়ম-অনুযায়ী সংঘটিত। আবার বিনোদের প্রতি মহেন্দ্রর আকর্ষণ-কাহিনী যুক্তিপরম্পরায় লিপিবদ্ধ। প্রথমে বিনোদের সঙ্গে মহেন্দ্রর সাক্ষাতের অনিচ্ছা ও পরে আশার মুখে বিনোদের সতত প্রশংসা শুনে মহেন্দ্রর কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। এ-ছাড়া ছলে-কৌশলে মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদের সাক্ষাৎ ঘটানোও সম্পর্ক নিবিড়তর করার ভূমিকা হিসাবে অকিঞ্চিৎকর নয়। আশার অন্যান্য আচরণও মহেন্দ্রর প্রেম-উন্মেষের সহায়ক হয়। বিহারীর ভূমিকাও এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ তার সতর্ক বাণী মহেন্দ্রর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা

জাগিয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট, অবশেষে আশার কাশীগমন মহেন্দ্রর জীবনে সেই সুবর্ণ সুযোগের অবকাশ দেয়। ভীরু মহেন্দ্র আপন চারিত্র্য-দুর্বলতায় বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সেজন্য ঔপন্যাসিক অজস্র ঘটনার আশ্রয় বা বক্তব্য আরোপের চেষ্টা না ক'রে মহেন্দ্র-আশার সম্পর্ক পরিবর্তন এবং বিনোদের সঙ্গে মহেন্দ্রর সম্পর্কস্থাপন ব্যাপারটির প্রতি স্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বিবরণদানে মনোযোগী হয়েছেন, সেজন্য আপাততুচ্ছ ও সামান্য ঘটনা "চোখের বালি" উপন্যাসে হেলা-ফেলার বস্তু নয়, কারণ "ঘটনা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে স্থূল অর্থে কিছু ঘটে যাওয়া নয়। ঘটনার অর্থ এখানে এইঃ যে-ব্যক্তি যে-জীবনবিন্যাসের অন্তর্বর্তী সেই জীবনবিন্যাসে অপর একটা ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে সুগভীর একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়।" (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃঃ ১৬৩)। আর "চোখের বালি"-র সমস্যা যেহেতু চরিত্রের ব্যক্তিত্বে নিহিত, সেহেতু বিনোদিনী স্বীয় ব্যক্তিত্বের চাপেই অনতিবিলম্বে মহেন্দ্রর প্রতি বিরক্ত হয়ে বিহারীর স্থির অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের চুম্বকে আকৃষ্ট হয়। দমদমে চড়ুই-ভাতির ঘটনাটি সেজন্য উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ এই চড়ুইভাতি উপলক্ষ্যে বিনোদিনীর মধ্যে "বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল", এবং "আজ এই মায়ামণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কী একটা অপূর্বভাবে অনুভব করিল।" এই দিনটি তাই বিহারী-বিনোদের জীবনে স্মরণীয়, এবং তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার উন্মেষ ও বিকাশ মহেন্দ্ররও গোচরীভূত হয় নিঃসন্দেহে, কারণ চড়ুইভাতি থেকে ফেরার পথে "মহেন্দ্র সুদীর্ঘ পথ নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকিল।" গাধাবোট বিহারী বিনোদিনীর কাছে ব্যক্তি হয়ে উঠলে বিনোদের

উপর মহেন্দ্রর আকর্ষণ দুর্নিবার হয় স্বাভাবিক নিয়মে। অন্যদিকে আশার প্রতি বিহারীর সামান্য দুর্বলতা ও সহানুভূতি সম্পর্ক জটিল করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আশাকে কেন্দ্র ক'রে বিহারীর জীবন যেমন দ্বন্দ্বমথিত, তেমনি বিনোদিনী, আশার প্রতি বিহারীর সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্বে ঈর্ষান্বিত। ফলে উপন্যাসের প্রায় প্রতি পাতায় চারটি চরিত্রের (মহেন্দ্র, আশা, বিনোদিনী, বিহারী) সম্পর্কের গ্রন্থিবন্ধন ও গ্রন্থিমোচন—এর জন্য ঔপন্যাসিককে খেয়াল-খুশীর আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে ব্যক্তিত্ববিকাশের ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়েছে। "বিষবৃক্ষ"-এ আকস্মিক প্রণয়-উদ্গম ও মোহভঙ্গের কাহিনী লিপিবদ্ধ, তাই সেখানে অনড় একরঙা চরিত্র-নির্বাচন ক্ষতিকর নয়, কারণ সেই উপন্যাসে লেখকের অবলম্বন অজস্র ঘটনা, উপকাহিনী; কিন্তু "চোখের বালি"-র রূপায়িত সমস্যা প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত ব'লেই লেখকের কল্পনার পরিধিতে সমগ্রজীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়, তাই অনিবার্যভাবেই "চোখের বালি" "বিষবৃক্ষ"-এর অনুরূপ নয়, সেজন্য মাত্র ছয়টি চরিত্র ও তথাকথিত ঘটনার বিরল সমাবেশ উপন্যাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। "চোখের বালি" উপন্যাসে, লেখকের বক্তব্য উপন্যাসের সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত, সেজন্য চরিত্রগুলি লেখকের হাতের পুতুল হয়ে ওঠে না, প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র ও সজীব, এবং উপন্যাসটির জগৎ আমাদের দৈনন্দিন জগৎ থেকে দূরে অবস্থিত নয় ব'লেই "চোখের বালি" বাংলাসাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস-ই নয়, প্রথম বাস্তব উপন্যাসও বটে। তবু "চোখের বালি" ত্রুটি-মুক্ত নয়। এমনকি উপন্যাসটি মহৎ উপন্যাসও নয়, এর কারণ উপন্যাসের পরিধি ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা। উপন্যাসটির প্রধান দোষ হচ্ছে ঘটনার সরল গতি ও বলার মসৃণ ভঙ্গী। সাধারণ

ঘটনার মত নাটকীয় মুহূর্তের ঘটনাগুলি মসৃণ ভঙ্গীতে বিবৃত, ফলে নাটকীয় মুহূর্তগুলির ব্যবহারে ঔপন্যাসিক বহুসময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন এবং নাটকীয়তা সৃষ্টি না হওয়ার জন্য সেই সব দৃশ্য ব্যর্থ হওয়ায় পাঠকের মনে ঈপ্সিত আলোড়ন তোলে না; সেই দৃশ্যের কোন কোনটি অতিনাটকীয় এবং সময় সময় হাস্যকরও, যেমন : বিহারীর প্রণয়াসক্ত বিনোদিনীর পল্লী আবাসে উন্মত্তের মত মহেন্দ্রর আবির্ভাব, কলকাতার বাসায় বিনোদিনীর প্রত্যাখ্যান। এছাড়া, এলাহাবাদ স্টেশনে পোস্ট আপিসের বাক্স থেকে বিহারীর ঠিকানা উদ্ধার অতি আকস্মিক ঘটনা, এমন কাকতালীয় ঘটনার বিবরণ ঔপন্যাসিকের দুর্বলতারই পরিচায়ক, তেমন দুর্বলতার পরিচয় অন্নপূর্ণার কাশী যাওয়ার ঘটনা, কারণ লেখক অন্নপূর্ণাকে কাশী পাঠিয়ে কিঞ্চিৎ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অন্নপূর্ণার ভূমিকা অনেকটা সর্বদুঃখহর সর্বসংকটহর মহাপুরুষের মত, অন্তত আশা ও মহেন্দ্রর ক্ষেত্রে। এমনকি বিহারীর চরিত্র অতিসরল ভাবে অঙ্কিত। বিহারীপ্রদত্ত আঘাতের ক্ষতচিহ্নকে বিনোদের জীবনে একটি অমূল্য উপঢৌকন হিসেবে গণ্য করা যথেষ্ট সুরুচির পরিচয় হলেও ব্যাপারটি সেন্টিমেণ্টাল নিঃসন্দেহে। এজন্য বিহারী-বিনোদের সম্পর্ক যে জটিলতায় স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ সংকোচে সেই জটিলতার পথ পরিহার করায় সম্পর্ক-নিরূপণের চিত্রটি মসৃণ ও সরল হয়ে উঠেছে। চিঠি লেখালেখি ও চিঠি ধরাপড়ার ব্যাপারটিও নিতান্ত বালকসুলভ, কারণ যে ঔপন্যাসিক পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে অতি পারদর্শী, সেই ঔপন্যাসিকের পক্ষে এমন সুযোগ নেয়া আমাদের বিমূঢ় করে। তেমন বিমূঢ় হওয়ার বিষয়—উপন্যাসের পরিণতি। যে বিনোদিনীর জন্য এত কাণ্ড, সেই বিনোদিনীর কাশীযাত্রার সিদ্ধান্ত, উপন্যাসটির

ক্রম অনুসরণ ক'রে কোনমতে সমর্থন করা চলে না। এ-সিদ্ধান্ত লেখকের আরোপিত, এবং এইখানে "চোখের বালি"-র দুর্জয় দুর্বলতা সন্দেহ নেই, এ-বিষয়ে স্বয়ং লেখকের সচেতনতা পত্রাংশে বিধৃত, "চোখের বালি বেরবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত। মাসিকপত্র অনেকসময় লেখকদের অসতর্ক করে দেয়, লেখায় সস্তা দামের মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করবার দিকে ঝোঁক আসে। এই দুষ্কর্ম করেছি কিন্তু তাতে ফল পাই নি, পাঠকরা যথেষ্ট চোখ রাঙিয়েছিল।" (রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য গ্রন্থ থেকে পত্রাংশটি উদ্ধৃত, পৃ: ১৯৩)।

এ-সব ত্রুটি-দুর্বলতা সত্ত্বেও "চোখের বলি" বাংলা উপন্যাসের নতুন ও সফল নিরীক্ষার একটি নিদর্শন তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে ঘটনার আধিপত্য নিরঙ্কুশ নয়, বরং ঘটনার বিরল সমাবেশে এ-সমাজ বর্ণহীন ও একঘেয়ে। সেজন্য মধ্যবিত্তর জীবনধারা গতানুগতিক ও মন্থর। যে-সামান্য আলোড়ন কদাচ পরিলক্ষিত হয়, সে-আলোড়নও তাৎক্ষণিক। তবু এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে মধ্যে মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, সেই বিক্ষোভের মূল সমাজের গর্ভেই নিহিত অথবা বিক্ষোভটি সমাজের বিরোধী সত্তারই উদ্ভাস। রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত জীবনের এ-মর্ম জানেন ব'লেই তাঁর উপন্যাসে ("চোখের বালি" থেকে শুরু করে অন্যান্য উপন্যাসে, ব্যতিক্রম "নৌকাডুবি") বঙ্কিমী ঘটনার আধিপত্য অনুপস্থিত। দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা বিক্ষোভ তাই অতি অনায়াসে চরিত্রের ন্যায়-অনুসারে চিত্রিত হয়, এবং এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা ও বাস্তবতাবোধের জন্ম। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ গোটামানুষের তাৎপর্য

ধরায় আগ্রহী ব'লে সামাজিক চেতনা ও ইতিহাসবোধ তাঁর মজ্জায় মজ্জায় সংহত। বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যবিত্তজীবনের স্বরূপ আবিষ্কার করতে অক্ষম হয়েছেন, সেজন্য তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি সবসময় বাস্তববোধের পরিচায়ক নয়, এবং সময় সময় বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাস রোমান্সের লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অসামান্য, এবং সেই সূত্রে মধ্যবিত্তজীবনের সঠিক রূপায়ণে "চোখের বালি" বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাস্তবধর্মী উপন্যাস, যদিও পুরুষ চরিত্রগুলি প্রায় নিষ্ক্রিয় হওয়ায় বাস্তবের নিষ্ঠুর নির্মম চিত্র "চোখের বালি"-তে অনুপস্থিত ; এ-অনুপস্থিতি অসম্পূর্ণতা নিশ্চয়ই।

গ. সৎ উপন্যাসের তাৎপর্য ঃ

বাংলা উপন্যাসের সীমিত পরিসরে "গোরা" উপন্যাস শিল্পকর্মের এক আশ্চর্য উদাহরণ। প্রকরণ, ভাষা, বক্তব্য প্রভৃতির সুষম সমন্বয়ে "গোরা" অদ্যাপি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। গোরাই "গোরা" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, এবং সেই সুবাদে গোরার উত্তরণের কাহিনী উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এ-উত্তরণ অবশ্যই গোরার স্বদেশ-আত্মা অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় আত্মানুসন্ধানও বটে, যদিও এই উভয় অন্বিষ্ট গোরার সত্যানুসন্ধান ও জীবনের বিরাট তাৎপর্য আবিষ্কারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশের দুর্দশা দৈন্য দুঃখের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত, এবং এ-বিচ্ছিন্নতার জ্বালা গোরার কাছে অতি স্পষ্ট, তাই সে স্বদেশের মহিমা কীর্তনে, সনাতন সমাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কারণ এবম্বিধ কার্যে বিচ্ছিন্নতার

নিরসন সহজ হয়, ব'লে গোরার ধারণা। এজন্য কৃষক, মজুর, নাপিত, ফেরিঅলা—তথাকথিত শিক্ষিতের ভাষায় অন্ত্যজ শ্রেণীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন গোরার নিজের বিচ্ছিন্নতা উত্তরণেরই প্রয়াস। এই প্রচেষ্টায় দেশের অবহেলিত জনের সান্নিধ্যলাভের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। কিন্তু চারদিকের রাশি রাশি দুঃখ দৈন্য কুসংস্কারে গোরা পীড়িত, গায়ের জোরে সব কিছু আপন করতে গিয়ে সে পদে পদে বিড়ম্বিত নিজের কাছেই, কারণ ততদিন সে আপন-সত্তার স্বরূপ আবিষ্কারে অক্ষম হয়েছে। সুচরিতার সংস্পর্শ তাই তার চেতনা উদ্বোধনে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ সেই সংস্পর্শে আপন খণ্ডিত সত্তাই আবিষ্কৃত হয়। তাই "গোরা" নিছক অর্থে দেশপ্রেমের উপন্যাস নয়, গোরার দেশ জীবন্ত এবং যুগে যুগে নতুন ও রহস্যময়, তাই সে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রবল চাপে ও আকর্ষণে জীবনের মহৎ তাৎপর্য এবং "যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমি-ই আমার ভারতবর্ষ," সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়। "গোরা"-য় রবীন্দ্রনাথ এমন এক মহৎ উত্তরণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার প্রয়াসী হয়েছেন।

কাহিনী ও চরিত্রের ক্রম-অনুসারে "গোরা" উপন্যাসকে আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে। এই তিনপর্যায়ে বিভক্ত করলে গোরার উত্তরণের কাহিনী পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আদি পর্যায়ের সূচনা বিনয়ের সঙ্গে পরেশবাবু ও সুচরিতার পরিচয়ে, সমাপ্তি গোরার কারাবরণে। এ-অংশে গোরাই প্রধান পুরুষ এবং গোরার স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশভক্তির আলেখ্য

এ-অংশের উপজীব্য। গোরার ধর্মীয় চিন্তা তার স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত, কারণ ভারতবর্ষের বিরাট ঐক্য অনুসন্ধানের পথ, তার ধারণায়, এর মাধ্যমে লভ্য। ফলে গোরার চরিত্রে ভাবাবেগের প্রাবল্য, স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা লক্ষণীয়। প্রথম জীবনে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করলেও বিদেশী কোনও ব্যক্তির প্রবন্ধে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম আক্রান্ত হ'লে কিঞ্চিৎ তপ্ত উত্তেজনায় হিন্দুধর্মে গা ভাসান, গোরার মত চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তাই হিন্দুধর্ম রক্ষার কর্মে ব্রতী হয়ে সে-আকর্ষণে দুর্বার হওয়া তার জীবনে সুস্থতারই প্রকাশ, যেহেতু ধর্ম ও স্বদেশ গোরার জীবনে অঙ্গাঙ্গী। এজন্য এ-পর্যায়ে গোরার চরিত্র জটিলতা-মুক্ত। তার কল্পনা-জগৎ ও বাস্তব জগতের ব্যবধান নেই ব'লেই সে অতি নিশ্চিত। একমাত্র ব্রাহ্মবাড়ি যাওয়া ও মহিম-কন্যার বিবাহসংক্রান্ত ঘটনায় ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়, যদিও সেই চিত্ত-বিক্ষোভ ক্ষণিক এবং তা আপন আবেগের টানে মুহূর্তকয়েক পরে অন্তর্হিত হয়। এই ঋজু পৌরুষময় ব্যক্তির চরিত্রায়ণে লেখকের উপস্থাপনাপদ্ধতি আশ্চর্য রকমের সরল, এবং গোরার একমুখী অভিযানের সংযত মসৃণ ভঙ্গী লেখকের দক্ষতারই প্রমাণ। চেহারার বর্ণনা, কথাবলার ভঙ্গী, সাজ-সজ্জার বিবরণে ঔপন্যাসিকের সচেতনতা গোরার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার একটি অনবদ্য কৌশল, অথচ এই ঋজু অবিসর্পিল চরিত্রের অন্তরে রূপান্তরের ইঙ্গিতও লুকিয়ে আছে, যদিও সেই ইঙ্গিত অতি সূক্ষ্ম এবং আবেগের কোনও অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশিত হয়। বিনয়ের আবেগ-স্পন্দিত বিবরণের পর গোরার উত্তরে, "জীবন ব্যাপারের মধ্যে এই সমস্ত আবেগ এবং আবেশ আমার কাছে যে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত ছোটো ঠেকেছে সে কথাও অস্বীকার করতে পারি

নে। তাই বলে এটা যে বাস্তবিক ছোটো তা হয়ত নয়—এর শক্তি, এর গভীরতা আমি প্রত্যক্ষ করি নি বলেই এটা আমার কাছে বস্তুহীন মায়ার মত ঠেকেছে—কিন্তু তোমার এত বড়ো উপলব্ধিকে আজ আমি মিথ্যে বলবো কি করে ?", সেই আভাস-ই পরিলক্ষিত। একদিন পরেশবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নির্জন গঙ্গাতীরে প্রকৃতির মধ্যে অনাস্বাদিত আনন্দলাভ গোরার জীবনে বিশেষ অর্থময়, কারণ ঘটনাটি ভবিষ্যৎ গোরার বীজ স্বরূপ। সেই মুহূর্তে গোরার মানসিক অবস্থা যেন অর্ধজাগরণের স্পষ্টতা-অস্পষ্টতার স্বপ্নের ধরা-ছোঁয়ার, অথচ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে: "প্রকৃতি কোনোদিন গোরার মনকে আকর্ষণ করিবার অবকাশ পায় নাই। * * * আজ কিন্তু নদীর উপরকার ওই আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকার-দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারম্বার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে আর কতকগুলি দীপহীন নিস্তব্ধ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি গ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মতো তিমিরভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়াছিল—আজ গোরার অন্তঃকরণের কোন্ দ্বারটা খোলা পাইয়া সে মুহূর্তের মধ্যে এই অসতর্ক দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল! এতদিন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা ও কর্ম লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল—আজ কি হইল! আজ কোন্‌খানে সে প্রকৃতিকে স্বীকার করিল এবং করিবামাত্র এই গভীর কালো

জল, এই নিবিড় কালো তট, ওই উদার কালো আকাশ তাহাকে বরণ করিয়া লইল। আজ প্রকৃতির কাছে কেমন করিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। পথের ধারে সদাগরের অপিসের বাগানে কোন্ বিলাতি লতা হইতে একটা অপরিচিত ফুলের মৃদু কোমল গন্ধ গোরার ব্যাকুল হৃদয়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। নদী তাহাকে লোকালয়ের অশ্রান্ত কর্মক্ষেত্র হইতে কোন্ অনির্দেশ্য সুদূরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল; সেখানে নির্জন জলের ধারে গাছগুলি শাখা মিলাইয়া কী ফুল ফুটাইয়াছে! কী ছায়া ফেলিয়াছে! সেখানে নির্মল নীল আকাশের নিচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া! চারিদিক হইতে মাধুর্যের আবর্ত আসিয়া হঠাৎ গোরাকে যে-একটা অতলস্পর্শ অনাদি শক্তির আকর্ষণে টানিয়া লইয়া চলিল পূর্বে কোনো দিন সে তাহার কোনো পরিচয় জানিত না। ইহা একই কালে বেদনায় এবং আনন্দে তাহার সমস্তমনকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে অভিহত করিতে লাগিল।" এই অনুভূতি তাৎক্ষণিক হ'লেও তা গোরার অন্তরের অকপট অনুভূতি। হয়ত ক্ষণিক দুর্বলতা আবরিত করার জন্যই চড়া গলায় তর্ক করা তার স্বধর্ম। গোরা এক অন্বেষক, যার দেশের অন্বেষণ ভৌগোলিক নয়, দেশ তার কাছে সজীব সত্তা। তাই সে জনগণের সান্নিধ্যলাভে এত ইচ্ছুক। আদি পর্যায়ে গোরাই মুখ্য চরিত্র এবং ঘটনাগুলির পরিচালক সে-ই। তাই অন্যান্য চরিত্রগুলি এ-অংশে গোরার কাছে ম্লান।

অথচ মধ্য পর্যায়ের শুরুতে এই সব চরিত্র আপন স্বকীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-অংশের সময় এক মাস। গোরার কারাবরণে

এ-অধ্যায়ের সূচনা, মঞ্চে গোরা অনুপস্থিত। লেখক অতি কৌশলে গোরার হাজতবাসের সুযোগ গ্রহণ ক'রে অন্যান্য চরিত্রদের সক্রিয় ও ব্যক্তিময় করে তোলেন। গোরার কারাবরণ এ-অধ্যায়ের একটি মস্ত ঘটনা, এই ঘটনার জন্যই বিনয় ও ললিতা পরস্পরের সন্নিকটে আসে। আদি পর্যায়ের কাহিনীর সরল ও মন্থর গতি মধ্য পর্যায়ে ক্রমে জটিলতার পথে অগ্রসর হয়, কারণ এখানে চরিত্রগুলি অনেকবেশী সচল। মধ্য-পর্বে কাহিনী একস্থানে অতীতে উপস্থাপিত হয়েছে মাসির অতীত জীবন বর্ণনার সূত্রে, অবশ্য এই বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা সমালোচকের সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। তবু হরিমোহিনীর আবির্ভাবে ব্রাহ্মপরিবারে বিক্ষোভের সৃষ্টি ও সুচরিতার মানসিক সাম্যে অস্থিরতা, নিশ্চিত সম্পর্কগুলির মধ্যে আবর্ত তোলে। এখানে ছোট ছোট ঘটনার সাহায্যে লেখক কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসের নিয়মে অতি অনায়াসে জটিলতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন।

গোরা ছাড়া অন্যান্য চরিত্র গোরার অনুপস্থিতিতে ব্যক্তিত্ব লাভ করে, যেজন্য হাজতবাসের পর গোরা তার পূর্বের স্থানে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে সক্ষম হয় নি। অন্ত্য পর্বের আরম্ভ গোরার কারামুক্তির পর, এবং গোরা "যখন পরেশ ও বিনয়বাবুকে দেখিল তখন তাহার মনে হইল যেন পুরাতন বান্ধবদের পরিচিত সংসারে সে পুনর্জন্ম লাভ করিল।" কারাবাস কালে গোরার মানসিক অবস্থার বিবরণ উপন্যাসে উহ্য, তবু নিভৃত কারাবাসে নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ করার ইঙ্গিত কারামুক্তির পর সুচরিতাকে নতুনভাবে আবিষ্কারের মধ্যে বিধৃত। নির্জন গঙ্গাতীরের সেই অনুভূতি জেলের মধ্যে ক্রমশ শরীরী ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই "জেলের অবরোধের মধ্যে সুচরিতার স্মৃতিকে সে কোনোমতেই

ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।" এবং গোরার আত্ম-অনুসন্ধানে সুচরিতার দান ন্যূন নয়, কারণ সুচরিতার প্রেমই গোরার আত্মোপলব্ধি ও জীবনের পূর্ণ তাৎপর্য লাভের পরশ-পাথর। স্বদেশ ও ধর্মের প্রতি একান্ত অনুরাগেও সে নিজেকে আবিষ্কার করতে অক্ষম হয়েছে, সুচরিতার স্পর্শে তার হৃদয়ের জাগরণ, আর জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। গোরার উত্তরণের কাহিনীতেই পরেশবাবু, আনন্দময়ীর ভূমিকা সার্থকতা পায় এবং বিনয়-ললিতার চরিত্র তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, যদিও এ-সব ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ সুলভ সিদ্ধান্তের পথ পরিহার করেছেন।

"গোরা" উপন্যাসের উল্লিখিত আদি, মধ্য, অন্ত্য পর্যায় তিনটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন অবস্থিতি নয়, একটি বিরাট প্রবাহের চলমান অস্তিত্ববিশেষ। নদীর উৎস থেকে সমতলে পতন এবং অবশেষে সমুদ্রে মহামিলন যেমন একই প্রবাহের অঙ্গ, "গোরা" উপন্যাসের তিনটি পর্যায় সেরূপেই উপমেয়। (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃঃ ২০৭ দ্রষ্টব্য)। সেজন্য মধ্য পর্যায়ে গোরার অনুপস্থিতি গোরার জীবনের ব্যবধান-রেখা বলে আপাত মনে হলেও সমগ্র উপন্যাসের বিচারে এ-পর্যায় গোরার উত্তরণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, যেহেতু অন্যান্য চরিত্রগুলি অপরিবর্তিত থাকলে গোরার উত্তরণ আদৌ সম্ভব হতো না, তাই অন্যান্য চরিত্রের পরিবর্তন ও রূপান্তর গোরার জীবনেও আত্যন্তিক প্রয়োজন। সেজন্য গোরার অনুপস্থিতি গোরার জীবনের ব্যবধান-রেখা নয়, অবশ্য তিনটি পর্যায়ের সন্ধিপর্ব গোরার হাজতবাসের ঘটনা, এবং ঘটনাটি প্রায় প্রতীকের মত। গোরা শুধু শারীরিকভাবে বন্দী নয়, সে নিজের মনেও তার ধ্যান-ধারণা আদর্শ শিক্ষার বেড়াজালে

বন্দী। এতদিন গোরার জগৎ গোরার কল্পনা ও ধ্যানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, এই গণ্ডি ছিন্ন করার প্রয়োজন ছিল, এবং এই গণ্ডি ছিন্ন ক'রে বিরাট প্রাণ-প্রবাহের আস্বাদলাভ স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত হয় ব'লেই গোরা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কাহিনী ও চরিত্র রচনায় রবীন্দ্রনাথের অশেষ দক্ষতা অবশ্য আর কয়েকটি সচেতন শিল্পকর্ম নির্ভর। বিরাট গ্রন্থটির ঘটনাকাল অতি দীর্ঘ নয়, ঘটনাস্থল প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মহানগর কলকাতা। একবার কাহিনী, আদি পর্যায়ের শেষে, পল্লীগ্রামে স্থাপিত। কিন্তু সময়সীমা ও ঘটনাস্থল সংকীর্ণ ও সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও ঔপন্যাসিকের লেখার গুণে পাঠকের মনে এক অধ্যাস সৃষ্টি হয়, এবং এই অধ্যাসের জন্য উপন্যাসের দেশ ও কাল পাঠকের মনে এক বিরাট দেশ ও কালের স্পন্দন জাগায়, অন্যদিকে উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের তর্ক-বিতর্কে যে-আদর্শ ও মতবাদ প্রকাশিত হয়, তার তাৎপর্য একই সঙ্গে ব্যাপক ও গভীর বলেই সময় এবং স্থানের এমন চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগ সার্থক হয়। আসলে গোরা সুচরিতা বা বিনয়ের তর্ক-বিতর্ক শুধু বাগাড়ম্বর নয়, তা প্রত্যেকের জীবনোৎসারিত নিবিড় আন্তরিকতা। তাই বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে চরিত্রগুলি লেখকের হাতের ক্রীড়নক নয়; কথায় ও কর্মে আত্মীয়তা অর্জন করে বলেই গোরা, বিনয়, সুচরিতা, ললিতা আপন আপন আদর্শ ও মতবাদের সূত্রে বিবর্তিত হতে থাকে। চারিত্র্য-বিবর্তনেই তর্ক-বিতর্কের ভূমিকার ইতি নয়, তর্ক-বিতর্কগুলি ঘটনার কর্তাও বটে, সেজন্য ঘটনা ও চরিত্রের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক লেখকের করায়ত্ত। তাই পাঠকের কাছে উপন্যাসের পরিমণ্ডল জীবন্ত এবং সেই সূত্রেই দেশ ও কালের স্পন্দন পাঠকের মনে মহত্তর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, অবশ্য

ভাষার সুষম ও সংযত ব্যবহার সেই মহৎ পরিবেষ্টন সৃষ্টির পরিপোষক।

কাহিনী সরাসরি বিবৃত, তাই উপন্যাসের গতি বহু শাখা-উপশাখায় বিভক্ত নয় এবং লক্ষ্যভেদের প্রতি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ থাকায় উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ের ধীর মন্থরতায় পরবর্তী সময়ে দ্রুততা লক্ষণীয়। ঘটনাগুলি ঘটমান-বর্তমান, মাত্র একটি স্থানে কাহিনী অতীতাবর্তন করলেও বর্তমান মুহূর্ত ও সেই মুহূর্তস্থিত চরিত্রের আচার-আচরণ আমাদের কাছে ধরা পড়ে, সেজন্য বৃহৎ গ্রন্থটি অনড় অচল প্রস্তরবিশেষ নয়, চলমান নদীর মত। লেখক অবশ্য সরাসরি কাহিনী বিবৃত করলেও পর্যায় পর্যায় ভঙ্গী-পরিবর্তনে যত্নশীল ছিলেন। আদি পর্যায়ের কাহিনী ধীর মন্থর, মধ্য পর্যায়ে সেই স্রোতে উর্মির জন্ম ও অন্ত্য পর্যায়ে মহাসমুদ্রের ডাকে নদীর মতই চঞ্চল, আবর্তময়। কিন্তু ভঙ্গী-পরিবর্তন লেখকের খেয়াল-খুশী মাফিক ঘটে না, তাই উপন্যাসের ভারসাম্য সর্বদাই রক্ষিত হয়েছে। সময় ও স্থানের সংকোচনে নাটকীয়তার জন্ম হয়, অথচ "গোরা" উপন্যাসে তেমন নাটকীয়তার প্রয়োগ দুর্লভ, বরং লেখক অতিযত্নে নাটকীয়তা ব্যবহার পরিহার করেছেন। গোরার জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের অবাধ সুযোগ লেখক সচেতনে ও সযত্নে পরিহার করেছেন। গোরার জন্মরহস্য পাঠকের কাছে অনাবৃত, অন্যদিকে উত্তরণের শেষ পর্যায়েই গোরার কাছে বৃত্তান্তটি উন্মোচিত হয়েছে, সেজন্য ঘটনাটি গোরার কাছে ভূমিকম্পসদৃশ নয়, কারণ ততক্ষণে গোরা স্বদেশ-আত্মার অনুসন্ধানের সমান্তরালে আত্মানুসন্ধানে জেনেছে তার পায়ের নীচে মাটি আসলে চোরাবালি।

রবীন্দ্রনাথ "গোরা" উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সর্বাত্মক দৃষ্টি

সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, সেজন্যে বহিঃপ্রকৃতি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সাযুজ্য উপন্যাসের পটভূমি সম্পূর্ণ করার সহায়ক, এবং মায়ামমতাহীন মহানগর প্রকৃতির দানে সমান সমৃদ্ধ ও সেই প্রকৃতির প্রভাব মানুষের উপর ক্রিয়াশীল —এমন চেতনার প্রসারণে পাঠক হিসাবে আমরা আলোড়িত হই। ভারতবর্ষের পরিচয় "গোরা" উপন্যাসে নিহিত, আর গোরার উত্তরণের কাহিনীতে বিধৃত হয়েছে আনন্দময়ীর সেই মহান উক্তি: "মানুষ বস্তুটি যে কত সত্য—আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে, ঝগড়া করে মরে, তা যে কত মিথ্যে—সে কথা ভগবান গোরাকে যেদিন দিয়েছেন সেই দিনই বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবা, ব্রাহ্ম-ই বা কে আর হিন্দু-ই বা কে। মানুষের হৃদয়ের তো কোনো জাত নেই—সেইখানেই ভগবান সকলকে মেলান এবং নিজে এসেও মেলেন। তাঁকে ঠেলে দিয়ে মন্তর আর মতের উপরেই মেলাবার ভার দিলে চলে কি?"

গোরার জন্মসংক্রান্ত বিষয়ে আপত্তি ওঠা অহেতুক নয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় "রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা" গ্রন্থে অতি সংগত ভাবে সে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে সুচরিতা ও গোরাকে সার্থকতা দেবার জন্য যে মুক্তির প্রয়োজন, সেই মুক্তির জন্য প্রয়োজন গোরার জন্মরহস্যের অবতারণা, "কিন্তু এ যেন একান্তই দৈবানুগ্রহ! দৈবানুগ্রহ ছাড়া গোরাকে শ্রেণীভ্রষ্ট করার অন্য উপায় কি কিছু ছিল না? গোরা-চরিত্রের সঙ্গে যেন এই দৈবানুগ্রহের কল্পনা সহজে করা যায় না। আর গোরা না হয় এই দৈবানুগ্রহ অবলম্বন করিয়া শ্রেণী ও সমাজ ভ্রষ্ট হইয়া নিজের মুক্তি পাইল, কিন্তু অন্য যাহাদের এই শ্রেণীবিচ্যুতির প্রয়োজন তাহারা এই দৈবানুগ্রহের সুযোগ পাইবে কোথায়।"

(ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭)। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মত আংশিক ভাবে সমর্থনযোগ্য নিশ্চয়ই । "গোরা" উপন্যাসে জন্মরহস্য ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, শুধুমাত্র ঘটনা হিসাবে নয়, বিষয়টি কৃষ্ণদয়াল ও গোরার সম্পর্ক জটিল করার ক্ষেত্রে, গোরার জন্য আনন্দময়ীর উদ্বেগ তীব্রতর করার জন্য এবং সর্বোপরি আনন্দময়ীর জীবনে সংস্কারের শেষ শিকড় উন্মূলীত করার কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয় । ঘটনাটি গোয়েন্দা গল্পের রহস্যরূপে রচিত নয়, উপন্যাসের প্রথমদিকে পাঠককে বিষয়টি জানানো হয় ব'লে লেখক জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে অযথা কৌতূহল সঞ্চার করেন না, অথচ জন্মবৃত্তান্তের সূত্রেই কৃষ্ণদয়াল গোরার জন্য ভাবিত হন । তাই তার প্রচেষ্টা গোরাকে ব্রাহ্মগৃহে পাঠাবার, তাই গোরার প্রায়শ্চিত্তে তিনি বিরোধীর ভূমিকায় সক্রিয় ও সরব। আবার কৃষ্ণদয়ালের প্রতিক্রিয়ার বিপরীত দিকে গোরাকে পাওয়ার জন্য আনন্দময়ীর আকুতি ও অবশেষে বিরাট জীবনের তাৎপর্য-লাভের চিত্রটি উপন্যাসের মহৎ ব্যঞ্জনা ও বক্তব্য রূপায়ণের অংশীদার। গোরাকে কুড়িয়ে না পেলে কি আনন্দময়ীর সমস্ত সংস্কার ভেসে যেতো ? আর আনন্দময়ী সংস্কারমুক্ত না হলে কি গোরা রূপান্তরিত হয়ে আনন্দময়ীর কাছে আশ্রয় নিতো ? উত্তর নিশ্চয়ই নঙর্থক, কারণ উপন্যাসে ঘটনাটি আরোপিত নয়, উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র ও বক্তব্যে পরিব্যাপ্ত। গোরার ধ্যান-ধারণা যে ছিন্নমূল জন্মসূত্রে তারই ইঙ্গিত প্রকাশে লেখক সচেতন। কারণ জন্মরহস্য উদ্ঘাটনে গোরার এত দিনের বিশ্বাসের মূলই উৎপাটিত হয়েছে, তার দাঁড়াবার জায়গা যেন নেই, গোরা ছিন্নমূল। আমাদের ধ্যান-ধারণাও কি গোরার অর্থে ছিন্নমূল নয় ? আমাদের মধ্যবিত্ত অস্তিত্বও ছিন্নমূল। "গোরা"-য় এসত্য আবিষ্কৃত ব'লেই

এক অর্থে গোরা আমাদের জীবনের রূপকও বটে। তাই গোরার জন্মরহস্য বিষয়টি দৈবানুগ্রহ নয়; উপন্যাসের নিয়মে কাহিনী চরিত্র ও বক্তব্যের সূক্ষ্ম রূপায়ণে অতি স্বাভাবিক।

গোরার উত্তরণের সঙ্গে বিনয়-ললিতা শ্রেণীবিচ্যুত না হয়েও সামাজিক বাধা-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে গোরার সহযাত্রী হয়েছে। অবশ্য গোরা যে-বোধে উপনীত, তেমন মহৎ বোধের স্পন্দন বিনয়-ললিতার অন্তরে সক্রিয় কিনা—এ বিষয়ে সঙ্গত ভাবেই সমালোচকেরা নীরব থাকতে বাধ্য, কারণ লেখক সে-চিত্র রূপায়ণের আগেই উপন্যাসের ইতি টেনেছেন। তবে এক হিন্দু যুবকের সঙ্গে ব্রাহ্মনারীর বিবাহ অনস্বীকার্য রূপে বিপ্লবী ঘটনা সামাজিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে। তাই বিনয় ও ললিতার বিবাহ শ্রেণীবিচ্যুতির উদাহরণ না হলেও আলোড়নের, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে পড়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে, এবং এ-বিবাহ এক হিসাবে উত্তরণের কাহিনী, যা দৈবানুগ্রহ-নির্ভর নয়।

ঘ. একটি অসমাপ্ত উপন্যাস ঃ

"বিচিত্রা" মাসিক পত্রে প্রকাশিত (দু কিস্তিমাত্র) "তিনপুরুষ" -এর নতুন নাম "যোগাযোগ"। উপন্যাসের আরম্ভ অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বৎসরের জন্মদিনে; কিন্তু এ-দিন একটা অজুহাত মাত্র, গল্পের আরম্ভ এখানে হলেও "আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে।" প্রকৃতপক্ষে ঘোষাল বংশের কাহিনী মধুসূদনের পিতা আনন্দ ঘোষাল থেকে শুরু। উপন্যাসের প্রথম দুই পরিচ্ছেদ ঘোষালদের বংশবিবরণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শুরু কন্যা পক্ষের কথা এবং নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে কুমুর পৈত্রিক ও পারিবারিক ইতিহাস। পিতামহ ও মাতামহের কাহিনী দিয়ে উপন্যাসের শুরু,

সেদিক থেকে অবিনাশ তৃতীয় পুরুষ, কিন্তু উপন্যাসের মূল কাহিনী দ্বিতীয় পুরুষ (অবিনাশের পিতা মধুসূদন ও মাতা কুমুদিনী) -কেন্দ্রিক, এবং মূল কাহিনীর সূত্রপাত মধুসূদন ও কুমুর বিবাহ কেন্দ্র ক'রে এবং আসল দ্বন্দ্বর সূচনা মধু ও কুমুর বিবাহের পর কুমুর মধুসূদন আবাসে আসার সময়। মধুসূদন ও কুমু দুই বিপরীত ধাতুতে গঠিত পুরুষ ও নারী, উভয়ের চারিত্র্যগঠন সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ ব'লে সংঘর্ষ অনিবার্য, তদুপরি উভয়ে আপন-মর্যাদা সম্পর্কে অতি সচেতন। মধুসূদন ও কুমুর বয়েসের ব্যবধান যথেষ্ট, দুই অসম-বয়েসীর দাম্পত্যজীবন তাই সুখের না হওয়াই স্বাভাবিক, এবং মধু ও কুমুর ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড সংঘর্ষের কাহিনী "যোগাযোগ"-এর মূল উপজীব্য। মধুসূদন ও কুমুর দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনে শ্যামার ভূমিকা অবশ্য নগণ্য নয়, বরং সংকট তীব্র করার ক্ষেত্রে শ্যামা উদ্দীপন বিভাববিশেষ। কুমু বিবাহিত হলেও পতিগত প্রাণ নয়, কারণ স্বামীর শিক্ষা-দীক্ষা রুচির সঙ্গে তার আশৈশব লালিত শিষ্টতার কোনও মিল নেই এবং স্বামীর কর্তৃত্ব করার বাসনা, নিষ্ঠুর লোলুপতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী কুমুর অসহ্য, তাই তার বিদ্রোহ। এ-বিদ্রোহ নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, সূক্ষ্ম মনোবিকলনে অতি নিপুণরূপে বিধৃত হয়েছে। মধুসূদনের আত্মসমর্পণ ও প্রত্যাখ্যানও সেই পটভূমিতে স্বাভাবিক ও মধুসূদনের চরিত্রের বিবর্তনে উত্থিত হয়েছে। কুমু আত্মসচেতন হলেও আত্মকেন্দ্রিক নয়, বরং তার চরিত্রে দাদার সহবৎ শিক্ষায় যে-স্থৈর্য ও সংযম ওতপ্রোত, সেই ধৈর্য ও সহনশীলতায় মধুসূদনের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে তার প্রাণান্ত প্রয়াস, অথচ সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়, বিশেষত শ্যামার ভূমিকা এ-ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। কুমু আর সব মেয়ের মতই নানা সংস্কারে আক্রান্ত, তাই স্বামীপ্রেমে নিষ্ঠ থাকা এ-

রকম চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু স্বামীর অমানুষিক হীনমন্যতা এই কর্তব্য সম্পাদনের প্রতিবন্ধক, ফলে কুমুর ব্যক্তি-স্বরূপ প্রকাশিত হয় নানা জটিলতায় এবং লেখক সেই ব্যক্তি-স্বরূপ প্রকাশে কুমুর সমস্ত অস্তিত্বকেই চিত্রিত করতে মনোযোগী হন, কারণ কুমুর জটিলতা তার সমগ্র অস্তিত্বে তার শিক্ষা-দীক্ষা রুচিতে। কিন্তু শ্যামার সে-বিড়ম্বনা বা দায় নেই। শ্যামার চাঞ্চল্য বা প্রাগলভ্য শুধু তার চরিত্রের বাইরের উপাদান-ই নয়, মধুসূদনকে আকৃষ্ট করার জন্য সে নির্লজ্জ ও সংকোচহীন এবং তার চাওয়া ও পাওয়া সোচ্চার বলেই শ্যামার আলেখ্য সরল ও একরৈখিক, সেজন্য কুমুর আত্মসমর্পণ ও শ্যামার আত্মসমর্পণের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মধুসূদনের কাছে দুজনেই অবশেষে আত্মসমর্পিতা, কিন্তু দুটি চরিত্রের আত্মসমর্পণের কাহিনী জটিলতার তর-তমে বর্ণিত হয় এবং এই বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব-ই পরিলক্ষিত। কুমু আপন শিক্ষা রুচির ফলে আত্মসচেতন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ, তাই নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নিজের সঙ্গে নিজের, স্বামীর সঙ্গে নিজের এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজের সাযুজ্যবিধানে তাকে দ্বন্দ্বে নামতে হয়েছে এবং মধুসূদনও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব'লে এই কাহিনী এত আবর্ত-সঙ্কুল হয়, অথচ দুঃখের বিষয়, কুমুর আত্মসমর্পণের বিষয়টি লেখকের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না, তাই কুমুর ব্যক্তিত্ব অবশেষে সাধারণ আত্মসমর্পণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কুমুর স্বামীগৃহ ত্যাগ তার অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয়, কিন্তু মাত্র পুত্রসম্ভাবনায় সেই নারীর স্বামীগৃহ প্রত্যাবর্তন কি একান্ত অনিবার্য ছিল? বস্তুত, এই দুর্বলতার উৎস কুমু ও মধুসূদনের বিবাহের পর প্রথম ঘটনাটি, এবং কুমুর সহসা জাগ্রত ব্যক্তি-মানস। বিবাহের পূর্বে কুমুর জগৎ ছিল "আবছায়া—সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী :

সেখানে বিশেষ দিনে চন্দ্র দেখতে নেই; শাঁখ বাজিয়ে গ্রহণের কুদৃষ্টিকে তাড়াতে হয়; * * *", সেই কুমু কি ক'রে স্বামীর উপর বিরক্ত হয় মাত্র একটি ঘটনার সূত্রে? "দাদার রুচি সে-সমস্তকেই বহু যত্নে আপনার করে নিয়েছে" সত্য, কিন্তু তার জীবনে কুসংস্কারের প্রভাব তার চেয়েও প্রবল, মধুসূদনের সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাবে কুমুর সম্মতি ও জেদ সেই কুসংস্কারে নিয়ন্ত্রিত, ফলে এমন চরিত্রের পক্ষে মাত্র দু-একটি ঘটনায় স্বামীবিদ্রোহী হওয়া আকস্মিক ও অতর্কিত বলে মনে হয়। কুমুর ব্যক্তিত্বজাগরণের ইতিহাস আরও ধীর লয়ে ঘটনা-চরিত্রের বহু ঘাত-প্রতিঘাতে অথবা নানা সূত্রে কুমুর রুচি আহত—এমন কিছু নিদর্শন থাকলে কুমুর ব্যক্তিত্ব এবং প্রাক-বিবাহ জীবনের সংস্কার কাটানোর চিত্র বাস্তব ও বিশ্বাস্য হয়ে উঠতো সন্দেহ নেই। কুমুর ব্যক্তিত্ব-উন্মেষের ব্যাপারটি আকস্মিক বলেই তার আত্মসমর্পণ-ও যুক্তি-বিবেচনা রহিত; কারণ কুমুর ব্যক্তিত্বের সমস্যা এমন সুলভ সমাধানের বিষয় নয়। সর্বোপরি, কুমু বা মধুসূদনের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য যে-পার্শ্ব চরিত্রগুলি নির্বাচিত, সে-চরিত্রগুলি বর্ণহীন ও লেখকের হাতের পুতুলমাত্র। নবীন, মোতির মা এবং বিশেষত বিপ্রদাসের চরিত্রায়ণ সজীবত্বের স্তরে কোনও সময় উত্তীর্ণ নয়, সকলকে কেমন কেতাবি মানুষ বলে মনে হয়, সেজন্য নির্জীব নিষ্প্রাণ চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মধু বা কুমুর ব্যক্তিত্ব নিষ্প্রভ এবং সেই সময় সমস্যার সঠিক রূপায়ণ বিষয়ে লেখকের দুর্বলতা ধরা পড়ে। ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য সজীব ব্যক্তিরই প্রয়োজন, একজন নিষ্প্রাণ হলে সেই চরিত্রের নিরুত্তাপ ও বর্ণহীন প্রভাব সজীব চরিত্রেও বর্তায়, এবং তখুনি সুলভ সমাধানের অন্বেষণ জরুরি হয়ে পড়ে লেখকের। "যোগাযোগ" উপন্যাসে পার্শ্ব-চরিত্রগুলির নিষ্প্রাণতাও উপন্যাসটির সাফল্যের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক নিশ্চয়ই।

অন্যদিকে, গ্রন্থটির তিনপুরুষ চিত্রণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ায় যত অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। কুমুর স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনে সেই তিনপুরুষের কাহিনী রচনার ইঙ্গিতই প্রচ্ছন্ন, এবং তিনপুরুষের কাহিনী উহ্য থাকে বলেই আবার এক্ষেত্রে কুমুর প্রত্যাবর্তন অস্বাভাবিক মনে হয়। মনোবিকলনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য অথবা ছোট ছোট ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দুই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ অতি নিপুণ রূপে অঙ্কিত হলেও উপন্যাসের সামগ্রিক পরিকল্পনার বিচারে "যোগাযোগ" খণ্ডিত ও অসমাপ্ত উপন্যাস রূপেই গণ্য।

ঙ. ঔপন্যাসিকের দ্বিধা :

"প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটা জিনিস, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।" (শরৎ-চন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃঃ ২০৭)।

উপরি উক্ত মন্তব্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-রচনার কৌশল বিধৃত। শরৎ-উপন্যাসে প্লট রচনা গৌণ, চরিত্রায়নই মুখ্য। সেজন্য আশা করা অন্যায় নয় যে ঘটনাস্রোত চরিত্রগুলির নিজস্ব গভীর উৎস থেকে উৎক্ষিপ্ত, এবং "চোখের বালি" উপন্যাসে ঘটনা যে-অর্থে শুধু ঘটনা নয়, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বসংঘাতসমুত্থিত আলোড়নবিশেষ—শরৎ-উপন্যাসে ঘটনা নিশ্চয়ই তেমন তাৎপর্যমণ্ডিত। তাই উপন্যাসের নবপর্যায়ে অনুসৃত পদ্ধতিঅবলম্বন করে শরৎচন্দ্রের

অন্তত তিনটি উপন্যাস ("গৃহদাহ", "চরিত্রহীন", "শেষপ্রশ্ন") আলোচনা করা বিধেয়।

"গৃহদাহ" উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অচলা; উপন্যাসের সমস্যা অচলার "দোলাচল চিত্তবৃত্তি" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে কেন্দ্র করেই উদ্ভূত। মহিমের প্রতি অচলার শ্রদ্ধা অগাধ, অথচ বিবাহের পর সেই শ্রদ্ধা প্রায় অ-প্রেমে রূপান্তরিত; অন্যদিকে যার প্রতি তার প্রেম শূন্য, পাকে চক্রে সেই সুরেশের সঙ্গে অচলার জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়। একদিকে মহিমের আশ্চর্য সংযম ও সহিষ্ণুতা, অপরদিকে সুরেশের অদম্য প্রায়-উন্মত্ত উচ্ছ্বাস-বহুল ভাবাবেগ—এই দুই বিপরীত চরিত্রের চাপে অচলার হৃদয় দলিতমথিত দ্বিধাবিভক্ত। নিঃসন্দেহে এমন চরিত্রচিত্রণের উপযুক্ত মাধ্যম উপন্যাসের নব-পদ্ধতি এবং এ-উপন্যাসে ঘটনা-বাহুল্য বর্জন ও বিপরীত ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষজাত ঘটনার জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক। "গৃহদাহ"-এ সেই সচেতনতার চিহ্ন বর্তমান, অন্তত এ-উপন্যাসে অনেক ঘটনা ঔপন্যাসিকের খেয়াল-খুশি সৃষ্ট বা আরোপিত নয়, চরিত্র-বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী চরিত্রের অন্তর থেকে উৎসৃষ্ট। অথচ এ-উপন্যাসে আকস্মিক ঘটনা ও ঘটনার ঘনঘটা সমান দুর্বার। এর কারণ, অবশ্য গৃহদাহ উপন্যাসে, শরৎচন্দ্রর প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগ নয়, এর কারণ চরিত্র-কল্পনা ও চরিত্র-উপস্থাপনা রীতির মধ্যে নিহিত; সর্বোপরি যদিও স্বীকার্য শরৎচন্দ্রের মুল দুর্বলতা বক্তব্যের অতি-সীমাবদ্ধতা এবং জীবন সম্পর্কে নাতি-গভীর দৃষ্টিভঙ্গী। সুরেশ চরিত্র আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে অঙ্কিত, সেজন্য তার পক্ষে যে কোন অঘটন ঘটানো অসম্ভব নয়। ব্রাহ্মদের প্রতি একান্ত অনীহা ও বিরূপতা ব্রাহ্মগৃহে একদিন আসার পরই অনুরাগে রূপান্তরিত হওয়া তাই সুরেশের

পক্ষে স্বাভাবিক। এমন কি অচলাকে না দেখা পর্যন্ত এই ভদ্রমহিলার প্রতি তার ক্রোধ ও ঘৃণা ইন্দ্রজালের প্রভাবে অবশেষে প্রেমে পরিণত হয়েছে। এমন আকস্মিক রূপান্তর ক্ষণমতিত্বের পরিচায়ক এবং লেখক সুরেশকে ভাবাবেগে আপ্লুত করলেও কোনও চরিত্রের রূপান্তরের কাহিনী রচনার সময় উপন্যাস-শিল্পের ন্যায় ও নিয়মের প্রতি সচেতন থাকা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র সে-সম্পর্কে বোধহয় যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না, তাই সুরেশের মত চরিত্র প্রবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি দ্বারা যতখানি পরিচালিত, ব্যক্তিত্বের দ্বারা তার এক কণাও নয়। তাই সুরেশের মত ছিঁচ-কাঁদুনে চরিত্র নায়িকার সহানুভূতি লাভ করলেও পাঠক হিসাবে আমাদের অতৃপ্তি অপরিসীম থাকে, কারণ আমরা অচলা ও সুরেশের ব্যক্তিত্ব-উত্থিত সমস্যা রূপায়ণের চিত্র দেখার জন্য বেশী আগ্রহী। কিন্তু উপন্যাসে সুরেশের মত চরিত্রের উপস্থিতি অন্য চরিত্রের বিকাশকে পঙ্গু করে, তাই অচলার মত চরিত্রেও সেই একই আবেগ ও উচ্ছ্বাসের অতিরেক পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য সুরেশের ক্ষমা চাওয়ার সময় আলাপের প্রথম দিনে অচলার পক্ষে সুরেশের হাত ধরা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) অবাস্তব ও অতিনাটকীয় মনে হয়, কারণ অচলার চরিত্র যে-প্রযত্নে অঙ্কিত, সেই অচলার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এ-ঘটনায় সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। সুরেশ অচলার জীবনে ঘূর্ণী ঝড়ের মত, সুরেশের মাত্রাতিরিক্ত ভাবালুতার জন্য সুরেশ ও অচলার সম্পর্ক কী ধরণের, সে-প্রশ্ন ওঠে আমাদের মনে, এবং লেখক এ-বিষয়ে আশ্চর্যরকম নীরব। সুরেশ ও অচলার সম্পর্ক এমনই রহস্যাবৃত যে পাঠক সে-সম্বন্ধের স্বরূপ আবিষ্কারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবেন। সুরেশের পক্ষে অচলার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক অচলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদে

সুরেশের অচলাকে তুমি বলার অনুরোধের উত্তরে অচলার উক্তি, "একদিন বলতেই হবে, সে ত আপনি জানেন" চিত্তচাঞ্চল্যেরই পরিচায়ক। তাই সুরেশের চোখে জল দেখে "মুহূর্তের করুণায় সে কোন দিন যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল।" অথচ মহিমের সঙ্গে সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই মহিমের প্রতি অচলার প্রেম উদ্বেল হয়, "তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্য রেখে গেলে? যে তোমার ওপর এত বড় কৃতঘ্নতা করতে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্ছো কি বলে?" অর্থাৎ অচলার দোলাচলতা সুরেশের মত কারণহীন। এই ভাবাবেগ মহিমের শান্ত সমাহিত চরিত্রেও কখনো কখনো সঞ্চারিত হয়। আংটীর ঘটনা নিয়ে প্রায় কৈফিয়ৎ তলব করা মহিমের পক্ষে অস্বাভাবিক, কারণ সে সুরেশের ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ। এই দুই বিপরীত চরিত্র অতি মসৃণরূপে অঙ্কিত বলেই উভয় চরিত্রের ভূমিকা অতিরঞ্জিত, এমনকি মধ্যবর্তিনী অচলার দোলাচলতা সূক্ষ্মতায় চিত্রিত নয়, তাই বিয়ের পর গ্রামের বাড়িতে অচলার উক্তির সঙ্গে, ("সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও— যাকে ভালোবাসিনে, তার ঘর কারবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না,") গৃহদাহের পর মহিমের জন্য অচলার উদ্বেগপ্রকাশ স্ববিরোধী, এ-দুটি ঘটনার মধ্যে যেখানে সময়ের ব্যবধান অতি স্বল্প। একবার মহিমের দিকে হেলা, অন্যবার সুরেশের দিকে—অচলার দোলাচলতা যান্ত্রিকরূপে অঙ্কিত, কারণ অচলার দ্বিধা তার ব্যক্তিত্ব-সঞ্জাত নয়, সেজন্য অচলার প্রায় মুহুর্মুহু মতিপরিবর্তন শরৎচন্দ্রের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে, তাই এ-চরিত্র প্রায় সব ক্ষেত্রে নাটক করতে অকুণ্ঠিত। সুরেশের প্রতি অচলার আকর্ষণ কোনস্তরের, অথবা সুরেশের প্রতি তার

প্রেম বর্তমান কিনা এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়া দুঃসাধ্য। অচলা মহিমের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠ, একথা অবশ্য সুরেশের উক্তিতে স্পষ্ট এবং সুরেশ অচলাকে বিপথে নামিয়েও মন পায় নি—এ-সিদ্ধান্তও সুরেশের এবং এ-উক্তির সত্যতা ডিহিরির ঘটনাবলীর মধ্যে দেখা যায়, যেখানে অচলা ও সুরেশের জীবন নিষ্প্রেমে পূর্ণ। কিন্তু রামবাবুর বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় অচলার সংলাপে যেকোনও পাঠক বিমূঢ় হতে বাধ্য এবং "এক সময় তোমাকে ভালবাসতুম" অচলার উক্তিতে অতীত-সম্পর্কের যবনিকা অপসারিত হলে প্রশ্ন জাগে, তবে কি অচলা একই সঙ্গে সুরেশ ও মহিমকে ভালোবেসেছিল? অথবা, মহিমের সঙ্গে সে শুধু অভিনয় করেছে, আসলে ভালোবেসেছে সুরেশকে? শরৎচন্দ্র সম্পর্কগুলি কুয়াশাবৃত রাখেন বলেই অচলার ব্যক্তিত্ব খর্বিত, অচলাকে ভাবাবেগ-পরিচালিত একটি চরিত্র বলা শ্রেয়, তার সমস্যা ব্যক্তিত্বের গভীর উৎস থেকে উৎসারিত নয়। ফলে উপন্যাসের কাঠামোয় শৈথিল্য আসা স্বাভাবিক। যেজন্য ঔপন্যাসিকের পক্ষে আকস্মিক ঘটনা পরিহার করা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। যখন যে চরিত্রের লেখকের প্রয়োজন, সেই চরিত্রের তৎক্ষণাৎ উপস্থিতি লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করলেও শিল্প-ন্যায় লঙ্ঘনের সেগুলি নিদর্শন : নবম পরিচ্ছেদে সুরেশ-অচলার গাড়ী থেকে নামার সময় মহিমের আবির্ভাব, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে খবরের কাগজে ফয়জাবাদের সংবাদ অবগত হয়ে টেলিগ্রাফের কাগজ আনতে যাওয়ার মুহূর্তে ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গ্রামের বাড়িতে মহিম ও অচলার বিবাদের সময় সুরেশের আগমন, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে গৃহদাহের ঘটনা, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে রাক্ষুসীর সঙ্গে পরিচয়, অচলার ডিহিরি আসা ও রাক্ষুসীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ, মহিমের শিক্ষকরূপে ডিহিরি

আসা এবং গ্রন্থের সমাপ্তিতে স্টেশনে মহিমের সঙ্গে মৃণাল ও কেদারবাবুর সাক্ষাৎ ইত্যাদি অতর্কিত ঘটনার ব্যবহার ঔপন্যাসিকের দুর্বলতারই পরিচায়ক। বাস্তবে এরূপ আকস্মিক যোগাযোগ সম্ভব হলেও বাস্তবকে শিল্পসম্মত করার জন্য শিল্পের নিজস্ব নিয়মের প্রয়োজন। অবশ্য এর জন্য চরিত্র-চিত্রণ পদ্ধতি দায়ী। প্রাথমিক প্রবৃত্তি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক আদর্শবাদ চরিত্রের নিয়ামক হলে লেখক অচেতনেই হয়ত নিজের একান্ত অনিচ্ছায় ঘটনার স্রোতে গা ভাসাতে বাধ্য হন, সেজন্য "গৃহদাহ" -এর মত উপন্যাসে স্থূল ঘটনার সাক্ষাৎ সুলভ, এবং সেই সূত্রে অতি-নাটকীয় দৃশ্যাবলী উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। সুরেশের নাটুকেপনায় অবশ্য এই অতি-নাটকীয়তার সূত্রপাত, এবং অচলা ও মহিমের ক্ষেত্রেও সময় সময় অদ্ভুত আচরণের সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়। ফলে চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ অপেক্ষা আবেগপ্রবণ জীব হিসাবেই উজ্জ্বল হয়েছে। তাই অচলার আচরণ আমাদের প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়, অন্তত সুরেশকে হাওয়া-বদলের সময় সঙ্গীরূপে পাওয়ার আকুলতায় পাঠকমাত্রই দিশেহারা হতে বাধ্য, কারণ কিসের আবেগ ও প্রেরণায় অচলার এই চাওয়া সে-সম্পর্কে লেখক পরিচ্ছন্নভাবে নীরব, সেজন্য সমালোচক অচলার মানসিক জগতের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হন। বস্তুত, শরৎচন্দ্র তাঁর অতি প্রিয় কৌশলে সহানুভূতি জাগানোর পক্ষপাতী ছিলেন, যেজন্য আকস্মিক পীড়া ও অসুস্থ ব্যক্তির অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ তাঁর পক্ষে অপরিহার্য ছিল। "গৃহদাহ" উপন্যাসে গৃহদাহের পর মহিমের প্রতি পুনরায় অনুরাগ উজ্জ্বল হওয়া অথবা ডিহিরিতে সুরেশকে মৃতকল্পে মার্জনা করার সময় উভয়েই অসুস্থ এবং অগাধ সেবাপ্রার্থী। লেখক নায়িকার

জীবনের সংকটমোচনে এই সব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপারের একান্ত অধীন। কিন্তু সংকটের প্রকৃতি-ই যেখানে লেখকের নিকট অস্পষ্ট, সেখানে গভীরতর কিছু আশা করা অন্যায়, সেজন্য লেখককে কোন কোন সময় মনস্তত্ত্বের জটিল পদ্ধতি পরিহার করে সরল ঘটনার আশ্রয় নিতে হয়। এক্ষেত্রে কেদারবাবু ও মৃণাল সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলি উল্লেখযোগ্য। মৃণালের সংস্পর্শে কেদারবাবুর নব-জীবন লাভ কি উপন্যাসের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায়? নাকি ব্রাহ্মদের উপর লেখকের ক্রোধপ্রকাশের ও হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যখ্যাপনের সহজ কৌশলমাত্র? মৃণালের প্রতি লেখকের অজস্র সহানুভূতি থাকার ফলেই ডিহিরী আসা তার পক্ষে অনিবার্য এবং পাঠকমনে মহিমের চিত্র উজ্জ্বল রাখার জন্য মৃণালের শেষ উক্তি ("পাবে বৈ কি সেজদা। কিন্তু আমার সকল শিক্ষা ত তোমারি কাছে। আশ্রমই বল আর আশ্রয়ই বল, সে যে তার কোথায়, এখবর সেজদিকে আমি দিতে পারব, কিন্তু সে ত তোমারই দেওয়া হবে।") তাই লেখকের অবলম্বন হয়।

উপন্যাসটির মূল দুর্বলতা (বক্তব্যের অগভীরতার কথা বাদ দিলে) চরিত্র-চিত্রণে নিহিত। প্রতিটি চরিত্র একরঙা, সেই রঙ-ও আবার চড়া : সুরেশ (উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ, সেন্টিমেন্টাল, পরোপকারী), মহিম (শান্ত, সংযত ও প্রস্তরতুল্য গম্ভীর), মৃণাল (সনাতন হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য, সেবাপরায়ণ, অশিক্ষিত হয়েও মহৎ আদর্শের প্রতীক), কেদারবাবু (প্রথমে লোভী, অর্থপিশাচ —পরে প্রায় মহামানব); এমন কি অচলার দোলাচলতা মোটা ও চড়া রঙে অঙ্কিত, সেজন্য তার হৃদয় বিদীর্ণ ও দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার কাহিনী যান্ত্রিক। "চোখের বালি" কোনও মহৎ উপন্যাস নয়, কিন্তু "চোখের বালি"-র বহু ত্রুটি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সমস্যার গভীরে

প্রবেশে সচেষ্ট ছিলেন, এবং আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেই ব্যক্তিত্বের উৎস সন্ধানে যত্নবান ছিলেন, সেজন্য সামান্যতম সাংসারিক আলোড়ন তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল না এবং চরিত্রগুলি বহুবর্ণে অঙ্কিত বলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সজীব ও উজ্জ্বল, অথচ "গৃহদাহ" বক্তব্যের অগভীরতায় ও প্রকরণের অসম প্রয়োগে নিতান্ত গৌণ উপন্যাস রূপেই বিবেচিত হয়।

"হাঁ, আর একটা কথা। সেই সাবিত্রীকে আর নিতান্ত মেসের ঝি রাখি নি। প্রথম থেকেই মানুষ তাকে যেন অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে সে উপায় করেছি। বড় মন্দ হয় নি প্রমথ! আর ক্রমশঃ প্রকাশ্য নভেল ও-রকম না হলে গ্রাহক জোটে না। লোকে নিন্দে হয়ত করবে—কিন্তু পড়বার জন্যও উৎসুক হয়ে থাকবে।" (শ্রীগোপাললাল রায় সঙ্কলিত : শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ৫৭)। পত্রাংশের দুটি বিষয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ; প্রথমটি "সাবিত্রীকে আর মেসের ঝি রাখি নি," দ্বিতীয়টি পাঠক "পড়বার জন্যও উৎসুক হয়ে থাকবে।" দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথমে আলোচ্য, কারণ পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে রাখার জন্য অন্তত একটি কথা স্পষ্ট যে লেখক কাহিনী এবং ঘটনার বিবরণদানে মোটেই কুণ্ঠিত ছিলেন না। একের পর এক ঘটনা বা কাহিনী সংযোজনায় পাঠকের কৌতূহল জিইয়ে রাখা সম্ভব। আশা করা অন্যায় নয় যে, ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের কৌতূহল-উদ্রেকের কৌশল "চরিত্রহীন" উপন্যাসে পাওয়া যাবে অনায়াসে। লেখকের অন্য পত্রাংশ উক্ত মতের সমর্থক : "চরিত্রহীন গল্প হিসাবে—তা সে প্রায় কিছুই নয়। অ্যানালিসিস —Psychological—এই ইচ্ছা নিয়েই লিখি। সেটা পুড়ে যায় তারপরে দুটো মিশিয়ে একরকম করে লিখেছি।" (ঐ, পৃঃ ১১)

অর্থাৎ "চরিত্রহীন" উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসের প্রত্ন ও নবপর্যায়ে অনুসৃত উভয় পদ্ধতি বিদ্যমান। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে লেখক চরিত্রের ন্যায় ও চরিত্র বিবর্তনের নিয়ম অনুসরণের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন—একথা স্বীকার্য।

"সাবিত্রীকে আর মেসের ঝি রাখি নি," অথচ গ্রন্থের সূচনায় মেসের ঝি রূপেই সাবিত্রীর আবির্ভাব, এবং সতীশ ও সাবিত্রীর প্রণয়-উপাখ্যান উপন্যাসের মূল কাহিনী। সতীশ উপন্যাসের নায়ক, তার কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতেই উপন্যাসের নাম "চরিত্রহীন", অথচ এই চরিত্রহীনের সমস্ত কার্যাবলী যে-ভিত্তির উপর রচিত, সেই ভিত্তিটি দৃঢ় নয়, সময় সময় অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব মনে হয়। সতীশ সাবিত্রীর প্রতি আকৃষ্ট কেন—এর যুক্তিসম্মত উত্তর মেলা দুষ্কর। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে সচরাচর যে-সম্পর্ক থাকা উচিত মধ্যবিত্ত সমাজে, সেই ব্যবহারের মাত্রা অনুসরণ না করলে বিড়ম্বনা সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশী, বিশেষত যেখানে বাঙালী মধ্যবিত্ত চরিত্র লেখকের অবলম্বন। সতীশ ও সাবিত্রীর ক্ষেত্রে সে-মাত্রা লজ্ঘিত হয়েছে, যেজন্য কলকাতার মেসে সতীশ-সাবিত্রীর প্রণয়-বিকাশের ইতিহাস প্রায় প্রতিবন্ধকহীন, মেসের অন্যান্য আবাসিক সতীশ-সাবিত্রীর মধুর সম্পর্কের ব্যাপারে নীরব থাকে, অথচ এ-কথা তাদের অজানা নয়; তাই সমস্ত মেসের লোকের এ-সম্বন্ধে নীরবতা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিরই নামান্তর; যা বাস্তবে অকল্পনীয়, যদিও রাখালবাবুর কথায় ঈর্ষার ভাব স্পষ্ট, কিন্তু এ-ঈর্ষার প্রকাশ মধুর-সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার পর। সাবিত্রী মেসের ঝি হলেও বেহারীর উক্তিমতে সে শাপভ্রষ্টা দেবীবিশেষ। কিন্তু সাবিত্রীর এ-দেবীত্ব সতীশের কাছে অনেকপরে প্রকটিত হয়েছে। সেজন্য সতীশের কাছে সাবিত্রীর প্রথম ও প্রধান পরিচয় মেসের ঝি রূপেই।

সমাজবিগর্হিত প্রেম বলেই কি এ-গল্প শরৎচন্দ্রের নিকট মূল্যবান? লেখকের কাছে মূল্যবান হলেও উপন্যাসের চরিত্রের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব কিনা তা বিচার্যও বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্র সে-বিচার করেন নি বলেই মনে হয়। সাবিত্রীর যে-ইতিহাস নানাভাবে বিবৃত হয়েছে, সে-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেও তার আচার-ব্যবহার বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না, বরং সাবিত্রীর আচার-ব্যবহার ওই মহিলার পক্ষে অস্বাভাবিক তো বটেই, এমন কি যে-কোনও সুস্থ ব্যক্তির কাছে অকল্পনীয়। সতীশের উপর তার অধিকারবোধ এত দৃঢ় কেন—সে-উত্তর মেলা ভার। তেমনি দুষ্কর সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর অযথা দুর্ব্যবহারের তাৎপর্য সন্ধান। সতীশের জন্য তার পরম দুশ্চিন্তা ও অসাধারণ আত্মসংযম কিসের জন্য—এ প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর উপন্যাসে নেই। অর্থাৎ সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি কোনও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং লেখক সতীশ-সাবিত্রীর যে অতি-স্বাভাবিক সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে ন্যায় দরকার তা আমলে আনেন না ব'লে চরিত্র দু'টি অবাস্তব হয়ে পড়ে। উপেন্দ্রর ভূমিকাও অতিশয়িত, অতিরঞ্জিত। উপন্যাসের নায়ক সতীশ, কিন্তু উপেন্দ্র উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং সতীশ-সাবিত্রীর মূল কাহিনীর সঙ্গে কিরণময়ী-কেন্দ্রিক দ্বিতীয় কাহিনীর সংযোগী পুরুষ। উপেন্দ্র অনেকটা পরমপুরুষজাতীয় চরিত্র, যার প্রতি উপন্যাসের সমস্ত চরিত্র সশ্রদ্ধ, অথচ উপেন্দ্র সম্পর্কে সকলের এই শ্রদ্ধার হেতু কি—সে-প্রশ্নের উত্তরে সমালোচক নীরব থাকতে বাধ্য। সতীশ, দিবাকর, সুরবালা তার আত্মীয়বন্ধু ও পরিজন, সেজন্য এদের শ্রদ্ধা ব্যাখ্যাযোগ্য, কিন্তু সাবিত্রী বা কিরণময়ী উপেন্দ্রর প্রতি কেন শ্রদ্ধাশীল—তার একটা আবছা কারণ অনেক কষ্টে আবিষ্কারসাধ্য হলেও সে-কারণ অত্যন্ত

সুদূরের, তাই কোন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের পক্ষে সেই কারণ আদৌ উপযুক্ত কিনা তা সংশয়ের বিষয়। অথচ এ-চরিত্রটি মহৎ এবং উদার নয়, অন্তত সাবিত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় আচরণে অথবা দিবাকর-কিরণময়ীর ঘনিষ্ঠতার কথা অঘোরময়ীর কাছে জানার পর কিরণময়ীর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার ও সংলাপে তা স্পষ্ট। তবু সাবিত্রী বা কিরণময়ীর কাছে উপেন্দ্র কোনসময় অশ্রদ্ধেয় নয়। অবশ্য পরবর্তী সময়ে উপেন্দ্র ক্ষমাশীল ও উদার মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, সাবিত্রীর ভাষায় "দাদা এখন সমাজের অতীত, ইহ-লোকের অতীত, তাই তার মুখে যা সত্য অন্যের মুখে অন্যের প্রয়োজনে তা সত্য নয়।" উপেন্দ্রর এই মহামানবে রূপান্তরের হেতু সুরবালার মৃত্যু, "এ দুর্বলতা এতদিন সেই পাষাণতলেই চাপা ছিল—শুধু সুরবালা যখন তাঁহার অর্ধেক শক্তি হরণ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সুযোগ পাইয়া প্রচণ্ড উৎসের মত তাঁহার পাষাণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।" সুরবালার মৃত্যুর পর উপেন্দ্রর এ-পরিবর্তনের হেতু কী? স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক—শুধু কি এই যুক্তির উপর ভিত্তি ক'রে উপেন্দ্রর আমূল পরিবর্তন ব্যাখ্যাযোগ্য? অবশ্য লেখক সাবিত্রী সম্পর্কে উপেন্দ্রর মনোভাব পরিবর্তনে মোক্ষদা, ভুবন প্রভৃতির যে-সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তা অতি যান্ত্রিকরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেজন্য সাবিত্রী সম্পর্কে ঘৃণা থেকে স্নেহে উত্তরণের আবেগ চিত্রণে লেখক চারিত্র্যবিকাশের নিয়মের উপর নির্ভর না ক'রে কাহিনীর উপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। তাই মোক্ষদার সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হওয়া ও ঘটনার জট মোচনে বহির্ঘটনার আধিপত্যই স্বীকৃত। অন্যপক্ষে কিরণময়ী সম্পর্কে উপেন্দ্রর মনোভাব মিশ্রধরণের, যদিচ কিরণময়ীর গুরুস্থানীয়

ব্যক্তি উপেন্দ্র। কিন্তু কিরণময়ীর মত সংবেদনশীল বুদ্ধিমতী কিসের আশায় বা কি জন্যে উপেন্দ্রর প্রতি আকৃষ্ট—প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকে, যেহেতু কিরণময়ীর একনিষ্ঠ প্রেমের একমাত্র যুক্তি ভাবালুতা ও দুর্নিবার ভাবাবেগ। উপন্যাসের প্রারম্ভে কিরণময়ীর যে-চিত্র উপস্থাপিত (অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে কিরণময়ীর প্রেমের সঙ্গে অর্থনীতির প্রশ্নটি জড়িত, হয়ত আর্থিক নির্ভরতার জন্য কিরণময়ীর প্রেম-অভিনয়ের প্রয়োজন) সে-চিত্রে—কিরণময়ীর বাস্তববুদ্ধির প্রাখর্য প্রকাশিত, এবং উপেন্দ্রর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক নিশ্চিন্ততার ফলেই অনঙ্গর সঙ্গে তার সকল অভিনয় ও সম্পর্কের অবসান হয়, এমন কি হারাণ-উপেন্দ্রর সম্পত্তি লেখালেখির ব্যাপারে কিরণময়ীর বক্তব্যে বিষয়ী মনের পরিচয়ই প্রকাশিত। একমাত্র সতীশের কথায় সচেতন হয়ে উপেন্দ্র সম্পর্কে কিরণের শ্রদ্ধা জন্মানো তাই যথেষ্ট বিশ্বাস্য ও বাস্তব নয়। উপেন্দ্রর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তি সেজন্য অনেকটা অহেতুক মনে হয়, ঠিক তেমনি ধোঁয়াটে ও রহস্যময় উপেন্দ্রর প্রতি কিরণের প্রেমনিষ্ঠা; অথচ এই নিষ্ঠার মধ্যে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাগ্রহণের ইচ্ছা সমান প্রবল, উপেন্দ্রর রূঢ় আচরণের পর দিবাকরের সঙ্গে গৃহত্যাগ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু কিরণময়ীর এ-আচরণের মধ্যে রিরংসা কি প্রকট নয়? দিবাকর সম্পর্কে তার রিরংসা বৃত্তি-ই প্রকাশিত, কারণ বিবাহিত জীবনে তার যৌন জীবন প্রায় সম্পূর্ণ অবদমিত ছিল এবং দিবাকরের প্রতি কিরণময়ীর দেহাতীত প্রেমেরও কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপেন্দ্রর নিষ্ঠুর ব্যবহার ইন্ধন জুগিয়েছে, কিন্তু উপেন্দ্রর প্রতি কিরণময়ীর শ্রদ্ধা বা প্রেম কোন্ স্তরের, লেখক সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব বলেই দিবাকরের সঙ্গে আরাকান পালানোর ঘটনাটি

কিরণের লালসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থের একটি উদাহরণ বলে মনে হয়, এবং চরিত্রের এ-রকম আচরণ স্নায়ুবিকারগ্রস্ত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কিরণময়ী স্নায়ুরোগগ্রস্ত হলে উপন্যাসশেষে তার উন্মাদ হওয়ার কারণ ও ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী স্নায়ুরোগগ্রস্ত নয়, সে সুস্থ ও স্বাভাবিক। স্বামীর কাছে তার শিক্ষা বিদ্যাকাণ্ডের প্রায় সকল বিষয়ে, এমন কি রামায়ণের পুঁথি পাঠ করা তার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ছিল, তাই উপেন্দ্রর প্রতি ভালোবাসায় কিরণের মহৎত্যাগের দৃষ্টান্ত উদ্ভাসিত, অথচ এ-ত্যাগ কেন? প্রশ্নের উত্তর সন্ধান পণ্ডশ্রম, কারণ উপেন্দ্রর প্রতি তার আকর্ষণ ব্যক্তিত্বসঞ্জাত নয়, সতীশের কথা ও সুরবালার কাছে হার স্বীকার কিরণের পরিবর্তিত জীবনের জন্য মূলতঃ দায়ী। সুরবালার কাহিনী কিরণময়ীর হৃদয়ে স্বামী প্রেম ও অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগ প্রকাশের জন্য রচিত, এখন বিপরীত চিত্র উপস্থাপনা ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের অনুসৃত রীতির অধিক নিকটবর্তী। অবশ্য এজন্য কিরণময়ীর চরিত্রায়ন-পদ্ধতিও দায়ী, কারণ চরিত্রটি উপন্যাসের ন্যায় ও যুক্তি অনুসারী রচিত হয় নি, এমন স্ববিরোধী চরিত্র বাস্তবেও দুর্লভ। এ-সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য: "কিরণময়ীর চরিত্রটি আগাগোড়া পর্যালোচনা করিলে উহার স্বাভাবিকতা ও সংগতি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়া উঠে। উহার ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা বিপরীতমুখী বিন্দুগুলির একই জীবনে সামঞ্জস্য করা যায় কিনা, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দুরূহ। তাহার ক্রুদ্ধ ও ইতর সংশয় ও গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, তাহার অনঙ্গ ডাক্তারের সহিত প্রেমাভিনয় ও অক্লান্তস্বামীসেবা, উপেন্দ্রর প্রতি গভীর একনিষ্ঠ প্রেম ও দিবাকরের সহিত পলায়ন, তাহার বেদ-বেদান্তের আলোচনা ও অসংলগ্ন প্রলাপ—এ সমস্তের

মধ্যে বিচ্ছেদ ও অসংগতি এতই গভীর যে, একই জীবন্তবৃন্তে এতগুলি বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস পীড়িত হইতে থাকে।" (বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ২২৪)।

সমাজ-বিগর্হিত নিষিদ্ধ প্রেমের সমস্যা "চরিত্রহীন"-এর মূল উপজীব্য, এবং "শেষটা আমি-ই জানি—আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না, গোড়া থেকে উদ্দেশ্য করে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়া যায় না।" অপিচ, লেখকের উদ্দেশ্য কখনই সামাজিক নিয়ম ও অনুশাসন লঙ্ঘনের বিদ্রোহে পর্যবসিত হয় নি। সাবিত্রী বাল-বিধবা, অতএব তার পুনর্বিবাহ অসম্ভব সনাতনী সামাজিক নিয়মে, আর হিন্দু বিধবার আত্মসংযম কিংবদন্তীতুল্য আমাদের কাছে। সেজন্য সতীশের প্রতি সাবিত্রীর প্রেম চূড়ান্ত নিষ্ঠার পরিচয় বহন করলেও উভয়ের পরিণয় শরৎ-চন্দ্রের নিকট অকল্পনীয়, কারণ পরিণয়ে সাবিত্রীর দৈহিক সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য, এবং আমরা অনেকেই সেই শিশুসুলভ ধারণায় আক্রান্ত যে সতীত্ব কেবল দেহের সীমায় আবদ্ধ, মন অন্যত্র নিবদ্ধ থাকলেও আসলে দৈহিক শুচিতাই আমাদের একমাত্র কাম্য। সাবিত্রীর দৈহিক শুচিতা রক্ষার সাক্ষ্য মোক্ষদা, ভুবন, বেহারী প্রভৃতির উক্তিতে প্রকাশিত হলেও সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের উদ্‌বাহ-বন্ধন অসম্ভব, তাই সরোজিনীকে লেখকের প্রয়োজন। প্রথম দর্শনে সতীশের প্রেমে পড়া সরোজিনীর পক্ষে হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু সেই প্রেমের ঘনিষ্ঠতা সম্পাদনের জন্য সাঁওতাল পরগণার গ্রামে সতীশের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ আকস্মিক তো বটেই, এমন কি লেখকের সহজ সুযোগ গ্রহণের একটি উজ্জ্বল নিদর্শনও। এ-রকম আকস্মিকতার আর একটি উদাহরণ সতীশের অসুস্থতার সংবাদে উপেন্দ্রর সঙ্গে সরোজিনীর সতীশের কাছে যাওয়ার

প্রস্তাব। প্রস্তাবটি না হয় সরোজিনীর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু জ্যোতিষ কিংবা তার মা-র এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া কোনক্রমেই বিশ্বাস্য ঘটনা নয়, যেহেতু তখনও সতীশ উভয়ের নিকট লম্পট রূপে চিহ্নিত। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নারীর সেবাবৃত্তি জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই শরৎচন্দ্র উপন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে নিজের বিশ্বাসের জোরে পাত্র-পাত্রীদের যত্রতত্র পাঠাতে দ্বিধা করতেন না। বস্তুত, সতীশ-সরোজিনীর প্রেমকাহিনী উপন্যাসে আরোপিত উপাখ্যান, কারণ সতীশ শেষপর্যন্ত সাবিত্রীর প্রতি অনুরক্ত। সাবিত্রীও। অবশ্য সাবিত্রী ততক্ষণে উপেন্দ্রর সান্নিধ্যে তুরীয় মার্গের অধিবাসী, আবার সরোজিনীর একনিষ্ঠ প্রেমও তুচ্ছ নয়, অতএব সতীশ-সরোজিনীর প্রজাপতিনির্বন্ধ জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফল।

বস্তুত, "চরিত্রহীন" খুব সুন্দর জমকালো গল্প, সেজন্য উপেন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকের জীবনের নানা সমস্যার সমাধান ক'রে একটি বিরাট কমেডির নায়ক হয়ে ওঠেন, অথচ উপন্যাসটির মূল আলেখ্য সতীশের চরিত্রহানতা। সেই আলেখ্য রচনা করতে গেলে উপন্যাসের পরিণতি ট্র্যাজিক হতে বাধ্য, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতে "গল্প পারতপক্ষে ট্র্যাজেডি করতে নেই।" (শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ৪২)। তাই সুখী পরিণতির জন্য চরিত্র-বিকাশের ন্যায় লঙ্ঘিত, এবং উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী লেখকের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের একাধিক পত্রের মন্তব্য অনুসারে "অতি আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত" তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "শেষ প্রশ্ন"। কিন্তু লেখকের ইচ্ছা ও শিল্প রূপায়ণের মধ্যে শত প্রযত্ন সত্ত্বেও ব্যবধান থাকে, তাই সমালোচকের কাছে লেখকের ইচ্ছার চেয়ে সৃষ্ট শিল্পরূপটি অধিক মনোযোগের বিষয়, যেহেতু রূপায়িত শিল্পেই শিল্পীর পরিচয় নিহিত। তাঁর মনোজগৎ বা ইচ্ছানিচ্ছা সেই শিল্প-

সত্তার অর্গল উন্মোচনে কোন কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সহায়ক হলেও সে-জানা সমালোচকের একমাত্র মূলধন হলে বিপত্তির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক, উভয় উভয়ের দৌরাত্ম্য সহ্য করা এবং না-করার ক্ষেত্রে সমান সহিষ্ণু এবং অসহিষ্ণু। সে জন্য রচিত শিল্পকর্ম থেকে যাত্রা শুরু করা বিধেয়, অন্তত সেই পদ্ধতির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে লেখকের ইচ্ছার বিষয়টি সমালোচকের করায়ত্ত হয়।

"শেষ প্রশ্ন"-এর নায়িকা কমল, কমলকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনীর আদি অন্ত্য। উপন্যাসের আরম্ভ কমল ও শিবনাথের শৈব বিবাহের পর, এবং আদিপর্বের সমাপ্তি শিবনাথ ও কমলের বিচ্ছেদে। মধ্য পর্বের শুরু কমলের সঙ্গে অজিতের ঘনিষ্ঠতায় এবং মনোরমা-শিবনাথের নতুন সম্পর্কের সূচনায়। অথচ উপন্যাসের শুরুতে অজিত মনোরমার প্রেমিক রূপে চিত্রিত এবং শিবনাথের প্রতি মনোরমার বিরূপতা সকলের সুবিদিত। অসুস্থ শিবনাথের বুকের উপর মনোরমার ঘুমনো—এ-পর্বের চরম মুহূর্ত। অন্ত্য পর্বের ঘটনা—শিবনাথের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ এবং অজিত-কমলের মিলন। অবশ্য অজিত-কমলের মিলনের পথ নিষ্কণ্টক নয়, অজিতের বিরূপতা ও আকর্ষণের কাহিনী নানা মন্তব্য, আচরণ, ঘটনায় পল্লবিত করা হয়েছে। এই আদি-অন্ত্য কাহিনীতে আশুবাবু, নীলিমা, অক্ষয়, অবিনাশ, হরেন্দ্র, রাজেন, সতীশ প্রভৃতির আগমন-নির্গমন মঞ্চে পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ-প্রস্থানের মত নাটকীয়। মূল গল্পের সঙ্গে এদের সংযোগ সন্ধান একান্ত অপরিহার্য কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। একমাত্র কমলের মননশীলতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া উপন্যাসে এই সব চরিত্রের অবদান শূন্য। হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য-আশ্রম সংক্রান্ত ঘটনা নির্বাচিত হয়েছে যেন কমলের সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার জন্যই। তাই

কমলের সমালোচনায় হরেন্দ্রর চৈতন্যোদয় ও আশ্রম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মাত্র হাস্যকর-ই নয়, বালকোচিত-ও। অথচ আশ্রম নিয়ে আলোচনায় তর্ক-বিতর্কে উপন্যাসের বহু পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে, কিন্তু এ ব্যয় অমিত ব্যয়ের সামিল. কারণ আশ্রম-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা উপন্যাসের কাহিনী অথবা চরিত্রবিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল না। এই আলাপ-আলোচনা উহ্য থাকলে উপন্যাসের শ্রীহানির কোনও সম্ভাবনা নেই, বরং এ-উপাখ্যান অনুক্ত থাকলে কমলের বাক্‌সর্বস্বতার মাত্রা হ্রাস পেতো। আশ্রম-উপাখ্যানের মতই নিরর্থক নীলিমার কাহিনী। মূল কাহিনীর সঙ্গে নীলিমার যোগ থাকলেও শিবনাথ-মনোরমা অথবা কমল-অজিত কোনও কাহিনীতে তার ভূমিকা সক্রিয় নয়। কমলের প্রতি আকর্ষণের ভিত্তি নীলিমার চরিত্রের গভীরে প্রোথিত নয়। অবিনাশবাবুকে দ্বিতীয় বার বিয়ে দিয়ে নীলিমার জীবন করুণ করা, অথবা আশুবাবুর প্রতি নীলিমার আকর্ষণ ঘটিয়ে আশুবাবুকে মহৎ প্রতিপন্ন করা ব্যতীত নীলিমার কোন সার্থকতা নেই, তাই এ-কাহিনী মূল কাহিনীর সম্পর্ক-রহিত একটি স্বতন্ত্র কাহিনী, যা অন্য উপন্যাস রচনার যথেষ্ট উপকরণ নিশ্চয়ই। কমলের প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ রূপে নীলিমা ও আশুবাবুর চরিত্র অঙ্কিত, অথচ এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ কেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, এক-মাত্র ভাবালুতা আশুবাবু ও নীলিমাকে কমলের প্রতি আকৃষ্ট করার হেতু হিসাবে পর্যাপ্ত নয় ; সেজন্য কমল চরিত্রও অনেক সময় ভাবালু-তায় আক্রান্ত। অপরের সাহায্য গ্রহণে কমল অনিচ্ছুক, কিন্তু সেই দৃঢ়চেতা কমল দারিদ্র্যের দায়ে আশুবাবুর সাহায্যপ্রার্থী, আবার আশুবাবুর প্রতি আচরণের মধ্যে কমলের স্ববিরোধী মনোভাব স্পষ্ট। কমলের কাকাবাবু ডাকায় আপত্তি ও সম্মতি এবং আশুবাবু কমলের

হাতধরাধরি প্রভৃতি ছোটোখাটো আচরণের মধ্যে বিদ্রোহী কমলের ছবি সহসা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে রাজেনের ভূমিকা যেন উদাহরণ দেওয়ার জন্যই রচিত হয়েছে। রাজেন বিপ্লবী, তার আত্মোৎসর্গ সাধারণস্তরের নয়, কিন্তু লোকটির আচার-আচরণ চিত্রণে শরৎচন্দ্রের প্রিয় কৌশলই অনুসৃত হয়। রাজেনের চরিত্র আগাগোড়া ভাবপ্রবণ। রাজেনের কাছে কমলের নতি-স্বীকার ঔপন্যাসিকের অভিপ্রেত হলেও কমলের মত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতীর এহেন আচরণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যেমন অক্ষয়ের পরিবর্তনে আমরা বিমূঢ় হতে বাধ্য। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের পরিবর্তন কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হলেও নায়িকা কমল আরম্ভ ও শেষে সেই একই কমল। বহু ঘটনার টানা-পোড়েনে সে অপরিবর্তিত। এমন অনড় অচল চরিত্র সৃষ্টির হেতু কি তা সমালোচকের কাছে স্পষ্ট নয়। অন্তত একটি ক্ষেত্রে কমলের আদর্শ পরীক্ষিত ব'লে অনেকের ধারণা, কিন্তু শিবনাথ যে অসৎ ও নীচ—তা কমলের জানা, তাই শিবনাথকে পরিত্যাগ করতে সে নির্দ্বন্দ্ব, বরং ভারমুক্ত হওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সেজন্য কমলের কথায় ও কর্মে আত্মীয়তা অর্জনের ব্যাপারটি অপরীক্ষিত থাকে এবং এমন চরিত্রের পক্ষে কথায় ও কর্মে আত্মীয়তা অর্জন একান্ত আবশ্যক। "শেষ প্রশ্ন-" এর নায়িকা শেষ পর্যন্ত কথার ফানুষে পরিণত হয়েছে। অজিতের সঙ্গে কমলের বিবাহ অবশ্য এর ব্যতিক্রমরূপে গণ্য, যেহেতু তথাকথিত প্রচলিত পদ্ধতিতে বিবাহ না হয়েও অজিত ও কমল নিজেদের কাছে স্বামী-স্ত্রী রূপেই পরিচিত কিন্তু অজিতের অক্ষমতা ও আশঙ্কার উত্তরে কমলের উক্তি "তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো অতো নিষ্ঠুর আমি নই। ***

ভগবান তো মানি নে, নইলে প্রার্থনা করতাম তুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়াল রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি", ভাবালুতার নিদর্শন। এই উক্তির মধ্যে বিদ্রোহী মতাদর্শের সামান্যতম স্পর্শও নেই। শরৎচন্দ্র কমলকে আগাগোড়া অপরিবর্তিত রাখেন বলেই চরিত্রটি লেখকের কয়েকটি চমৎকার কথা ও মতবাদের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ায়, এবং এখানেই গোরার সঙ্গে কমলের মেরুপ্রায় ব্যবধান। গোরার চরিত্র অনড় অচল নয়, সে ক্রমে ক্রমে বিকশিত বিবর্তিত, "গোরার প্রতি মুহূর্তই গোরার কাছে জিজ্ঞাসার নব নব চিহ্ন—সে জিজ্ঞাসা তার নিজেরই কাছে।" (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃঃ ১১১)। এমন কোনও জিজ্ঞাসা কমলের নেই, সে সমস্ত জিজ্ঞাসার অতীত, তাই সে রমণীও নয়, পুরুষও নয়, ব্যক্তিত্বও নয়, মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় "কতকগুলি বাক্যস্ফুলিঙ্গের আতসবাজি"। (সাহিত্যবিতান, পৃঃ ২৪০)। তাই তার আচার-আচরণ সমস্ত ব্যাখ্যার উর্ধ্বে, লেখকের প্রয়োজন অতএব যে-কোন অঘটন ঘটানো তার পক্ষে অসম্ভব নয়। আর গোড়ায় গলদের জন্য ঘটনার পর ঘটনা, চরিত্রের পর চরিত্র এবং কাহিনীর পর কাহিনী সাজানো অনিবার্য হয়ে ওঠে, সেজন্য "অতি আধুনিক উপন্যাস"-এ অনুসৃত পদ্ধতি প্রায়শই নব-পদ্ধতি পরিহার ক'রে ঘটনা-প্রধান উপন্যাসে অবলম্বিত পদ্ধতির অনুকারী হয়।

আলোচিত তিনটি উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের দ্বিধার ভাবই প্রকাশিত। চরিত্র তাঁর কাছে সর্বৈব হলে তিনি আরও সংযমী, মননশীল ও ধৈর্যধর হতেন; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ থাকার পর এ-গুলি একজন সিরিয়স ঔপন্যাসিকের কাছে আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র পাঠকদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে

নিজের শিল্পীসত্তাকে অনেক জায়গায় বিসর্জন দিয়েছেন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

চ. পশ্চাদপসরণের চিহ্ন :

রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে "নৌকাডুবি" পশ্চাদপসরণের একটি সুন্দর উদাহরণ, এমন উদাহরণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রায় দ্বিতীয়রহিত। "নৌকাডুবি" রবীন্দ্র-প্রতিভার ভরাডুবিরই সামিল, যেহেতু এ-উপন্যাসের বক্তব্য প্রতিভানুযায়ী তীব্র তীক্ষ্ণ বা গভীর নয়, "স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞান-জনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্‌কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।" (সূচনা, নৌকাডুবি)। "চোখের বালি" রচিত হওয়ার পর এমন জিজ্ঞাসার জন্য উপন্যাসরচনা নিঃসন্দেহে কিছুমাত্র গর্বের নয় সাইকলজির অজস্র দোহাই সত্ত্বেও। প্রথম উপন্যাসের পক্ষে বিষয়টি হয়ত ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু "নৌকাডুবি" রচনার সময় রবীন্দ্র-প্রতিভা আরোহণমুখী, সেজন্য বক্তব্যের অপ্রগাঢ়তা ক্ষমাযোগ্য নয়। আর বক্তব্যের এ-দশা বলেই "নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল—অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কিন্তু ঔৎসুক্যজনক।" (ঐ)। মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতির মধ্যে ঔৎসুক্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ "চোখের বালি"-তে অনুসৃত প্রণালী থেকে বিচ্যুত হয়ে আলোচ্য উপন্যাসে ঘটনার জাল বিস্তারে বিশেষ উৎসাহী হয়েছেন। ফলে উপন্যাসের প্রকরণে রবীন্দ্রনাথ "নৌকাডুবি"-তে নব-পর্যায়ের যাত্রী হয়েও প্রত্ন-পর্যায়ের কাছাকাছি গিয়েছেন।

"নৌকাডুবি" উপন্যাসে রবীন্দ্র-উক্তি, "একালের গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ", প্রায় প্রতি ছত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে চরিত্রনিরপেক্ষ ঘটনা উপস্থাপিত করা কলাকৌশল বা পদ্ধতিগত অগ্রস্মৃতির পরিচয় নয়।

সমগ্র উপন্যাসের ভিত্তি একটি দৈবদুর্বিপাকের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং দৈবদুর্বিপাক সর্বদাই জাগতিক কার্য-কারণের উর্ধ্বে, ফলে কারণহীন সংঘটন শিল্পনিয়মের অধীন কিনা তা সংশয়ের বিষয়, বরং এরকম ঘটনা বিশেষত উপন্যাসে সাদর অভ্যর্থনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, কারণ একটি দৈব সংযোগ অজস্র কারণহীন অতর্কিকতার ভবিষ্যৎ লীলা ক্ষেত্র হয়ে ওঠে "নৌকাডুবি" -তে তেমন ঘটনা ও সেই ঘটনা সমর্থনে লেখকের কৈফিয়ৎ দেবার অশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বিবাহের তিনমাস পরে রমেশের ভুলভাঙা কি স্বাভাবিক? প্রথমদিনে কমলাকে সুশীলা ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কমলার প্রশ্নে ("আচ্ছা, তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন?") রমেশের ভ্রান্তিনিরসন সম্ভব ছিল, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য অন্য, তাঁর উদ্দেশ্য সূচনায় উক্ত বক্তব্যের রূপায়ণ। ভ্রান্তি নিরসনের পর "ইহাকে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনরূপেই রমেশ নিজের কাছে রাখিতে পারে না, অন্যত্রও কোথাও ইহাকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করাও চলে না।"— রমেশের এ মনোভাব তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরপর রমেশের দ্বন্দ্বমথিত আলেখ্যচিত্রণ লেখকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল। রমেশ চরিত্র যদিও আবার জটিলতর হেমনলিনীর প্রতি আকর্ষণের ঘটনায়, কিন্তু এ-ঘটনাকে লেখক সঠিক ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছেন। কমলাকে

হোস্টেলে রেখে রমেশ সমস্ত ঘটনা (এমনকি তার বিয়ের ব্যাপারও) গোপন ক'রে হেমের সঙ্গে প্রেম করতে কুণ্ঠাহীন, যা অন্তত বর্ণিত রমেশ চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, এবং এরকম প্রবঞ্চনাময় আলেখ্য রচনাও লেখকের অনভিপ্রেত ছিল নিশ্চয়ই। অন্যপক্ষে কমলার সঙ্গে, দুর্ঘটনায় হলেও, সে যে-সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই সম্বন্ধ নিমেষে নস্যাৎ করাও রমেশের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ঔপন্যাসিক ঘটনাবর্ত সৃষ্টির প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন, সেজন্য রমেশ এমন অব্যবস্থিতচিত্তের মানুষরূপে চিত্রিত হয়েছে। তাই তার পক্ষে নানা অঘটনের নায়ক হওয়া বিচিত্র নয়। এমন চরিত্রের খাম-খেয়াল ও ভুলভ্রান্তির সুযোগে কাহিনীকে কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলা অত্যন্ত সহজ, সেজন্য অক্ষয়কে দেখে রমেশের স্টিমার-বদলের ঘটনাটি লেখকের কাছে স্বাভাবিক হয়, আবার কমলার পূর্বজীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের বর্ণনার সাহায্যে কমলার পরনির্ভরতা ও কমলা চরিত্রে নির্জীবতার প্রলেপ দিয়ে লেখক সুযোগগ্রহণেই তৎপর হয়েছেন, তাই কমলা কি বাসর ঘরে একবারও স্বামীকে দেখে নি অথবা স্বামীর সম্বন্ধে কি কিছুই শোনেনি প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তরসন্ধানের চেষ্টা এ ক্ষেত্রে পণ্ডশ্রম, যদিও লেখক এ-সম্পর্কে সজাগ ছিলেন, অনেকদিন পর শৈলজার জিজ্ঞাসায় কমলার উত্তর প্রায় লেখকের কৈফিয়ৎ রূপেই বিবৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিক এরকম কৈফিয়ৎ দিলেও আখ্যান বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না সবসময়। আর এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারের জন্য ঘটনার বাহুল্য "নৌকাডুবি"-তে অনায়াসদৃষ্ট। রমেশের ঘটনা জানার পর অক্ষয়ের পিছু-নেওয়া, হেমনলিনীর গৃহে নলিনাক্ষর আবির্ভাব, কমলার মনে দাম্পত্যপ্রেমের তীক্ষ্নতা সঞ্চারের জন্য শৈলজা-চরিত্রের অবতারণা, কাশীতে

নবীনকালীর কাছে কমলার আশ্রয়লাভ, মোগলসরাই স্টেশনে উমেশের সঙ্গে কমলার সাক্ষাৎ ও পুনরায় কাশী আসা ঘটনাগুলি কার্য-কারণের দৃঢ় নিয়মের উপর স্থাপিত নয়। এই ঘটনাগুলি আকস্মিক ঘটনার সুযোগ নেয়ার দৃষ্টান্ত বলেও মনে হয়।

এছাড়া, নলিনাক্ষর মতো চরিত্র কি ভাবে নিজের বিয়ের কথা মা-র কাছে ন-দশমাস গোপন রাখে তা প্রশ্নাতীত নয়। অন্তত এই গোপনতা নলিনাক্ষ চরিত্রের পক্ষে অস্বাভাবিক, তার হঠাৎ-বিবাহতে অনেকটা রূপকথার আমেজই পাওয়া যায়। আসলে লেখক চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন না, সেজন্য কমলা-নলিনাক্ষর মিলনের মধ্যে দৈবের ইঙ্গিতই স্পষ্ট। কমলা রমেশের পত্নী নয়, অথচ এ-ঘটনা না-জানা পর্যন্ত কমলা রমেশের প্রেমাসক্ত, এবং রমেশ তার কাছে স্বামীরূপেই মাননীয়। কিন্তু ভুল ভাঙার পর কমলার মনে রমেশের প্রতি বিন্দুমাত্র স্নেহের চিহ্ন না থাকার ব্যাপারটি বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ লেখক এমন অবিশ্বাস্য ঘটনার বর্ণনায় সম্পূর্ণ কুণ্ঠাহীন। বক্তব্য প্রমাণই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে এমন কিছু আশা করাই স্বাভাবিক। "নৌকাডুবি" উপন্যাসে মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি অবশ্যই অনুসৃত, তবু এ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ও উপযুক্ত রূপে ব্যবহৃত নয়, তার কারণ ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত যে ঘটনায়, সে-ঘটনা রোমান্স-রাজ্যেরই ঘটনা। ফলে রোমান্স-রাজ্যের যাবতীয় লক্ষণ উপন্যাসে বিদ্যমান। ঘটনাজাল দুর্মোচ্য, অথচ চরিত্রগুলি এক রঙা, তাই "নৌকাডুবি" উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসের প্রত্ন ও নবপর্যায়ের মিশ্রিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, অথচ এই মিশ্রণ সঠিক হয়ে ওঠে নি ব'লে উপন্যাসটি রবীন্দ্র-প্রতিভার অবরোহী দৃষ্টান্ত হিসাবেই গণ্য। কমলা যেমন দৈব বিপর্যয়ে

রমেশের সঙ্গে "দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি-বন্ধনে" আবদ্ধ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রত্নদীপ" উপন্যাসের বউরাণী প্রায় সম-পর্যায়ের আকস্মিকতায় ছদ্মবেশী রাখালের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ।. রমেশের ভূমিকায় বিশেষ ছলনার স্পর্শ নেই, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে উভয়ের আপাতসম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু রাখাল ভবেন্দ্রর মৃত্যুর পর ভবেন্দ্রর মুখাকৃতির সঙ্গে আপন মুখাকৃতির আশ্চর্যসাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে ভবেন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়। কমলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বে রমেশের জীবনে একটি প্রেমময় অধ্যায় ছিল, রাখালের অতীত জীবনে তেমন প্রেমের অস্তিত্ব না থাকলেও সে বিবাহিত এবং তার স্ত্রী জীবিত। কিন্তু রাখালের জীবনে দুঃসময় উপস্থিত হয় তার স্ত্রীর অন্তর্ধান ও চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার ঘটনায়। এই দুঃসময়েই রাখালের আবির্ভাব ভবেন্দ্ররূপে। অন্যদিকে খগেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি অভিনেত্রী কনকের সাহায্যে বউরাণীর সম্পত্তি আত্মসাতে উদ্যোগী হয়, সেজন্য রাখাল-বৃত্তান্তের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে তার তৎপরতা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু প্রভাতকুমার সুরবালার কাহিনী এনে উপন্যাসটি জটিল করার পক্ষপাতী ছিলেন, সেজন্য "রত্নদীপ"-এ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব-উৎসারণের ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ, ঘটনার প্রবল চাপে তাই চরিত্রগুলি ঘটনার পুতুলে পরিণত হয়েছে। রমেশের আসল পরিচয় জানার পর বউরাণীর বিরূপতার সঙ্গে রাখালের পরিচয় জানার পর বউরাণীর বিরূপতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; প্রথম ক্ষেত্রে বিকর্ষণ যেমন সহজ সরল উপায়ে স্পন্দিত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিকর্ষণ তেমনি মানসিক প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত নয়—হিন্দুনারীর সংস্কার এ-ক্ষেত্রে পূর্বের মত আকর্ষণ থেকে বিকর্ষণ জাগানোর নিয়ামক হয়েছে। "রত্নদীপ"

উপন্যাসে রাখালের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার, তার যন্ত্রণাদীর্ণ মনের পরিচয় যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত না হলেও রাখালের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় অনুক্ত নয়, বরং সচেতনায় উদ্দীপ্ত বলেই সে শেষ পর্যন্ত প্রবঞ্চক হয়ে ওঠে না। কিন্তু প্রভাতকুমার রাখালের চিত্র মুখ্য করেন না ব'লে তাঁর আশ্রয় হয় শেষপর্যন্ত অজস্র ঘটনা ও ঘটনাবর্ত। সেজন্য "রত্নদীপ"-এ প্রচুর আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ না থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসটি ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কৌতূহল জাগানো, ও সেই কৌতূহলের জন্য সংশ্লিষ্ট চরিত্র-নিরপেক্ষ ঘটনার সংযোজন "রত্নদীপ"-এ সুলভ। অবশ্য এজন্য লেখকের বক্তব্য কম দায়ী নয়, কারণ সে-বক্তব্য পুরণো পাপ-পুণ্যের সমস্যা। যে মননশীলতা ও পর্যবেক্ষণে এ-বক্তব্যের নব-রূপায়ণ সম্ভব, স্বীকারে দ্বিধা নেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সে-গুণ নেই।

শরৎচন্দ্রের উক্তি অনুসারে ["রূপের বর্ণনা, স্বভাবের বর্ণনা বইয়ের মধ্যে প্রায় নেই। ও আমি দু-এক কথায় সেরে দিই, বেশী নজর দিই না। আসল বস্তু, তার সত্তা বা মন যাই বলুন—সেটা মানুষের ভিতরটা। সেইটা উপলব্ধি করার জন্য চাই—প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা।" (চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘে প্রদত্ত শরৎচন্দ্রের ভাষণ)]। তাঁর উপন্যাস নবপদ্ধতিতে রচিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু "মানুষের ভিতরটা" ভাবালুতাবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখেন বলে শরৎ-উপন্যাসে সংশ্লিষ্ট চরিত্র-নিরপেক্ষ ঘটনা এবং ঘটনার জন্য ঘটনাসৃষ্টির সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়। এমনকি "গৃহদাহ" ও "শেষপ্রশ্ন"-এর প্রকরণে শরৎচন্দ্রের প্রবল দ্বিধাই পরিলক্ষিত হয়, অথচ এ-দুটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু আধুনিক উপন্যাসের উপযুক্ত বিষয়। এই দ্বিধা অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা ও অগভীর বক্তব্যের স্বতঃপ্রকাশ, তবু এর সঙ্গে বোধহয় "পড়িয়া যদি না

আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি?" (শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ৯১) অথবা "গল্পশেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয় 'আহা বেশ!' তবে আবার গল্প কি? আমি এই লাইনে চলছি।" (ঐ, পৃঃ ৪৩) প্রভৃতি উক্তিগুলির পিছনে লেখকের পাঠকের মুখ চেয়ে লেখার প্রশ্নটি জড়িত থাকে। লেখক ও পাঠকের সম্পর্ক জটিল। সৎ লেখকের দায়িত্ব তাঁর আন্তরিক বক্তব্যের রূপায়ণ, সে-রূপায়ণের নিষ্ঠা ও সততায় পাঠকের দাবি মেটানো হয়ত কঠিন নয়, এবং সেইসময় একই সঙ্গে শ্যাম ও কুলরক্ষার সমস্যা সমাধিত হয় অনেকসময়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কাছে বক্তব্য রূপায়ণ ও পাঠকের হৃদয় জয় করার সমস্যা গোলে হরিবোল পর্যায়ের: "আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না।" (ঐ পৃঃ ১৯৩) উক্তিটি শরৎচন্দ্রের সচেতনতার পরিচয়, এবং তিনি যে নিছক গল্পরচনার গল্পকার নন—এ সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়া প্রায় অসম্ভব, কিন্তু এই সচেতন শিল্পীর লক্ষ্য পাঠকের ভালোলাগার দিকে সমান নিবদ্ধ, "তোমাদের হরিদাসবাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে 'রামের সুমতির নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছে করে।' এই সমালোচনাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আলোচনা।" (ঐ, পৃঃ ৪৩)। অর্থাৎ পাঠকের চেতনার সম্প্রসারণ, বোধকে তীক্ষ্ণ তীব্র করা নয়, পাঠকের মনোরঞ্জনই লেখকের উদ্দেশ্য, সেজন্য শরৎচন্দ্র অতি সিরিয়স সাহিত্যিক হয়েও জনপ্রিয় হওয়ার বাসনায় পথভ্রষ্ট হন, যদিচ তাঁর অনন্ত ভাবালুতা, সনাতন সমাজ সম্বন্ধে অপার মমত্ব ও সমাজসংস্কারে প্রবল আপত্তি অথচ আপাতদৃষ্টিতে নিদারুণ বিপ্লবী মনোভাব তাঁর জনপ্রিয়তার নিদারুণ সহায়ক হয়েছে। তাই শরৎচন্দ্র

বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক সতর্ক ও সাবধানী ছিলেন, যেহেতু জনপ্রিয়তা হারানো তাঁর কাছে অভাব্য ছিল। সেজন্য শরৎ-উপন্যাসে প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদাহরণ প্রায় শূন্য। বাঁধাপথে বাঁধা ধরণের উপন্যাসে এজন্যে বক্তব্যের প্রসার ও ব্যাপ্তি অলক্ষিত, শরৎচন্দ্র এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন, "সাহিত্য-সাধনায় বিষয়বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সংকীর্ণ, স্বল্প পরিসর বদ্ধ।" (৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ)।

পল্লীসমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন "পল্লীসমাজ," "পণ্ডিতমশাই," "অরক্ষণীয়া," "বামুনের মেয়ে" প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্তু। অন্যান্য উপন্যাসেও পল্লীসমাজের চিত্র লিপিবদ্ধ, কিন্তু গ্রাম্য সমাজের দীনতা-হীনতা, সংকীর্ণতা, দলাদলি, হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা—এক কথায় পল্লীসমাজের প্রকৃত রূপ উপরি-উক্ত উপন্যাসগুলিতে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রিত, অন্যান্য উপন্যাসে তেমন বিবরণ অনুপস্থিত। আর শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজসম্পর্কে নিদারুণ বাস্তব অভিজ্ঞতার "মিথ্" প্রধানত এ-চারটি উপন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিঃসন্দেহে "পল্লীসমাজ" এ-শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। এ-উপন্যাসে বাইরের শক্তিই প্রধান। পল্লীসমাজের, বিশেষ ক'রে হিন্দুসমাজের নীচতা ও ক্রূরতার নিষ্পেষণে রমা ও রমেশের মত "এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারীর জীবন বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল।" (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)। রমা ও রমেশের বিশেষণ "এত বড় দুটি মহাপ্রাণ" বিশেষরূপে লক্ষণীয়, যেহেতু এরাই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। এরা সাধারণ নয়, কিন্তু উপন্যাসে কি উভয়ের মহাপ্রাণতা পরিলক্ষিত হয়? রমেশের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় অবশ্য তার অকাতর দান ও গ্রামোন্নয়নের উৎকণ্ঠায়

পাওয়া যায়, কিন্তু রমার তেমন পরিচয় উপন্যাস তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেও মেলা দুষ্কর। রমেশ গ্রামের ছেলে, যদিও সে গ্রামছাড়া বহুদিন সেই মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। উপন্যাসে রমেশের আবির্ভাব পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে, এরপর রমেশের গ্রাম্যসমাজের নীচতা-হীনতায় অভিভূত হওয়ার চিত্রই "পল্লীসমাজ"-এর মূল উপজীব্য। কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, রমেশের মত গ্রামের ছেলের পক্ষে গ্রাম্য সমাজের নীচতা-হীনতার সামান্যতম সংবাদ না-জানা সম্ভব কিনা? রমেশ যদি অতি-শৈশবে গ্রামছাড়া হতো, তবে তার পক্ষে এসব না-জানা সম্ভব। রমেশ কখন গ্রাম ছেড়েছিল—এ বিষয়ে লেখক সম্পূর্ণ নীরব। তবে মনে হয় রমেশ তখন কিঞ্চিৎ বয়স্ক, কারণ বহুদিন পরে জ্যাঠাইমাকে দেখে "মা মারা গেলে যতদিন না সে মামার বাড়ী গিয়াছিল, ততদিন এই জ্যাঠাইমা তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন নাই," এসব কথা স্মরণে আসার মধ্যে অন্তত তাই প্রমাণিত। অবশ্য সে-বয়সে অনেক কিছু না-জানা সম্ভব।

রমেশ পল্লীসমাজের নীচতা-হীনতায় ক্লিষ্ট এবং এই গ্লানির সূত্রপাত হয় গ্রামে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে। গ্রামের বহুলোকের মধ্যে স্বার্থপরতা, লোলুপতা, ও হৃদয়হীনতা বিদ্যমান—সেই সব কুটিল চিত্র রমেশের গোচরে আনার জন্য ঘটনার প্রয়োজন। এবং লেখক সে-সুযোগ হারাতে রাজি ছিলেন না। এত ঘটনা কেন? নানা রকম হীনতা দেখানোর জন্যই কী? অথচ ঘটনার প্রতুলতা অনুযায়ী রমেশের হৃদয় দীর্ণ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়ার সেই বিবরণ বা কর্মাবলীর পরিচয় কোথায়? রমেশের আচার-আচরণ দেখে মনে হয় সে-যেন একজন দর্শক, আর এক একটা

ঘটনা যেন নাটকের এক একটা দৃশ্য, সেজন্য রমেশের গ্রামে থাকার সিদ্ধান্তের জন্য বিশ্বেশ্বরীর বক্তৃতা এত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ লেখক রমেশের সঙ্গে সমাজের মৌল বিরোধের চিত্র অনুক্ত রেখে কয়েকটি স্থূল ঘটনার সাহায্যে পল্লীসমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সন্তুষ্ট থেকেছেন, তাই এ-সব ঘটনায় রমেশের ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণার আলেখ্য অবিশ্লেষিত। কোনও স্থূল ঘটনায় যেকোন সুস্থ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই স্থূলতার জন্য সকলে দায়ী—এই বোধ জাগার পর সেই দীনতা-হীনতা সংস্কারের কাজে নিমগ্ন হওয়ার চিত্রে ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণাদীর্ণ আলেখ্য উহ্য থাকা ঔপন্যাসিকের দক্ষতার পরিচয় নয়। ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বমথিত আলেখ্য অঙ্কনে লেখক উৎসাহী ছিলেন না ব'লে "পল্লীসমাজ"-এ তাই প্রত্ন-পদ্ধতি অনুসরণের চিহ্ন অতি স্পষ্ট। এর কারণ অবশ্যই শরৎচন্দ্রের চরিত্র-উপস্থাপনার ত্রুটি। কাহিনীর জটিলতার অনুপাতে চরিত্রগুলি সরল বলেই এই বিড়ম্বনা। "পল্লীসমাজ"-এর কাহিনী বিস্তৃত ও জটিল, অথচ নায়ক যেমন একরঙা চরিত্র, প্রতিনায়ক এবং অন্যান্য চরিত্রগুলিও তেমন একরঙা। বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী জঘন্য, দুর্বৃত্ত শ্রেণীর চরিত্র। এ-শ্রেণীর ভূমিকা নানা কুকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু বেণী ঘোষাল কিংবা গোবিন্দ কেন একাধিক কুকর্মে লিপ্ত—তার সদুত্তর পাওয়া কঠিন, এমনকি অবস্থা পরিবর্তনের পরও এদের অনড়তা আমাদের কাছে বিস্ময়ের। কয়েকটি কুকর্মের না হয় হদিস মেলে, কিন্তু শেষপর্যন্ত রমার নামে কুৎসা রটানোর পশ্চাতে কোনও উদ্দেশ্য বর্তমান কি? তবে কি গল্প জমানোর জন্যই এইসব চরিত্রের প্রয়োজন? ঘটনায় জটিলতা সৃষ্টি করা ও সেই জটিলতার সাহায্যে পাঠকদের কৌতূহল জিইয়ে রাখার জন্য ঔপন্যাসিকের এমন চরিত্রের

প্রয়োজন ছিল। এ-কৌশল ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের অতি উপযুক্ত, নবপর্যায়ের উপন্যাসে দুর্বৃত্ত চরিত্র অন্তত সুযোগ গ্রহণের জন্য কদাচ সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে রমা ও রমেশের সম্পর্ক কুযাশাচ্ছন্ন। রমা ও রমেশ উভয়ের সম্পর্ক মধুর, অথচ রমার আচরণে অনুরাগের প্রকাশ কোথায়? সমগ্র উপন্যাস পাঠে মনে হয় সে-ই রমেশের প্রধান শত্রু। যতীনের সঙ্গে সংলাপে, ভৈরবের বাড়ীতে রমার উক্তির মধ্যে "তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মারা যাই," এবং আরও দু-একটি জায়গায় রমেশের প্রতি রমার কোমলতার চিহ্ন স্পষ্ট, কিন্তু তাছাড়া সর্বত্রই সে রমেশের বিরুদ্ধতায় তৎপর। অবশ্য জেলে পাঠানোর পর রমা রমেশের বিনাপরাধে কারাবরণের জন্য অশেষ অনুতপ্ত হয়। রমা-রমেশের সম্পর্ক রহস্যাবৃত ব'লে কি এদের সম্পর্ক "জটিল ও দুরধিগম্য"? জটিল ও দুরধিগম্য বলেই কি তারকেশ্বরের ঘটনা কেবল ফানুসের মত স্বল্পায়ু? নাকি এটি আর একটি ঘটনার সংখ্যাবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত? এই ঘটনা কি রমা ও রমেশের জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা? সমালোচক এ-প্রশ্নের নঙর্থক জবাব দিতে বাধ্য, অবশ্য এমন অপ্রয়োজনীয় ঘটনা বর্তমান উপন্যাসে অতি সুলভ। তবে রমার মহাপ্রাণতা বোধহয় তার সম্পত্তিত্যাগ, রমেশের কাছে যতীনকে অর্পণ ও শেষে বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে কাশীযাত্রায় প্রমাণিত হয়। তবু রমার চরিত্রে শেষদিকে কিঞ্চিৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, যে-দ্বন্দ্ব রমেশের চরিত্রে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কারণ রমেশের উদারহৃদয়তা লেখকের কাছে এমনই উজ্জ্বল ছিল যে, তারজন্যে কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, যেমন প্রয়োজন নেই বিশ্বেশ্বরীর চরিত্রে উদারতার স্বরূপ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেবার। এই

আতিশয্যের দরুণ উপন্যাসশেষে রমেশ প্রায় অবতারে পরিণত হয়েছে। সরকারী আদালতের বিচার উপেক্ষা ক'রে ন্যায়বিচারের জন্য কৈলাস নাপিত ও সেখ মতিলালের সাক্ষীসাবুদসহ হাজির হওয়া পাঠকের কাছে আশ্চর্য হলেও ঔপন্যাসিকের কাছে স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক রমেশের আদর্শে, রমেশের অনুপস্থিতিতে উদ্বুদ্ধ পল্লীগ্রামের জীবনে নতুন প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার। এরকম ঘটনা বাস্তবে ঘটে কিনা বলা কঠিন, তবে "সত্য আর সাহিত্য আলাদা। সত্য সাহিত্যের বনেদ, কিন্তু সেইটাই সব নয়। সাহিত্য একটা শিল্প—যেমন করে সাজালে মানুষের মনে সেটা একটা দাগ ফেলতে পারে যা অনেকদিন থাকে। সত্যের দিক দিয়ে গেলে, আর যাই হউক, ভাল সাহিত্য হয় না।" (শরৎচন্দ্রের লাহোর অভিভাষণ)। বলতে দ্বিধা নেই, "পল্লীসমাজ" উপরি-উক্ত মন্তব্যের বিচারে সফল উপন্যাস নয়।

আসলে, শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের স্বরূপ যথার্থ অনুধাবন করতে পারেন নি। গ্রামে দলাদলি, হানাহানি, মারামারি, নীচতা, দীনতা সবই বর্তমান, অতএব সবই সত্য, কিন্তু এগুলি বাহ্য সত্য। কোনও সমাজের স্বরূপ উদঘাটনে বাহ্য সত্য একমাত্র অবলম্বন হলে সেই বিবরণে আংশিকতা-দোষ বর্তায় নিশ্চয়ই, কারণ আপাত সত্যে সমস্যার সামগ্রিক রূপ বিধৃত নয়, সামগ্রিক সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন স্থৈর্য ও প্রখর মনন। "পল্লীসমাজ" উপন্যাস এই আপাত সত্যের ভিত্তির উপর রচিত হয়েছে। পল্লীসমাজের নীচতা-হীনতার উৎস সন্ধানে রমেশ তৎপর, কিন্তু তার অন্বেষণ অসফল ও অসার্থক, এবং জ্যাঠাইমার সান্ত্বনা বা বক্তৃতাতেও গ্রাম্য সমাজের আসল ও সমগ্র স্বরূপ অনুদ্ঘাটিত থাকে। এই ব্যর্থতার কারণ লেখকের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব,

তাই সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে লেখক এক চিঠিতে জানান, "যেমন, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে আর যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া—বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া তবে। এইটা বড় দরকারী জিনিস। এই ধরণের দু'টা চারটা কথা।" (মুরলী বসুকে লেখা চিঠি)। বলাবাহুল্য পল্লীসমাজের ব্যাধির প্রতিকার এমন সরল চিকিৎসায় সম্ভব নয়, কারণ ব্যক্তিবিশেষের বা পল্লীবিশেষের শুভ-ইচ্ছার উপর এ-সমস্যার মীমাংসা নির্ভর করে না, এ-ব্যাধির মূল অতি গভীরে, যার সঙ্গে যুক্ত সমগ্র সমাজ। সেজন্য গ্রামের সমস্যা কোনও বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়, নানা সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোত সমগ্র সমাজেরই সমস্যা। শরৎচন্দ্র সমস্যার আংশিক রূপকে স্বরূপ ব'লে মনে করেন বলেই যত অনাসৃষ্টি, এর ফলে তাঁর বক্তব্য ও বিষয়বস্তু আংশিক ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সিদ্ধান্ত করা কঠিন নয় যে, এমন সীমিত ও আংশিক বক্তব্যের রূপায়ণ-পদ্ধতি সীমিত হতে বাধ্য। পল্লীসমাজের সমস্যা শরৎচন্দ্রের কাছে কয়েকটি কুসংস্কার, গ্রাম্য মানুষের আচার আচরণের মধ্যে পরিসরবদ্ধ, এবং তাঁর ধারণায় পল্লীর দুরবস্থার জন্য দায়ী কয়েকটি মানুষমাত্র। তাই অসৎ সংকীর্ণচেতা মানুষ সৎ হয়ে উঠলে পল্লীসমাজের উন্নতি, এজন্য পল্লীসমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে যে চরিত্রগুলি উপন্যাসে নির্বাচিত হয়, সেই চরিত্রগুলির মধ্যে কেউ অসম্ভব ভালো, কেউ অসম্ভব মন্দ, এবং অশেষ নির্যাতনের শেষে সৎ ও উদার মানুষের দ্বারা মন্দর মতি পরিবর্তন শরৎ-উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য। নায়ক সর্বদা উদার

মহৎ হওয়ার ফলে নায়কের চরিত্রে ভাবালুতা ও আবেগের প্রাচুর্য ঝর্ণার মত স্বতঃস্ফূর্ত হয়, যেজন্য নায়কের পক্ষে অস্বাভাবিক ও আকস্মিক কিছু করা শরৎ-উপন্যাসে প্রত্যাশিত ব্যাপার। নায়ক হৃদয়াবেগ দ্বারা অধিকাংশ সময় পরিচালিত, সেজন্য উপন্যাসে ঘটনার আধিপত্য প্রবল, বরং সময় সময় উপন্যাসগুলি ঘটনা-প্রধান উপন্যাস রূপে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। এ-ছাড়া, নারী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা এমনই রহস্যাবৃত যে উপন্যাসের নারী-চরিত্রের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের ন্যায় ও যুক্তি সন্ধান দুঃসাধ্য। রমার আচরণ তেমনই রহস্যময়, যেমন পুত্র সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বরীর আচরণ। উভয়ক্ষেত্রে ভূমিকা অতিরঞ্জিত, অবশ্য রমেশ, বেণী, গোবিন্দ—প্রত্যেকের চরিত্র আতিশয্যে অঙ্কিত। চরিত্রের আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের জন্য ঘটনার প্রবল চাপ উপন্যাসে সর্বদা অনুভূত হয়। ঘটনার চাপের জন্য আকস্মিক ও অবান্তর ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত উপন্যাসে পরিলক্ষিত, এবং এ-গুলি নিশ্চয়ই উপন্যাসের নব-পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য নয়, "পল্লীসমাজ" উপন্যাসে তাই উপন্যাসের নব-পর্যায়েয় অনুসৃত পদ্ধতির চেয়ে প্রাচীন পর্যায়ের অনুসরণের চিহ্ন প্রকট। বস্তুত, "শরৎচন্দ্রের সামাজিক রীতি-নীতিসংক্রান্ত উপন্যাস কতকগুলি সংকীর্ণচেতা মানুষের সঙ্গে দুটি একটি আদর্শীভূত মানুষের সংঘর্ষের গল্পমাত্র।" (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃঃ ২৫২)। সেজন্য "অরক্ষণীয়া", "পণ্ডিতমশাই", অথবা "বামুনের মেয়ে"-তে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণপদ্ধতি প্রায় বিবর্জিত, এ-উপন্যাসগুলি ঘটনাপ্রধান উপন্যাস-বিভাগে বিচারণার উপযুক্ত।

"অরক্ষণীয়া"-য় জ্ঞানদার প্রতি পাঠকের অশেষ করুণা উদ্রেকের আপ্রাণ চেষ্টা বিভিন্ন ঘটনার সংযোজনায় প্রকাশিত। এই

করুণাঘনতার জন্য তাই জ্ঞানদার পিতার মৃত্যু লেখকের কাছে অপরিহার্য, যেমন অতুলের মন পরিবর্তনের জন্য শ্মশানের দৃশ্য। পিতা ও মাতার মৃত্যুর মধ্যে জ্ঞানদার হৃদয়বিদারক কাহিনী উপস্থাপিত। ফলে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে এবং কুরূপা অরক্ষণীয়া কন্যার মর্মবেদনা কিঞ্চিৎ ভাবাবেগে অঙ্কিত, শরৎচন্দ্র অতি হৃদয়বান বলেই অপরের দুঃখে, বিশেষতঃ নারীর দুঃখে, তাঁর সহানুভূতি সীমাহীন, যেজন্য কখনো কখনো মাত্রা হারানো ঔপন্যাসিকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। পিতার মৃত্যুর সময় অতুলের পায়ে জ্ঞানদার মাথাকোটা বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। অথচ এই ঘটনাটি ও ঘটনার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয়নাথের কাছে অতুলের জ্ঞানদার ভার নেওয়ার সংকল্প সমস্ত উপন্যাসের বনিয়াদস্বরূপ। নায়ক অতুলের চরিত্র অবশ্য এলোমেলো ভাবের একটি বিচিত্র সমন্বয়। অতুল সংকল্পে অটল, দুর্গামণির হরিপালে যাওয়ার আগে স্বর্ণর উত্তরে অতুলের কথায় তা স্পষ্ট, অথচ দোলের দিন জ্ঞানদার সম্পর্কে তার উক্তি অতি কুরুচিপূর্ণ—অতুলের এ-ধরণের আচরণের সঙ্গে মার্জিত শিক্ষিত অতুলের আচরণ মেলানো তাই কষ্টকর। দোলের দিনে অতুলের উক্তিতে ঘৃণার ভাবই প্রকট, অথচ কিসের তাড়নায় এবং কেন সে অবশেষে জ্ঞানদার ভার গ্রহণে নির্দ্বন্দ্ব হয়—তা আমাদের কাছে বিস্ময়ের। শ্মশানে বহ্নিমান চিতার সামনে দার্শনিকতার সঞ্চার স্বাভাবিক বলেই কি অতুলের মন দার্শনিকতায় আক্রান্ত ?

পরপর ঘটনার সাহায্যে দুর্গা ও জ্ঞানদার দুঃখময় জীবনের আলেখ্য অঙ্কিত; মাত্র দু-এক জায়গায় চরিত্রের মনোবিকলন ও ঘটনাজাত প্রতিক্রিয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ। অবশ্য পরিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে চরিত্রের অসহায়ত্ব ও নির্যাতিত হওয়ার চিত্র

উপস্থাপনা দোষের নয়, কিন্তু সেই বিবরণে ঘটনা সর্বৈব হলে চরিত্র ঘটনার দাসে পরিণত হয়। বলাবাহুল্য এ-পদ্ধতি ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের উপযুক্ত পদ্ধতি। কুরূপা অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহসমস্যা বর্তমান উপন্যাসের উপজীব্য। অরক্ষণীয়া কন্যা পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত, এবং তার জীবন দুঃখের ও লাঞ্ছনার—শরৎচন্দ্রের প্রতিপাদ্য বিষয় তাই, সেজন্য বহির্ঘটনার আশ্রয় নিতে লেখক বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের পদ্ধতি এক্ষেত্রে সুনির্বাচিত, যদিচ এ-পদ্ধতি সমস্যার গভীর অতলতা নির্ধারণের অযোগ্য, কারণ এ-পদ্ধতিতে মানুষের জীবনসামগ্র্য ধরা দুষ্কর, যেহেতু চরিত্রগুলি ঘটনার শিকারে পরিণত হয়। আবার ঘটনার মধ্যে ভাবালুতার মাত্রাধিক্য ঘটলে উপন্যাসের সমস্যা অগভীর হওয়াই স্বাভাবিক। বর্ণিত সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের চিত্রে আংশিকতা দোষ ছাড়াও অতিরিক্ত সেন্টিমেণ্টাল ঘটনা ও ঘটনা-অনুযায়ী চরিত্র নির্বাচনের ফলে "অরক্ষণীয়া"-র সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের পথ অগভীর এবং সেন্টিমেণ্টাল হয়ে উঠেছে।

"পণ্ডিত মশাই" ও "বামুনের মেয়ে" সেই একই দোষে দুষ্ট। উভয় উপন্যাসের সমস্যা অগভীর ও সেন্টিমেণ্টাল, এবং বিশেষ ক'রে যে-সব ঘটনা উপন্যাসে ব্যবহৃত, তার সবগুলি অতিরিক্ত ভাবালুতায় সিক্ত। "পণ্ডিতমশাই" সম্পর্কে অভিযোগ অবশ্য আরও মৌলিক। বৃন্দাবন ও কুসুম বৈরাগী, কিন্তু উভয়ের সংলাপ, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সমস্তই অবিশ্বাস্য, অন্তত এ-উপন্যাসেই কুঞ্জ ও তার শাশুড়ীর চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে অঙ্কিত, যে চরিত্র দুটিতে আতিশয্য থাকলেও মোটামুটি বিশ্বাস্য। কিন্তু নায়ক-নায়িকাকে এমন আদর্শের মোড়কে উপস্থিত করার অর্থ কি?

চরিত্রের মহত্ব প্রতিপন্ন করা? অথচ এর ফলে চরিত্রগুলি বায়ুভুক্ নিরালম্ব জীবে পরিণত হয়েছে। সেজন্য চরণকে কেন্দ্র ক'রে যে-দুঃখের স্রোত প্রবাহিত, তার মাত্রাতিরিক্ত সেন্টিমেন্টালিটির জন্য উপন্যাসটির ঘটনাবলী কোনমতেই বিশ্বাস্য ও সম্ভাব্য স্তরে উত্তীর্ণ হয় নি। কুসুম ও বৃন্দাবনের চরিত্রে আদর্শবাদের স্পর্শ লাগানোর জন্য তাদের স্বসমাজ ও স্বধর্মের পরিবেশ চ্যুত করা সফল কৌশল নয়, কারণ পরিবেশের প্রভাব শূন্য করা যে কোনও মানুষের সাধ্যাতীত। "বামুনের মেয়ে" উপন্যাসের সমস্যা অতি প্রাচীন ও বর্তমানে এ-সমস্যা আমাদের সমাজে বিলীয়মান। এ-ছাড়া, এ-উপন্যাসে উপরি-উক্ত উপন্যাসগুলির ত্রুটি সমভাবে বর্তমান, সেজন্য পুনরুক্তির আশঙ্কায় উপন্যাসটির আলোচনা না করাই যুক্তিযুক্ত।

ঔপন্যাসিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের খ্যাতির মূলে "দেবদাস" উপন্যাসের অবদান সামান্য নয়, শরৎচন্দ্রীয় নায়কের কথা তুললে প্রথমেই দেবদাসের নাম মনে আসা স্বাভাবিক। দেবদাস চরিত্রে যে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, শরৎচন্দ্রের প্রায় তাবৎ নায়কেই সেই সেই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এমনকি অন্যান্য উপন্যাসে চরিত্র-উপস্থাপনা ও ঘটনা-সংযোজনার প্রিয় কৌশলগুলির অধিকাংশই "দেবদাস"-এ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত, সেজন্য "দেবদাস"—কে শরৎ উপন্যাসের প্রতিভূ-স্থানীয় উপন্যাস বলা অযৌক্তিক নয়।

"চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের "বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে" উক্তিটি প্রমাণের জন্যই যেন "দেবদাস" রচিত। দেবদাসের প্রতি পার্বতীর প্রেম তুলনায় গভীর হলেও দেবদাসের জীবন চিত্রণই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য, সেজন্য প্রেমের প্রথম স্তর থেকে পরিণতি পর্যন্ত দেবদাসের হৃদয়াবেগের আলেখ্য,

বিশ্লেষিত না হলেও, অনাবৃত পাঠকের সামনে। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে বালক-বালিকার যে চিত্র উপস্থাপিত, সে-চিত্রে দেবদাস-পার্বতীর হৃদয় সম্পর্ক অতি নিকটের, প্রায় ঘনিষ্ঠ। এরপর চতুর্থ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী দেবদাস-পার্বতীর বিবাহসংক্রান্ত আলোচনা ও ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত। পার্বতীর বিবাহের পর কাহিনী অবশ্য মূলতঃ দেবদাসের অধঃ-পতনের ইতিহাস, এবং সে-কাহিনীতে চন্দ্রমুখীর শুভ-ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার চিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল, এবং দেবদাসের মৃত্যুতে উপন্যাসের উপসংহার হয়। দেবদাসের বিষাদাত্মক পরিণতির জন্য দায়ী বাল্য প্রেম, কারণ সেই প্রেম অভিশাপযুক্ত বলেই দেবদাস ও পার্বতীর মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয় এবং সেই বিচ্ছেদের অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া দেবদাসের অধঃপতন। অর্থাৎ চন্দ্রশেখরের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির ভাবসম্প্রসারিত রূপ "দেবদাস।" উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে তুচ্ছ নয়, যদিও স্বীকার্য "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের চিত্তজয়ের কাহিনী বিষয়বস্তু হিসাবে "দেবদাস"-এ উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর চেয়ে গভীর। কারণ দেবদাসের কাহিনী চিত্তজয়ের কাহিনী নয়, সে চিত্তদৌর্বল্যের শিকারবিশেষ। প্রেমের ব্যর্থতায় সে ক্ষতবিক্ষত, সেই যন্ত্রণাদীর্ণ স্মৃতি থেকে উত্তরণের কাহিনী নিশ্চয়ই অতিদক্ষ শিল্পীর পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব। কিন্তু সে-কাহিনী রচনা না ক'রে প্রেমজনিত ব্যর্থতা হতাশায় নায়কের কিশোরসুলভ রোমান্টিক জীবনযাপন এবং নাটুকেপনার ইতিবৃত্ত শরৎচন্দ্রের মূল অবলম্বন হয়। অবশ্য দেবদাস যে শ্রেণীর মানুষ ("কোন জিনিস বেশীক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করার ধৈর্য ইহাদের নাই। কোন কিছু হাতে পড়িবামাত্র স্থির করিয়া ফেলে—ইহা ভাল কিংবা মন্দ। তলাইয়া দেখিবার

পরিশ্রমটুকু ইহারা বিশ্বাসের জোরে চালাইয়া লয়।") সেই শ্রেণীর মানুষের কাছে দৃঢ়চিত্ততার বা দুর্বলতাজয়ের আকাঙ্ক্ষা আশা করা অন্যায়, এবং স্বয়ং লেখকও এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। পার্বতী সম্পর্কে দেবদাসের মনোভাব এতই বিপরীতধরণের যে দেবদাসের প্রেমের গভীরতা সম্বন্ধে মন্তব্য করা প্রায় অসাধ্য। "ছেলেবেলায় যখন সে পার্বতীর উপর দখল পাইয়াছিল, তখন তাহা সে পরিপূর্ণভাবেই উপভোগ করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় গিয়া কর্মের উৎসাহে ও অন্যান্য আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে পার্বতীকে সে অনেকটা ছাড়িয়াই দিয়াছিল।" এমন পরিবর্তন যে কোনও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং এই ন্যায় অনুসারে পার্বতীকে দেবদাসের প্রত্যাখ্যানও যুক্তিসঙ্গত। "আর এক কথা—তোমাকে আমি যে বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনদিন মনে হয় নাই—আজিও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না। শুধু এই আমার বড় দুঃখ যে, তুমি আমার জন্য কষ্ট পাইবে। চেষ্টা করিয়া আমাকে ভুলিও, এবং আন্তরিক আশা করি, তুমি সফল হও।" এ-পর্যন্ত অর্থাৎ পার্বতীর কাছে দেবদাসের চিঠি লেখা পর্যন্ত ঔপন্যাসিক চরিত্রের যুক্তি অনুসরণ করেন সঠিকভাবে, শরৎচন্দ্র যে চরিত্র-বিবর্তনের ন্যায় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এজন্য আমরা বিস্মিত এবং আনন্দিত। অথচ এ আনন্দ ও বিস্ময় তাৎক্ষণিক, কারণ চিঠি ডাকে ফেলার পর থেকে যে-দেবদাস পাঠক সম্মুখে উপস্থিত হয়, সে-দেবদাস আগের দেবদাস নয়, ততক্ষণে সে পার্বতীর স্মৃতি দ্বারা আক্রান্ত, তাই মুহূর্তে কলকাতার তুলনায় "দুর্দান্ত দুর্বিনীত কিশোর বয়সের সেই অযাচিত পদদলিত রত্ন" দেবদাসের কাছে অনেক বড়, অনেক দামী হয়ে ওঠে। এরপর

পার্বতীর প্রতি দেবদাসের দুর্বার প্রেমের বন্যা, যার চরম মুহূর্ত পার্বতীর কপালে ছিপের মোটা বাঁট দিয়ে কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দেওয়ার দৃশ্য। তারপর শুরু হয় দেবদাসের নাটুকেপনা। বারবণিতালয়ে গিয়েও তাদের ঘৃণা করা, মদ খাওয়া, বিশেষ একটা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি অধঃপতনের চিত্রে দেবদাসের চিত্তদৌর্বল্যের শিকারে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত। অর্থাৎ পার্বতীকে প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত যে-দেবদাস সে-দেবদাসের সঙ্গে নাটুকে দেবদাসের সামঞ্জস্যবিধান পণ্ডশ্রম, অথচ দেবদাস সেই একই ব্যক্তি। দেবদাস ভাবাবেগ ও ভাবালুতার দ্বারা পরিচালিত—এমন কিছু স্থির ক'রে নিয়ে লিখলে চরিত্র-বিকাশের নিয়ম লঙ্ঘিত হতে বাধ্য এবং দেবদাসের মধ্যে সেই ভাবোচ্ছ্বাসের মাত্রা বেশী। চন্দ্রমুখীর ভূমিকা অবশ্য দেবদাসের চেয়েও অতিরঞ্জিত। সে বারবণিতা, অথচ দেবদাসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই দেবদাসের প্রণয়াসক্ত। এর হেতু কি? লেখক এ-সম্বন্ধে নীরব, তাই দেবদাসের অজস্র ঘৃণা সত্ত্বেও চন্দ্রমুখী তার অধঃপতনে মর্মাহত, হয়ত দেবদাসের প্রেমে ব্যর্থতা ও অসহায়ত্বই চন্দ্রমুখীর প্রেমের উৎস; কিন্তু বারবণিতার এমন সহসা পরিবর্তন কি বাস্তবে সম্ভব? চন্দ্রমুখীর অতীত জীবনে কোনও ব্যর্থতা বা হতাশা জড়িত থাকলে না হয় এই সহসাজাত প্রেমের কারণ অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হতে পারে, কিন্তু লেখক চন্দ্রমুখীর অতীত জীবন সম্পর্কেও নিশ্চুপ। ফলে চন্দ্রমুখীর চরিত্র অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য। এমন চরিত্র মরজগতে দুর্লভ বলেই চন্দ্রমুখীর বারবণিতাবৃত্তি ত্যাগ, অশথঝুরি গ্রামে সাত্ত্বিক জীবনযাপন, দেবদাসকে অনুসন্ধানের আপ্রাণ চেষ্টা ও সেজন্য গিলটির গয়না সংগ্রহ ক'রে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণের অভিনয় ইত্যাদি অযৌক্তিক অবিশ্বাস্য অসম্ভব কাণ্ডগুলি

উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিক দ্বিধাগ্রস্ত নন। চরিত্রের আচার-আচরণ ও সাধিত কর্মের মধ্যে শিল্পের কার্য-কারণ প্রয়োজন, লেখক এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না, কারণ নারী (বারবণিতা হলেও) লেখকের অতি শ্রদ্ধার পাত্রী, সেজন্য পরিবেশ পরিজন ইত্যাদির উপর চরিত্রের বিকাশ নির্ভর করে না, যেন এ-সব নারী আপনাতে আপনি বিকশিত একক এবং স্বয়ম্ভূ। এ-সময় চন্দ্রমুখীর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার সম্ভাব্যতার প্রশ্ন না তোলাই ভালো।

বরং দেবদাসের প্রতি পার্বতীর প্রেমের চিত্রে লেখক অনেকখানি যুক্তি ও ন্যায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। কিন্তু পার্বতীর চরিত্রে ব্যক্তিত্বের অভাব স্বতঃই প্রকট, তাই বিবাহের পর স্বামীগৃহে পার্বতীর সামঞ্জস্যস্থাপনের চিত্র সম্পূর্ণ অনুক্ত, অথচ পার্বতীর জীবনে দেবদাস ছাড়া অন্যপুরুষকে বিয়ে করার জন্য নতুন পরিবেশের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধানের চিত্র একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ পার্বতী দেবদাসের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং দেবদাসের সঙ্গে বিবাহ না হওয়া তার জীবনে কতখানি মর্মবেদনার কারণ তা সকলের বোধগম্য। বিবাহের পর পার্বতী কি পূর্ব-প্রণয় কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে? ধর্মদাসের মুখে দেবদাসের অতিরিক্ত মদ্যপানের কাহিনী শুনে ও দেবদাসকে অসুস্থ দেখে পার্বতীর হৃদয় বিগলিত হয়, কিন্তু এই হৃদয় আর্দ্র হওয়ার ব্যাপারে দেবদাসের অসহায়তাই পার্বতীর মনে করুণার সঞ্চার করে অর্থাৎ অসুস্থতাকে সেবা করা নারীর একান্ত কর্তব্য এবং শরৎচন্দ্রের নারীরা এ-বিষয়ে বিশেষ পটু। তবু পার্বতীর চরিত্র ভাবালুতায় রঞ্জিত হলেও কিঞ্চিৎ সহজ ও স্বাভাবিক। এমনকি ধর্মদাসের ছোট্ট ভূমিকাও ভাবালুতা মুক্ত নয়। উপন্যাসে সর্বব্যাপী ভাবালুতার জন্য দেবদাসের মৃত্যুদৃশ্য স্পর্শ-কাতর পাঠকের

অশ্রু আকর্ষণে সমর্থ হলেও শিল্প হিসাবে ব্যর্থ, অতিনাটকীয়তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, তাই লেখকের সরাসরি অবতরণ উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে অনিবার্য ছিল। এ-প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য যথার্থঃ "ভাবাতুর ও মধুর রসালু বলিয়াই তাঁহার দুঃখান্তিক কাহিনী ট্রাজিক না হইয়া শুধু প্যাথেটিক হইয়াছে।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৬)।

"দেবদাস" উপন্যাসের উপরি-উক্ত আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষিত হয়, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অধিকাংশ শরৎ-উপন্যাসে বর্তমান :*

১. নায়ক ধনবান এবং সংসারবন্ধনহীন। সংসারবন্ধন কিছু অবশিষ্ট থাকলেও সেই বন্ধনমুক্তির আয়োজন অতিসত্বর নির্বাহিত। নায়ক সর্বদাই উদার, আত্মভোলা এবং উদাসীন। অনিয়মিত ভাবোচ্ছ্বাস অবশ্য এ-সব চরিত্রের একান্ত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

২. নায়িকা আদর্শবাদী ও সেবাপরায়ণ, এবং সে-নায়িকা বারবণিতা হলে এ-আদর্শবাদ গগনস্পর্শী ও ইহজগতে তুলনারহিত। তাই নায়িকাদের বিরাট বিরাট জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা নারীর স্বধর্মরূপে বিবেচিত।

৩. নায়কের অসহায় বা অসুস্থ অবস্থায় নারীর হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার, প্রেমের জন্য অশেষ লাঞ্ছনা ও ত্যাগ স্বীকারে নারীর মহত্ত্ব প্রকাশিত।

৪. নায়ক-নায়িকার পীড়া বা মৃত্যু, বিশেষতঃ নায়কের অকস্মাৎ পীড়া ঘটিয়ে কাহিনীর জট ছাড়ানো ও সময় সময় প্লটের গ্রন্থিবন্ধন শরৎচন্দ্রের প্রিয় কৌশল।

৫. চরিত্রগুলি হৃদয়াবেগ ও প্রবৃত্তি পরিচালিত ব'লে মনো-

* এ প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

বিকলন প্রায়শই উপেক্ষিত, এবং পাত্র-পাত্রীর সংলাপে চরিত্রের মানসিক অবস্থার আলেখ্য অঙ্কনের চেষ্টা প্রায় নিয়মরূপে গণ্য। সেজন্য ঘটনার চাপ শরৎ-উপন্যাসে সমান দুর্বার।

৬. চরিত্রগুলির ভূমিকা অতিরঞ্জিত ও অতিশয়িত বলে আকস্মিক অবিশ্বাস্য ঘটনার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এ-ছাড়া, ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের মত পাঠককে উদ্দেশ্য ক'রে লেখকের বক্তৃতা দেবার অভ্যাস শরৎ-উপন্যাসে দুর্লভ নয়। শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা প্রচুর। কিন্তু সে-অভিজ্ঞতার অনুপাতে দৃষ্টিভঙ্গী গভীর ছিল না। সমাজ ও সংসার তাঁর কাছে একান্ত ব্যক্তিগত আনুভূতিক মানদণ্ডে বিচার্য ব'লে উপন্যাসের চরিত্রগুলি ভালো ও মন্দ—এই দুই স্থূল ভাবে তাঁর কাছে সত্য ছিল। সামাজিক পটে বিধৃত মানুষ নানা প্রতিকূল ও অনুকূল অবস্থার পাকে বিপাকে দ্বন্দ্বময় জটিল, আর এই দ্বন্দ্বময় জটিলতার গ্রন্থিমোচনই সচেতন ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। শরৎচন্দ্র সে-পথের পথিক নন, তাই তাঁর উপন্যাসে "যাহা সমাজ তাহা পটভূমিকা বা রঙ্গস্থলীমাত্র। অন্য লেখকের রচনায় বহিঃপ্রকৃতির যে স্থান শরৎচন্দ্রের রচনায় সমাজ অনেকটা সেই রকম।" (ঐ, পৃঃ ১৮৬)।

"দত্তা", "দেনাপাওনা", "বিপ্রদাস" প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত। "দেনাপাওনা" উপন্যাস "একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে" রচিত, কিন্তু "জগতে দৈবাৎ যা সত্য ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না।" (রবীন্দ্রনাথকে লেখা "ষোড়শী" সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের পত্রাংশ)। "দেনাপাওনা"-র নাট্যরূপ "ষোড়শী" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত শরৎচন্দ্রের নিকট লিখিত পত্রে বিধৃত। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু যথার্থ:

"ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাইরে সত্য নয়। আমি বলিনে এইরকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ-পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেণ্টমিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়।" কাহিনী ও চরিত্র স্থাপনায় অসঙ্গতির প্রশ্ন পত্রাংশে প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমান সমালোচক রবীন্দ্র-উক্তিরই একজন সমর্থক।

"বিপ্রদাস" উপন্যাসেও কাহিনী ও চরিত্র সম্যক বিকশিত নয়। উপন্যাস পাঠে সেজন্য পাঠকের প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ও সেই প্রশ্নের সূত্রে উপন্যাসটির দুর্বলতার বিষয় জড়িত। মুখোপাধ্যায় পরিবারের আদর্শের স্বরূপ রহস্যাবৃত ব'লে সামান্য একটি ঘটনায় পরিবারের দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ব্যাপার বিস্ময়কর মনে হয়। অন্যদিকে বন্দনার অস্থিরমতিত্বের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত নয়, সেজন্য প্রেমের অন্বেষায় পাত্র থেকে পাত্রান্তরে আকর্ষণ ও সম্বন্ধস্থাপন গ্রন্থের প্রথমে বর্ণিত আলোক-প্রাপ্তা বিদুষী বন্দনা চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস ও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুধীর, অশোক, দ্বিজদাসের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের কাহিনী সেজন্য অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব হয়ে ওঠে। এছাড়া উপন্যাসে অবান্তর ও আকস্মিক ঘটনার ছড়াছড়ি। মাসিমার সঙ্গে বন্দনার হঠাৎ দেখা ও সম্পূর্ণ মাসিমা-উপাখ্যান মৈত্রেয়ী-উপাখ্যানের মত অবান্তর। আবার মাতা ও পুত্রের (বিপ্রদাস) মিলনের জন্য বিপ্রদাসের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটানো অপ্রয়োজনীয়। শশধর উপাখ্যান উপন্যাসের মূল

কাহিনীর অন্তর্গত, অথচ শশধরের আবির্ভাব সম্পূর্ণ আকস্মিক, যদিও দ্বিজদাসের সংলাপে পাঠক শশধরের কীর্তি-কলাপ অবগত, তবু উপাখ্যানটি-বিশ্বাস্য করার জন্য কার্যকারণ যোগাযোগের প্রয়োজন ছিল।

"দত্তা" উপন্যাসে এমন আকস্মিকতা ও অবান্তর ঘটনার সাক্ষাৎ দুর্লভ নয়। বিজয়া নরেনের দত্তা, এবং বিজয়ার পিতার কয়েকটি পত্রে বিজয়ার মনের গ্রন্থিমোচন আকস্মিকতা ও অবিশ্বাস্যতার উদাহরণ। বিজয়ার পিতার অর্থেই নরেনের বিলেত যাওয়ার রহস্য নরেনের মুখে শুনে সকল পাঠকই বিস্মিত হবেন সন্দেহ নেই। কারণ নরেনের সঙ্গে বিজয়ার পিতার যোগাযোগ বা যোগসূত্রের যে-কোনও ইঙ্গিত সম্পর্কে লেখক সম্পূর্ণ নীরব। এই ঘটনাটি প্রায় ডিটেকটিভ উপন্যাসের পর্যায়ের। উপন্যাসের শেষ অংশে কয়েকটি ঘটনা দ্রুত সংঘটিত হওয়ায় (বিলাসের সঙ্গে বিবাহের দিন ধার্য করা, নরেনের কাছে পিতৃপত্রের সংবাদ জানা, রাসবিহারীর সঙ্গে প্রকাশ্য কলহ, দয়াল-গৃহে নরেন-নলিনীর সংস্রবে ক্ষুব্ধ হয়ে বিবাহ-দলিলে স্বাক্ষর) উপন্যাসটি অতি নাটকীয়তার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। উপরি-উক্ত তিনটি উপন্যাস নব ও প্রাচীন পদ্ধতির মিশ্রণে একটি বিচিত্র পদ্ধতিতে রচিত, অবশ্য সে-পদ্ধতি ঘটনা-প্রধান উপন্যাসে অনুসৃত পদ্ধতির অধিক নিকটবর্তী।

বস্তুত, শরৎ-উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভূমিকা অতিরঞ্জিত ও অতিশয়িত ব'লে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের প্রত্ন ও নব পর্যায়ের মধ্যে একটা আপোস করতে বাধ্য হয়েছিলেন, অন্তত পাঠকের মুখ চেয়েও তাঁকে নিছক ঘটনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। পরিণামে শরৎ-উপন্যাসে চরিত্রের সমগ্রতার চিত্র অনুপস্থিত, উপন্যাসে চরিত্রকে প্রাধান্য

দিলেও রূপায়ণে তিনি আখ্যানের সমগ্রতা সম্পর্কে বেশী উৎসাহী ছিলেন। এই আখ্যানবৃত্ত সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসের সমাপ্তি বিষণ্ণ বিষাদে নয়, উজ্জ্বল সুখে। এমনকি মৃত্যুতে যে উপন্যাসের সমাপ্তি, সে-উপন্যাসেও নায়ক-নায়িকা লেখকের সহানুভূতি ও অনুকম্পা বঞ্চিত নয়। শরৎচন্দ্র তরল মিলনান্তক উপন্যাসের রূপকার, তাই তাঁর তথাকথিত গল্প-জমানোর কৌশল হস্তামলকবৎ আয়ত্তে ছিল। হয়ত এজন্যই তিনি আমাদের সাহিত্যে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও কথাসাহিত্য-সম্রাট।

মননধর্মী উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসের আধুনিক পর্যায়ের সূচনা

"১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে বা তার কাছাকাছি কোন সময় মানবচরিত্র বদলে গেছে"—ভার্জিনিয়া উল্‌ফের এ-মন্তব্য তর্কের বিষয়, যেহেতু এমন দিনক্ষণ দেখে মানবচরিত্র বদলায় কিনা তা যে-কোনও তীক্ষ্ণধী সমালোচকের পক্ষে বলা অসাধ্য। কিন্তু সাহিত্যজগতে সেইসময় যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বোধহয় উক্তিটির উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-কালে ও যুদ্ধচলাকালে মার্সেল প্রুস্ৎ (Remembrance of Things Past-এর প্রথম দুইখণ্ড ১৯১৩ সালে প্রকাশিত), ডরোথি রিচার্ডসন্ (Pilgrimage-এর প্রথমখণ্ড ১৯১৫ সালে প্রকাশিত) ও জেমস জয়েসের (A Portrait of The Artist as a Young Man ১৯১৬ সালে প্রকাশিত) উপন্যাসে ফরাসী ও ইংরেজী উপন্যাসের আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। ভাবা আনন্দের ও বিস্ময়ের যে "চতুরঙ্গ" উপন্যাস প্রায় ওই সময়ে রচিত (পুস্তকাকারে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত, তৎপূর্বে "সবুজপত্র"-এ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত), এবং রবীন্দ্রনাথ প্রকরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও আধুনিকতার পথে এঁদেরই সহযাত্রী। চেতনাপ্রবাহ বা স্মৃতি-চারণের অতিমন্থর বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি "চতুরঙ্গ"-এ অনুসৃত নয়, অথচ প্রত্ন ও নব পর্যায়ের মানদণ্ড প্রয়োগে উপন্যাসটি "সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের

ধারা) রূপে বিবেচিত হবে, এবং সেই সূত্র অনুযায়ী এ-শ্রেণীর উপন্যাসের "অসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের শিথিলগ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে প্রাচুর্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থি-বহুল জটিলতার মধ্যে দুই একটি রঙ্গিন ও সূক্ষ্ম সূত্রকে পৃথক্-করণের চেষ্টা খুব তীব্রভাবেই আমাদের চোখে পড়ে।" (ঐ, পৃ: ১৪২)। চোখে-পড়া স্বাভাবিক, যেহেতু "চতুরঙ্গ" উপন্যাস-নির্মিতির প্রাক্তন ধারণার অনুরূপ বা অনুবর্তী নয়। ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের আখ্যানের সুবলয়িত রূপ, অথবা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের চরিত্রবিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত সমগ্রতা আলোচ্য উপন্যাসে অবর্তমান, এবং উভয় পদ্ধতির মিশ্রণজাত শরৎচন্দ্রীয় কৌশলের সন্ধান এক্ষেত্রে হাস্যকর। তাই "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে রবীন্দ্র-অবলম্বিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন। যদিচ এ-পদ্ধতির নামকরণ বর্তমান সমালোচকের পক্ষে দুঃসাধ্য, কারণ এ-ধরণের উপন্যাসকে কোনও একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা কঠিন, যেহেতু এর সমান্তরাল পদ্ধতি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী উপন্যাসে অ-দৃষ্ট। একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দিবারাত্রির কাব্য" উপন্যাসে এ-ধরণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তথাপি এ-পদ্ধতি যে প্রাক্-পৌরাণিক নয়, উপন্যাসটির আলোচনায় তা স্পষ্ট হবে নিঃসন্দেহে। "চতুরঙ্গ"-এর গল্পাংশ অতি সামান্য, এবং শুধু কাহিনীতে উপন্যাসের মৌল সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত নয়, সেজন্য কাহিনীর সারাংশ প্রস্তুত করা কৈশোরক প্রচেষ্টার সামিল ; আবার চরিত্র-চিত্রণ ধারাবাহিকতার পরিবর্তে উল্লম্ফনের দৃষ্টান্ত, যেজন্য চরিত্র বিকাশের ন্যায় অনুসারে উপন্যাসের সমগ্রতা বিচারে আকস্মিকতা-অতর্কিকতার সন্ধান সুলভ। বস্তুত, উপন্যাসটির সংহতি একটি নকশার টানে,

শ্রীবিলাসের কথায় "জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যেজাল বোনা হইতে থাকে তার নকশা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাসের নয়—তাইতো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।" এই ভিতরে বাহিরে বেদনার জালে "রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি"-র বিষয় উপন্যাসের মূল উপজীব্য, এবং নকশাটি ভাববস্তুর টানেই রচিত। ভাববস্তুর বিবর্তন ও বিকাশের চিত্রণ-ই তাই ঔপন্যাসিকের অনন্য লক্ষ্য, সেজন্য উপন্যস্ত নায়ক নায়িকা মাঝারি-গোছের ভদ্র নরনারী নয়, আত্মসচেতনতার ও সেই সূত্রে আত্ম-পরিচয় লাভের আকুতিতে অগ্নিগর্ভ। শচীশ ও দামিনীর বর্ণনায় সে-ইঙ্গিতই স্পষ্ট—

১. শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা, তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম।

২. দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে।

শচীশ আত্মসচেতন, কিন্তু অতি আত্মমগ্নও বটে। শচীশের হারানো বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার বা আত্মপরিচয় লাভের আকুতি বাস্তবের দ্বন্দ্বময় পটে স্থাপিত নয় ব'লে শচীশ অনেকসময় নিষ্ক্রিয় চরিত্ররূপে প্রতিভাত। শচীশ নিষ্ক্রিয় বহুলাংশে, তবু সজাগ ও মনস্ক। আশৈশব বুদ্ধিজীবী আবহাওয়ায় লালিত পালিত শচীশের রস-সাগরে নিমজ্জন নিশ্চয়ই ভাবালুতা, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তার সচেতনতা অন্তর্হিত নয়, "জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়াছিলেন তখন

তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, * * জ্যাঠামশায় মৃত্যুর পর তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, * * এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়ের কাণ্ড, এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।" দামিনী আত্মসচেতন, কিন্তু সে সক্রিয়, অন্তত রবীন্দ্রনাথ দামিনী চরিত্রকে নানা দ্বন্দ্বময় পটে স্থাপিত ক'রে দামিনী-আলেখ্য উপস্থাপনায় মনোযোগী ছিলেন। এই দুই আত্মসচেতন পুরুষ ও নারীর এক ভাববৃত্ত পরিক্রমান্তে অন্য এক ভাববৃত্ত পরিক্রমার বিবরণ "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে লিপিবদ্ধ, অথচ বৃত্তান্তরের কৈফিয়ৎ বা কারণ এ-উপন্যাসে লেখকের সচেতন প্রযত্নেই অ-বিশ্লেষিত ; সামান্য তুচ্ছ সংবাদের মতই রূপান্তরের ইঙ্গিত পরিবেশিত হয়। "এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। 'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।" চারি অংশ কিন্তু বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন নয়, প্রতি অংশ সমগ্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, যেজন্য জ্যাঠামশায় বৃত্তান্ত আপাতদৃষ্টিতে "অনাবশ্যক রূপে পল্লবিত" মনে হলেও উপন্যাসের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায়, কারণ শচীশের প্রাতিস্বিকতা ও আত্মসচেতনতার উদয় জ্যাঠামশায়ের শিক্ষায়। জ্যাঠামশায় নাস্তিক তো বটেই, উপরন্তু সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস ও আস্তিক্যের উপর তার দুরন্ত অনীহা, এজন্য "আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।" বস্তুত এই আত্মবিশ্বাসের জন্য তার সঙ্গে শচীশের সম্পর্ক বয়োজ্যেষ্ঠ বয়োকনিষ্ঠের নয়, একান্ত বন্ধুত্বের। বন্ধুত্বের জন্যই শচীশের 'লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি" এবং সমস্ত সংস্কারের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলে শচীশ তাই প্রাতিস্বিক ও আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। ফলে শচীশের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল, সেজন্য পরিবারের তথাকথিত স্থূল মর্যাদা লঙ্ঘন ক'রে ননীকে বিয়ে করতে

স্বীকৃত হওয়ায় সে দ্বন্দ্বমুক্ত, এবং এই স্বীকৃতির মধ্যে শচীশ আত্মজিজ্ঞাসার পরীক্ষায় অতিসহজে উত্তীর্ণ। অর্থাৎ শচীশের আত্মসচেতনতা ও আত্মপরিচয় লাভের জন্য জ্যাঠামশায় অধ্যায় একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। আবার জীবনসামগ্র্য সন্ধানে জ্যাঠামশায়ের নিছক বুদ্ধি ও যুক্তিচর্চা সব নয়—এই বোধ শচীশের পরবর্তী ভাববৃত্তে প্রবেশের জন্য আবশ্যক, কারণ আত্মজিজ্ঞাসায় কথা ও কর্ম সোদর করতে অক্ষম হলে নিজের খণ্ডিত অস্তিত্বই মাথা চাড়া দেয়, তার ফল যে বিপদজনক জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশের রসসাগরে নিমজ্জনে সেকথা প্রমাণিত। বস্তুত, জ্যাঠামশায়ের শুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তির অধ্যায়ের অসারতা ননীবালাকে কেন্দ্র করেই প্রমাণিত, এবং জ্যাঠামশায় আশীর্বাদে সিকিপয়সা বিশ্বাস না করলেও "ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে" উক্তির মধ্যে জ্যাঠামশায়ের রূপান্তরমুখী চিত্রটি কি লভ্য নয়?

এরপর নাস্তিক্য-জগৎ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক আস্তিক্য-জগতে প্রবিষ্ট শচীশের ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ার আলেখ্য চিত্রিত। সব না-মানার পর সব মানার পালা, এবং এই না-মানার পালা থেকে সব মানার পালার শুরু জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর। শচীশ প্রথম বৃত্তে পরাশ্রয়ী ব'লে তার জীবনের এমন পরিবর্তন সম্ভব, অবশ্য এ-পরিবর্তন শচীশের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ নিছক বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে খণ্ডিত সত্তার যন্ত্রণা অসহ, এই খণ্ডিত সত্তার তাড়নায় তার বিশ্বাসের আশ্রয় লীলানন্দ স্বামী। কিন্তু অরূপের প্রতি বিশ্বাস ও শচীশের বিশ্বাসভূমি সুদৃঢ় নয়, তাই দামিনীর উপস্থিতি তার কাছে শরীরী, ব্যক্তিত্বের সাবয়ব উপস্থিতি, কারণ "সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়,

সে জীবনরসের রসিক।” ফলে রূপের সঙ্গে রূপকের সংঘর্ষ অনিবার্য, এবং স্বাভাবিকভাবেই রূপকের “পাত্রটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে।” এরপর পুনরায় শচীশের মতবদল, এবং এবার “সমস্ত মানিয়া লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল।” অথচ এ-শান্ত হয়ে বসার মধ্যে কতখানি যন্ত্রণা লুকনো সেকথা উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে প্রসারিত। বস্তুত, দামিনী-শচীশের উত্থান-পতনে শচীশের অজস্র সংগ্রামের বিবরণ অতি সূক্ষ্মতায় বিরল ইঙ্গিতে প্রকাশিত ক'রে লেখক শচীশের মর্মান্তিক দাহনের চিত্র তীক্ষ্ণ করার প্রয়াসী ছিলেন। দামিনীর আকর্ষণ বাড়ার অনুপাতে শচীশের চিত্ত-নিরোধ ও সংযমের প্রাচীর তত দৃঢ় হয়ে ওঠা আশ্চর্য নয়, কারণ ঈষৎ দুর্বলতায় তার চারিত্র্য-বনিয়াদ চূর্ণ হতে নিমেষমাত্রেরই প্রয়োজন। তাই এ-দৃঢ়তা আসলে আত্মপ্রবঞ্চনাই, কারণ লীলানন্দ স্বামীর আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে নিজের দাঁড়াবার জায়গা সম্বন্ধে সে নিশ্চিত নয়, তাই প্রবঞ্চনা ছাড়া গতি কি? অথচ লীলানন্দর বন্ধন নিগড়ের মতই দুর্মোচ্য এবং অসহ শচীশের কাছে, অতএব মুক্তি প্রয়োজন, কিন্তু কোনও বিশ্বাসের ভিত যেখানে দৃঢ় নয়, সেখানে অরূপে আত্মসমর্পণ প্রত্যাশিত। তাই দামিনীর শেষ চিত্রটি মুছে ফেলার জন্য এই সজীব সম্পর্ক ছিন্ন করা দরকার, এবং তখনই অরূপের মধ্যে আত্মনিমজ্জন অনিবার্য ও একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এ-বিশ্বাসের ভিত সুপ্রোথিত কিনা— সে-প্রশ্ন ওঠার আগেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

একটি স্থির নিশ্চিত অবলম্বনের ভিত্তি ধ্বসে যাওয়ার পর আর একটি পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে প্রস্থানের জন্য শচীশের প্রয়াস।

এই প্রয়াসেই লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব বরণ, রূপ-অরূপের সংঘর্ষে দ্বিধাদীর্ণ হওয়া, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নিষ্ক্রিয় কালযাপন, অতঃপর সেই বন্ধনহীনতার মধ্যে আত্মসমর্পণে একটি কথা স্পষ্ট যে, এ-পথ পরিক্রমায় হারানো-বিশ্বাস অন্বেষণের চিত্রই মূল ও মুখ্য। শ্রীবিলাসের কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাবে শচীশের উক্তি, "একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপর নিজের দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না," বিশেষ অর্থবহ; কারণ এ-উক্তিতে শচীশের কয়েকটি বিষয় সুপরিস্ফুট, তার মধ্যে রূপান্তর সম্পর্কে সচেতনতা, বিশ্বাসের ভিত ধ্বসে যাওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাসে সংশয় এবং আশ্রয় বা বিশ্বাস লাভের আকুতি উল্লেখ্য। শচীশের আকুতিপ্রকাশে তার সংলাপগুলি অবশ্য আমাদের একমাত্র অবলম্বন, কারণ শচীশের সক্রিয়তার আলেখ্য উপন্যাসে উহ্য।

আত্মবিশ্বাস সংশয়সিক্ত হলে আত্মসমর্পণের তাগিদ ও তাড়না স্বাভাবিক, এবং শচীশ ক্রমেই আত্মসচেতনতার নেতির দিক আত্মকেন্দ্রিকতার পথে যাত্রী হয়। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে চামার মুসলমানদের সংস্পর্শে সে সজীব, বস্তুত তখন জনবিচ্ছিন্ন হওয়া শচীশের সাধ্যাতীত, অন্তত পরোক্ষভাবেও সে জনগণের সঙ্গে যুক্ত জ্যাঠামশায়ের মধ্যস্থতায়। কিন্তু রস-সাগরে নিমজ্জনের পর থেকে অতিষ্ঠ শচীশ ক্রমে ক্রমে জনবিচ্ছিন্ন ব'লে শামুকের মত চারপাশে চিত্তনিরোধের প্রাকার তৈরী করার জন্য ব্যগ্র, অবশেষে সেই

প্রাকার ধ্বসে পড়ার মুখে বাধ্য হয়ে অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতায় আত্ম-বলিদান নিয়তির প্রতিহিংসা গ্রহণের মত নির্মম হলেও স্বাভাবিক এক্ষেত্রে। আসলে শচীশের মত পুরুষের এই পরিণতি অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত, কারণ তার আত্মসচেতনতার মধ্যে যে-খণ্ডতা বিদ্যমান, তা আমাদের তথাকথিত রেনেসাঁসের দায়ভাগ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আত্মবিরোধের বিষয়টি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। একদিকে কোনও মহৎ আদর্শ বা কাজে আত্মসমর্পণ ক'রে ব্যাপ্তির মধ্যে চরিতার্থতা লাভ, অন্যদিকে অভিজাত নিঃসঙ্গতার দরুণ আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব। আমাদের নবজাগরণে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ যে আত্মসচেতনতায়, সে-আত্মসচেতনতায় আবেগের প্রভাবও কম নয়, ফলে আমাদের আত্মসচেতনতায় নেতির প্রাবল্য স্বাভাবিক। এই নেতি একদিকে প্রখর আত্মকেন্দ্রিকতায়, অন্যদিকে ভাবালুতায় প্রসারিত। কারণ পরাধীন দেশের নবজাগরণ এই নেতির আবহাওয়ায় লালিত পালিত, অবশ্য স্বাধীন দেশের নবজাগরণে নেতির প্রভাব পড়ে সামাজিক পটকে অস্বীকারের জন্য। অথচ সামাজিক পটকে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই নেই আমাদের, কারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জন্মসূত্রে ছিন্নমূল, ফলে আমাদের ব্যক্তিত্ব উন্মেষ ও তার প্রসার আত্মসচেতনতা সীমাবদ্ধ ঐতিহাসিক কারণে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে শচীশের আত্মসচেতনতা বিচার্য। এই সীমাবদ্ধতাই আমাদের যাবতীয় স্ববিরোধিতা দুর্বলতার উৎস। অদ্যাপি এই বিশ শতকের পরার্ধেও মননদীপ্ত আধুনিক বঙ্গসন্তান সীমাবদ্ধতায় কি বন্দী নয়? শচীশের আত্মসমর্পণ অনেকের অনভিপ্রেত হলেও শচীশের আত্মানু-সন্ধান ও আত্মপরিচয় লাভের আকুতি আধুনিকতারই বৈশিষ্ট্য, সেদিক থেকে শচীশ আমাদের আধুনিকতার প্রতিভূস্থানীয় চরিত্র।

দামিনীর পথ-পরিক্রমার সূচনা ও সমাপ্তিতে অতৃপ্তিই প্রকট। স্বামীর সঙ্গে অবনিবনা যেমন অ-সুখের, মৃত্যুর সময় "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই" এ-উক্তি তেমনি অপরিতোষের। এই দুই অতৃপ্তির মধ্যস্থলে উপস্থাপিত দামিনীর চিত্র নিশ্চয়ই সুখের নয়, কারণ জীবনের প্রারম্ভ ও সমাপ্তিতে সেখানে তৃপ্তির অভাব, আর এই যন্ত্রণা যখন ব্যক্তিত্বের অতিসচেতনতাজাত তখন সে-চিত্র বিদ্রোহের নিশ্চয়ই। সেই বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ দামিনী বাংলা সাহিত্যে অদ্যাপি তুলনারহিত। অবশ্য স্বীকার্য, দামিনীর বিদ্রোহেও রবীন্দ্রনাথের আত্মবিরোধ প্রতিফলিত। আসক্তির দুর্বার আকর্ষণের তীব্রতাকে স্বীকার করা, অথচ আসক্তির বন্ধনের গ্লানিকে সহ্য না করার জন্যই বিবাহের অনতিকাল পরে দামিনীর মৃত্যু ঘটানো প্রয়োজনীয় ছিল ঔপন্যাসিকের। এক্ষেত্রে তত্ত্বপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের প্রেমসম্পর্কিত আদর্শবাদ জয়ী তা বলাই বাহুল্য। তবু বাংলা উপন্যাসের সীমার মধ্যে দামিনীর বিদ্রোহের চিত্র হেলার বস্তু নয়। স্বামীর সঙ্গে দামিনীর মনোমালিন্যের সূত্রপাত লীলানন্দকে কেন্দ্র-ক'রে। স্বামী নিবৃত্তি-মার্গের যাত্রী, দামিনীর বৈষয়িকতার প্রতি আকর্ষণ স্বামীর কাপুরুষতার প্রতিক্রিয়া, ফলে স্বামীর গুরুভক্তি আদায়ের চেষ্টা দামিনীর কাছে অসহ্য এবং "স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।" দামিনীর আবির্ভাব উপন্যাসে এইসময়। গুরুর প্রতি তার অচলা ভক্তি নেই, তাই গুরুর স্নেহ এবং অনুগ্রহ তার কাছে দুর্বিষহ। ফলে পদে পদে বিদ্রোহ ঘোষণা দামিনীর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু শচীশের আবির্ভাবের পর অন্তঃশিলার

মত পরিবর্ত্তনের স্রোত নিঃশব্দে দামিনীর হৃদয়ে কলতান তোলে, তখন দামিনী অন্তরের তাগিদে শচীশের জন্যই গুরুর সান্নিধ্য লাভে উৎসাহী, এবং এ-আকাঙ্ক্ষারই চরম প্রকাশ গুহার অভ্যন্তরে। অথচ শচীশের নিষ্ঠুর পদাঘাতে সে আবার প্রাক্তন বিদ্রোহী দামিনীতে রূপান্তরিত এবং সে-সময় তার অভিমানের অবলম্বন হয় শ্রীবিলাস। যদিচ দামিনীর শচীশের প্রতি এই আপাত ঔদাস্য শচীশের অন্তর-দাহিকা শক্তি। এই দাহনের শেষ অবশ্য দামিনীর শচীশকে গুরুরূপে বরণের মধ্যে এবং নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পর শচীশের কাছে দামিনীর উচ্ছ্বাসে। এরপর সেই বন্ধন কাটাকাটির পালা, এবং শচীশের অন্তর্ধানের পরই শ্রীবিলাস "যে একটা কিছু, দামিনী এতদিন সেকথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই, * * এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা।" কিন্তু শ্রীবিলাসকে গ্রহণ করেই কি সে শান্ত? উত্তর—নঙর্থক, যেহেতু শ্রীবিলাস তার তুলনায় অতি-সাধারণ। দামিনীর ভাববৃত্তে শচীশই প্রধান, কারণ রূপ-অরূপের সংঘর্ষ, উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শচীশ-দামিনী কেন্দ্রিক। এ-সংঘর্ষ উভয়ের আত্মসচেতনতা উত্থিত, যদিও দামিনীর সমস্ত সংগ্রাম অরূপের বিরুদ্ধে জীবনের সজীবতার সন্ধানে, এমনকি শচীশের কাছে আত্মনিবেদনের মধ্যেও রূপের স্পর্শ বর্তমান, অন্তত সেই স্পর্শের আভাস তো নিশ্চয়ই, কারণ এই আত্মদানে বুকের আঘাতের অবদান কম নয়, দামিনীর ভাষায় "এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশ-মণি।" শচীশ দামিনীর আপন সত্তারই প্রতিরূপ। হয়ত শচীশ তার অন্বিষ্ট, হারানো-মূল্যবোধের প্রতীক বলেই সময়

সময় দামিনীর মধ্যে ভক্তির প্রাবল্য কিছু প্রকট, কিন্তু শচীশের উপস্থিতি তার কাছে সাবয়ব ও প্রচণ্ড মূর্ত। শ্রীবিলাসের কথার উত্তরে দামিনীর উক্তি, "আমি যে স্ত্রীজাত—ওই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া, গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্ত্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে," সজাগ মনেরই পরিচয়, যে-মন আইডিয়ায় উদ্দীপ্ত হলেও ভাবালু নয়, বরং মনোযোগের প্রাখর্যে সচেতন। তাই এমন মনের পক্ষেই স্বাভাবিক শচীশের নাগাল পাওয়ার জন্য দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু শচীশ ক্রমেই আত্মসর্বস্ব হতে থাকলে তার চারপাশে নির্মিত চিত্ত-নিরোধের প্রাচীরে দামিনীর আকাঙ্ক্ষার শর প্রতিহত ও প্রত্যাবৃত হতে বাধ্য এবং তখন দামিনীর শ্রীবিলাসের দিকে মুখ তোলা ছাড়া উপায় থাকে না। "চোখের বালি"-তে বিনোদিনীর বিহারীর প্রতি আকর্ষণের উৎস দমদম বাগান-বাড়ির চড়িভাতির ঘটনা। সেই সময় বিহারীর প্রশ্নোত্তরে স্মৃতিচারণায় বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের প্রখর টান অনুভূত, পরবর্তী সময় বিহারীর "মন বুঝিয়াছিল, এ নারী খেলা করিবার মত নহে, ইহাকে উপেক্ষা করা যায় না।" দামিনীর জীবনে অনুরূপ উদাহরণ শ্রীবিলাসের কাছে ছেলেবেলার কথা, পাড়াপড়শির কথা প্রভৃতি স্মৃতিরোমন্থনে পাওয়া যায়। অবশ্য দামিনীর ব্যক্তিত্ব এই স্মৃতিচারণায় প্রথম উদ্বুদ্ধ নয়। শ্রীবিলাসের চোখে দামিনী নিঃসন্দেহে ব্যক্তিত্বময়ী, কিন্তু বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অগাধ শ্রদ্ধা—তেমন শ্রদ্ধার নিদর্শন দামিনীর ক্ষেত্রে প্রায় অস্পষ্ট ও অনুপস্থিত। সেজন্য বিনোদ-বিহারীর কাহিনী ব্যক্তিত্বের আত্মসচেতনতার সংঘর্ষে তীক্ষ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু বিনোদ

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা প্রবল, তাই বিনোদ শেষ অবধি ভিক্টোরিও সুনীতি দ্বারা আক্রান্ত। বিনোদের আত্মসচেতনতায় পরিবেশের দান নেহাৎ স্বল্প নয়, চড়িভাতির ঘটনা ছাড়াও মহেন্দ্রর নির্জীবতা তার আত্মচেতনা জাগ্রত করার সহায়ক ছিল,—সেজন্য তার ব্যক্তিত্বে আবেগের চাপ ও সংস্কারের প্রভাব বেশী কার্যকারী, তাই বিনোদের পক্ষে বিহারীর সঙ্গে (বিনোদ বিধবা বলেই) বিবাহবন্ধন আবদ্ধ হওয়া কল্পনাতীত এবং এইখানেই দামিনীর জিত। বিধবা হয়েও সে সংস্কারমুক্তা, এমনকি গুরুবাদ অস্বীকারের দুঃসাহস চেতনার স্পর্ধায় অর্জিত। তাই দামিনী সময় সময় আত্মসমর্পণের ইচ্ছায় পরাস্ত হলেও দৈবকৃপা লাভের আশায় সমান নির্বিকার। কারণ সে আত্মপরিচয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যগ্র। সেজন্য বিলাসের মত মাঝারি গোছের ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘর বাঁধার সংকল্প সমস্ত দিক থেকেই দামিনীর পক্ষে ট্র্যাজিক। শচীশ দামিনীর আইডিয়া, তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ ও প্রেম, অথচ সেই আইডিয়া মানুষের নাগালের বাইরের জিনিস বলেই এত বেদনা ও যন্ত্রণা। এই ট্র্যাজিডি পরিবেশ বা বহিঃশক্তির ক্রিয়া নয়, দামিনীর অস্তিত্বের মূলেই নিহিত। এর ফলেই সে আত্মসচেতন, তাই আত্মপরিচয় ও আত্মানুসন্ধানের জন্য এত হাহাকার। এবং এইখানেই সে আধুনিক ব্যক্তি, মাত্র নারী নয়। আর এজন্যই সে নিজে বিপন্ন, এবং সমস্ত জীবন (নিজের সত্তার প্রতিরূপ দেখার পর) অতৃপ্তি ও অতুষ্টির দাবানলে প্রজ্জ্বলিত ও হাহাকারে মরুর মত ধূধূ। দামিনীর প্রতীক তাৎপর্য এইখানেই অনুসন্ধেয়, যার অপূর্ব প্রকাশ বিষ্ণু দের অনবদ্য "দামিনী" কবিতায় লভ্য :

সেদিন সমুদ্র ফু'লে ফু'লে হল উন্মুখর মাঘীপূর্ণিমায়
সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল :—মিটিল না সাধ।
পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,
প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,
সেদিন দামিনী সমুদ্রের তীরে।

আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন-পূর্ণিমা,
মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী রাস বা কোজাগরী,
এমন কি অমাবস্যা নিরাকার তোমারই প্রতিমা।

আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বাহু আন্দোলিত দিবস-যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে ॥

ভাববৃত্তের পটে এই দুই আধুনিক নর নারীর মনের রিলিফ-মানচিত্র আঁকা লেখকের উদ্দেশ্য, এবং সেই অঙ্কনকর্মে লেখকের পদ্ধতি রেখা-চিত্র অঙ্কনের সদৃশ, অনেকটা চৈনিক-রীতির নিকটবর্তী। দামিনী স্থির সৌদামিনীতে রূপান্তরিত শচীশের টানেই, এবং শচীশ-ও সেটানে নির্লিপ্ত নয়। দামিনী ও শচীশের নতুন সম্পর্ক মাত্র দুটি চিত্রে প্রকাশিত :

১. শচীশের বসিবার ঘরে চীনামাটির ফলকের উপর লীলানন্দস্বামীর ধ্যানমূর্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল তাহা ভাঙিয়া মেঝের উপরে টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল, তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরও এমন উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা বন্য বিড়ালেরও অসাধ্য।

২. একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, 'পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।' ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।

এই দুই চিত্রে নিঃসন্দেহে শচীশ-দামিনীর অ-ধরা অথচ মূর্ত জটিল সম্পর্কটি পরিস্ফুট, কিন্তু প্রথম চিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনা (বিড়াল) শেষ বাক্যে বিঘ্নিত, বরং দ্বিতীয় চিত্রে দামিনীর মেজের উপর মাথা ঠোকা ও শচীশের ছুটে-পালানোর মধ্যে শরীরের উপস্থিতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই শারীরিক সমস্যা ও শচীশের সংকট উত্তরণের চেষ্টা গুহার দৃশ্যে প্রতীক স্তরে উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব লিপিকুশলতায়:

"সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো— তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল, সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু, তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই—সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে, সে নিঃশব্দে কাঁদে।

ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনোমতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়ত বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিংবা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ্‌ঝপ্‌ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার

হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্ দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া এক দিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া গেল, আর একদিকে মাথা ঠুকিলাম, আর-এক দিকে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়িলাম—সেখানে গুহার ফাটল-চোঁয়ানো জল জমিয়া আছে।

শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল, সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। * * * *

তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। * * * * মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘনঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম। * * * *

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?"

প্রথম অনুচ্ছেদের সেই আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তুটি মানুষেরই জান্তব সত্তা, এবং শেষ অনুচ্ছেদে সেই চাপা

কান্না যে দামিনীর এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই ; আর এ দুই প্রান্তের মধ্যস্থিত শচীশের সংযম ভাঙা এবং সংযম ফিরে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টার ব্যঞ্জনা বিধৃত। কিন্তু এই চিত্রে যে উপমা, চিত্রকল্প ব্যবহৃত, সেই উপমা, চিত্রকল্পগুলি অসংলগ্নরূপে উপস্থাপিত (আদিম জন্তুর পর বাদুড়ের মত পাখির ডানা ঝাপটানো, তার হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা, তারপর গুহার অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে ফেরা, লালাসিক্ত কবলের গ্রাস হওয়া, সাপের মত জন্তুর পা জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি), অথচ অসংলগ্নতাগুলি এক বিশেষ তাৎপর্যে অবশেষে সংহত হওয়ায় সমস্ত চিত্রটি প্রতীকী হয়ে ওঠে, এবং আধুনিক প্রতীকরীতির আত্মীয়স্থানীয় হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রতীকেই অবচেতনার রহস্য-সন্ধানে বিশেষ উৎসাহী, কারণ তাঁদের ধারণা এইসব প্রতীকেই মানুষের অবচেতন মন সহসা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশিত হয়। উপরি-উক্ত চিত্রে কি শচীশের মগ্ন চৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত নয় ? এবং এখানেই রবীন্দ্র-অবলম্বিত পদ্ধতি আধুনিক। প্রতীক ব্যঞ্জনা অবশ্য আরও সার্থক নিম্নলিখিত অংশে :

"চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলোও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি ; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না

আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

কোন্ দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সামনের জলটি একেবারে নীলে নীল। * * * কিছু দূরে চখাচখির দল ভারী গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনীর পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।"

উদ্ধৃতির প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের চিত্র দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত, প্রতীপ দু-টি চিত্র দুই প্রতীপ মনোভাবেরই প্রকাশক। একদিকে দামিনীর ব্যর্থতা, অন্যদিকে শচীশের মনের গভীর প্রশান্তি, অবশ্য শচীশ-দামিনীর পূর্বাপর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মনোভাব দুটি বিচার্য। দামিনীর ব্যর্থতা, কারণ তখন সে তৃষ্ণায় কাতর, কিন্তু সেই তৃষ্ণার দরখাস্ত যার কাছে মেলে ধরা হয়েছে, সে তখন অরূপের রাজ্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত অথবা সেই রাজ্যে প্রস্থানই তার নিয়তি। একদিকে দয়াহীন তপ্ত আকাশ, অন্যদিকে জলটি একেবারে নীলে নীল। কিন্তু এই প্রতীকী ব্যঞ্জনা দামিনী ও শচীশের একটি পরিণতির ব্যঞ্জনাদ্যোতক, সেজন্য প্রথম প্রতীক থেকে সফলভাবে উপস্থাপিত হলেও প্রথম প্রতীকের মত এই চিত্রটির ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী নয়।

এইসব প্রচেষ্টার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমরা এই প্রমাণে সচেষ্ট যে ঔপন্যাসিক তাঁর বিষয়বস্তু ও রূপায়ণ সম্পর্কে অতি সচেতন, যেজন্য পদ্ধতিনির্বাচনে তিনি গতানুগতিকতার নিশ্চিত আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে এক অনিশ্চিত প্রকরণে বক্তব্য রূপায়ণে যত্নবান হন। তাই ভাষার শুদ্ধতা বা বক্তব্য অনুযায়ী ভাষা নির্বাচনে ঔপন্যাসিকের আপ্রাণ প্রয়াস। উপমা, চিত্রকল্প, কখনো কদাচ প্রতীক ব্যবহার তাই "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের বিষয় সমুত্থ-অনিবার্য ফসল, এবং উপন্যাসের ভাষা যে কবিত্বময় তারও কারণ ঔপন্যাসিকের সংক্ষিপ্ত সাংকেতিকতার প্রণালী নির্বাচন। এই সাংকেতিক প্রণালীর জন্যই এক একটি ভাববৃত্তের সমাপ্তি আত্মহননের ঘটনায়। ননীবালার আত্মহত্যা, জগমোহনের মৃত্যু (যদিও প্লেগে জগমোহনের মৃত্যু, তবু এ-মৃত্যু জগমোহনের স্বেচ্ছায় প্রাণহননের সামিল) এবং নবীন-স্ত্রীর বিষপানে ইহলীলা সম্বরণ বহির্ঘটনার দৃষ্টান্ত, কিন্তু মৃত্যুগুলি ইচ্ছামৃত্যু বলেই ঘটনাগুলির সংযোজনায় লেখকের আশ্চর্য সচেতনতার কথা মনে পড়ে। এক-একটি ভাববৃত্ত এক একটি আত্মসচেতন ব্যক্তির মানস-চিত্র, সেই মনের মানচিত্রে এক একটি ছক ভাঙার বিবরণ লিপিবদ্ধ, তাই বিচ্ছেদ-বিন্দুরূপে আত্মহননের ঘটনাগুলি সেই ভাববৃত্তের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশে প্রায় প্রতীকে পরিণত হয়—ননীবালার মৃত্যুতে জগমোহনের ছক, জগমোহনের মৃত্যুতে শচীশের নাস্তিক্য বুদ্ধির ছক, এবং নবীনের স্ত্রীর মৃত্যুতে আশ্রমের ছক সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, যদিও এই ছকগুলির ভাঙা-গড়া মনেরই ব্যাপার, এবং এক একটা ভাববৃত্ত মনের মধ্যে ভেঙে পড়ার পরই আত্মহননের ঘটনা সংযুক্ত। মৃত্যুগুলি এক একটি ছকের প্রান্ত-বিন্দু ব'লে বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে যাওয়ার কৈফিয়ৎ অ-প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

এই অ-প্রয়োজনের জন্যই "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের প্রকরণ পূর্ব-প্রচলিত উপন্যাসের প্রকরণ থেকে পৃথক। আধুনিক উপন্যাসে ভাবের রূপায়ণই মুখ্য, সেজন্য আধুনিক উপন্যাসে ঘটনা বা চরিত্রের চাপ সৃষ্টির চেয়ে মানস পরিমণ্ডল সৃষ্টির আগ্রহ অধিক। সেই নিরিখে "চতুরঙ্গ"-এ অনুসৃত পদ্ধতি নিঃসন্দেহে আধুনিক।

অথচ এই রীতি নির্বাচন এ-ক্ষেত্রে সর্বত্র ও সম্পূর্ণ শুভফল-দায়িনী নয়। আধুনিক উপমা, চিত্রকল্প ও প্রতীক প্রয়োগেও "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের ফলশ্রুতি প্রতীকোৎসারী নয়। গুহার প্রতীকটি বিচ্ছিন্নভাবে অনবদ্য রচনাকৌশলের পরিচয়, কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে এই প্রতীক শচীশের জীবনের রূপকার্থ মাত্র—শচীশের রূপ ও রূপকের দ্বন্দ্বের ভূমিকাস্বরূপ। অথচ সমগ্র উপন্যাসে প্রতীক তাৎপর্যলাভের সম্ভাবনা নেহাৎ কম ছিল না, কারণ "এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত—"।

শচীশ সচেতন, তদুপরি আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রে আপনসত্তা আবিষ্কারের একজন অন্বেষক, অথচ জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর তার বিশ্বাস সংশয়ে সংশয়ে জর্জরিত, কোনও নতুন বন্ধন বা সম্পর্ক স্থাপনে তাই সে এত ভীত, এজন্য দামিনীর সম্পর্কে তার ভয় তুলনারহিত, কারণ দামিনীর আকর্ষণ দুর্নিবার, যে কোনও মুহূর্তে প্রলয়ঙ্করী। ডায়ারিতে অবশ্য সেই আকর্ষণ ও আকর্ষণ-জয়ের যুদ্ধ অনবদ্য ভাষায় প্রকাশিত, কিন্তু এ-প্রকাশ তাৎক্ষণিক। কারণ সবকিছু সম্বন্ধে শচীশের সংশয় তখন রক্ত-মাংসের মত প্রাকৃত, তাই তার অবলম্বন হয় একমাত্র আত্মবিশ্লেষণ ও সেই আত্মবিশ্লেষণেই তার একমাত্র পরিত্রাণ, অথচ মুক্তি সম্পর্কে শচীশের ধারণা অস্পষ্ট, তাই দামিনীকে

অস্বীকার করা তার পক্ষে স্বাভাবিক, যদিচ এ-অস্বীকার তাকে যে-মুক্তির মধ্যে নিয়ে যায়, তা শচীশের অক্ষম দুর্বল মনের পরিচয়। এই দ্বন্দ্বমথিত ক্ষতবিক্ষত আত্মমগ্ন ব্যক্তির আলেখ্য চিত্রণের জন্য প্রয়োজন দুঃসাহসিক অন্তর্মুখীনতায় অভিযান, কারণ যেখানে ঘটনা বা চারিত্র বিবরণমূল নয়, সেখানে চেতন-অবচেতনের আলো-আঁধারি সংলগ্ন-অসংলগ্নের চিত্রেই উদ্ভাসিত হয় আত্মসচেতন ব্যক্তির যন্ত্রণা, বিশেষত যে ব্যক্তির ক্রিয়া-কলাপের সবটাই আত্মগত। জেমস জয়সের "ইউলিসিস" উপন্যাস এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কিন্তু এ-পদ্ধতিতে মনের অতলে ডুব দিয়ে আহৃত রত্ন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রমানসের কাছে সাদর অভ্যর্থনার বিষয় নয়, এবং অতিরিক্ত মনোবিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর অনীহাও ছিল প্রবল, একাধিক পত্র এবং প্রবন্ধ তার দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে আধুনিকতার আবরণহীন অলজ্জ প্রকাশ তাঁর জন্মার্জিত সুরুচির পরিপন্থী, এবং এমন আধুনিকতা সম্পর্কে তার মনোভাব বিরূপ, "আধুনিক কাব্য" প্রবন্ধটি তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

অবশ্য শচীশের শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকরণেও প্রকাশ করা সম্ভব, হয়ত সেই প্রকরণ কিছু ধ্রুপদী, অর্থাৎ শুদ্ধতার প্রতিপক্ষ শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন, কিন্তু এ-পদ্ধতিতেও সামাজিক পটে চরিত্রের সাযুজ্য ও বিযুক্তির প্রশ্নেও বাস্তবের অলজ্জ অসংকোচ প্রকাশের সম্ভাবনা তুচ্ছ নয়। এবং রবীন্দ্র-মানসে এই স্থূল অথচ সত্য প্রকাশের সায় অতি অল্পই, যদিচ দামিনীতে তার ঈষৎ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। টমাস মানের "ম্যাজিক মাউনটেন" বা "ডক্টর ফাউসটুস"-এ এ-পদ্ধতিই নব বিন্যাসে সচেতন চরিত্রের ঘনিষ্ঠতায় দেশ-কালের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে এই

উভয় পদ্ধতি পরিত্যক্ত, অথচ মগ্ন চৈতন্যে স্নান করতে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত নন, সে প্রমাণ তাঁর অনবদ্য অজস্র চিত্রাবলী। বস্তুত, পদ্ধতি নির্বাচনের বিষয়টি রবীন্দ্র-মানস বিচারণারই অন্তর্গত এবং "একথা স্বাজাত্যাভিমানেও না মেনে লাভ নেই যে রবীন্দ্র রচনাবলীতে একটি সবল মার্জিত মনের পরিচয়টাই মুখ্য, সে মনে ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির মর্যাদাই বেশি। কিন্তু এই ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির টান, তাঁর পরবর্তীদের যাই হোক তাঁর কাছে মোটেই একটা অগভীর অভ্যাস ছিল না। এই অমৃতের বিশ্বাস ছিল তাঁর সমগ্র স্বভাবের গভীরে, এই বিশ্বাস তাঁর কাছে একান্ত সত্য ছিল; এতেই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের আর মানসের মহিমা।" (বিষ্ণু দে : এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য, পৃ: ২৪)।

তবু জীবনের অতৃপ্তি ও হাহাকারের প্রতীকব্যঞ্জনায় দামিনী উজ্জ্বল, এবং দামিনীকে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ করানো রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিকতার পরিচয়, দামিনীর যেটুকু দুর্বলতা তা শচীশ চরিত্রের দুর্বলতার প্রভাব ও স্পর্শ, কিন্তু আমরা আশ্বস্ত যে, দামিনীর আলেখ্য চিত্রণ অন্তত লেখকের বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির অভিব্যক্তি। এমন কি আধুনিক যুগের জনবিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সঙ্গে শচীশ সময় সময় তুলনীয়, কারণ সে কেবল আত্ম-বিশ্বে নিজেকে সংলগ্ন ও সন্নিবিষ্ট করার প্রয়াসে যত্নশীল। গোরাও আত্মসচেতন, কিন্তু দেশ ও জনসাধারণের সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপনের চেষ্টাই সেখানে মূল ও মুখ্য। শচীশের তেমন দায় নেই। হয়ত এইজন্য শচীশের আত্মসমর্পণ তত তীব্র তীক্ষ্ণ ট্র্যাজিক নয়, যেহেতু তার বিশ্বে বৃহত্তর সমাজ-পট অনুপস্থিত। শচীশের পরিণতি ট্র্যাজিডির মহৎ স্পর্শে রঞ্জিত না হলেও "চতুরঙ্গ" আত্মসচেতনতার জিজ্ঞাসায়

আত্মপরিচয় লাভের আকুতিতে ও রূপায়ণের বিশিষ্টতায় নিশ্চয়ই স্মরণীয় উপন্যাস, এবং প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ, সে-বিষয়ে দ্বিমত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

খ. প্রতিভার খেয়াল-খুশি :

প্রাচীন ঔপন্যাসিক তত্ত্ব প্রয়োগে "শেষের কবিতা", "দুই বোন", "মালঞ্চ" ও "চার অধ্যায়" পুস্তকচতুষ্টয়ের উপন্যাসত্ব সম্পর্কে সংশয় জাগে। প্রাচীন উপন্যাস-তত্ত্ব অনুযায়ী উপন্যাস অন্তত চারটি উপাদানের (প্লট, চরিত্র, পরিবেশ, সংলাপ) একটি মিশ্র অখণ্ড রচনা, যে-রচনায় গল্পের আদি, মধ্য ও অন্ত্য অধ্যায় সুস্পষ্ট লক্ষিত এবং কাহিনীর উক্ত তিন পর্যায়ের অস্তিত্বে চারিত্রিক বিবর্তনেরও তিনটি স্তরের বিবরণ প্রদান ঔপন্যাসিকের কর্তব্য। এই দুই উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয় সংলাপ ও পরিবেশ। অর্থাৎ উপন্যাসে চরিত্রগুলির জন্ম হয় এবং ধীরে ধীরে শৈশব কৈশোর যৌবন অতিক্রম ক'রে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে সমাপ্তি জীবন বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। কিন্তু "দুইবোন", "মালঞ্চ" প্রভৃতি উপন্যাসে কাহিনী অথবা উপস্থাপিত চরিত্র-গুলির এমন তিন অধ্যায়ের সাক্ষাৎ মেলে না, পাত্র-পাত্রীদের যে-কোন একটি অধ্যায়ে উপস্থিত করা হয় এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি মাত্র সংবাদ হিসাবে পরিবেশিত হয়। "চোখের বালি" উপন্যাসের সঙ্গে শেষ-পর্যায়ের যে-কোনও উপন্যাসের তুলনামূলক বিচারে এ-সিদ্ধান্ত সত্য বলে বিবেচিত। অবশ্য "চোখের বালি" উপন্যাসে ঘটনাবাহুল্য বর্জিত হয়েছে এবং চরিত্রগুলি বহির্ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, আন্তর জীবনের কথাই এ-উপন্যাসের

মূল ও শেষ লক্ষ্য। তবু নায়ক মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ সম্পর্কিত ঘটনা প্রথম অধ্যায়ে জানানো হয়েছে, মহেন্দ্রর অনিচ্ছায় বিনোদিনীর বিবাহ হয় অন্যত্র এবং মহেন্দ্র পরবর্তী সময়ে বিবাহ করে আশাকে। আশা-মহেন্দ্রর বিবাহিত জীবনের মধুর দিনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত, এইসময় আবির্ভাব বিনোদিনীর। বিনোদিনী ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয় মহেন্দ্রর প্রতি, মহেন্দ্রও। এবং এই আকর্ষণের এক পর্যায়ে মহেন্দ্র আবিষ্কার করে বিনোদের প্রতি বিকর্ষণ। অন্যপক্ষে বিনোদিনী আশ্রয় নেয় বিহারীর কাছে, অথচ এ-আত্মসমর্পণ আকস্মিক নয়। লেখক বহু স্থানে তার সূত্র রেখেছেন, যে-সূত্রগুলির উল্লেখ বাহুল্যবোধে বর্জিত হলো। অতঃপর উপন্যাসের পরিণতি আমাদের সকলের জানা। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীরা যে অবস্থায় উপন্যস্ত, সেই সময় থেকে কাহিনীর আদি মধ্য অন্ত্য কোনও পর্বই অ-বিবৃত নয়। এমনকি মহেন্দ্র, আশা, বিনোদিনী, বিহারী, রাজলক্ষ্মী আদি, মধ্য ও অন্ত্য অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে স্পষ্ট। মহেন্দ্র-আশার আদিপর্ব যেমন বর্ণিত, তেমনি মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রথম পর্বটি বিবৃত। এমনকি বিহারী, আশা এবং বিনোদিনী অধ্যায়টিরও আরম্ভ থেকে পরিণতি পর্যন্ত সংবাদরূপে পরিবেষিত হয়নি, পাঠকসম্মুখে অতি ধীরে ধীরে নিপুণভাবে উন্মীলিত হয়েছে। অন্যপক্ষে "দুইবোন" উপন্যাসে শর্মিলার ট্র্যাজিডিই কেন্দ্র-বিন্দু, অথচ শর্মিলার এ-ট্র্যাজিডির সূত্রপাত কোথায় এবং কোন্ অবস্থায়, লেখক শুধু কতকগুলি সূত্র ধরিয়ে নিরস্ত হয়েছেন। শশাঙ্ক স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, অথচ বাণিজ্যিক সাফল্যে স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে সরে গেছেন—এমন ঘটনার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ অথবা বিবর্তন পাঠকসম্মুখে তুলে ধরেন নি লেখক,

মাত্র কয়েক ছত্রের মধ্যে উক্ত ঘটনা বিবৃত করেছেন, এবং এই অবসরে ঊর্মিমালার আবির্ভাব ও শশাঙ্কর জীবনে নব-দিগন্তের সন্ধান সংবাদ হিসেবেই রাখা হয়েছে, অর্থাৎ লেখক পর পর কয়েকটি সংবাদ পরিবেষণ করে (শর্মিলার পূর্বজীবন, ঊর্মিমালা -নীরদ আখ্যান প্রভৃতি) মূল উপপাদ্যে প্রবেশ করেছেন, শুরু হয়েছে উপন্যাস। "চোখের বালি"-তে যেমন প্রতিটি সম্পর্কের আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্যায়ের বিকাশ ও বিবর্তন লক্ষ্য করি, "দুইবোন"-এ তেমন বিবর্তন অবর্তমান, কারণ পাত্র-পাত্রীদের উপন্যস্ত করা হয়েছে এমন এক সময় যখন তারা একটি জটিল ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। শশাঙ্ক-গৃহে ঊর্মিমালার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে এবং উক্ত সমস্যা-অভিমুখেই অতঃপর লেখক ধাবিত হয়েছেন, কিন্তু এই সমস্যা উত্থাপনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চরিত্রগুলির পূর্ব ইতিহাস আলোচিত হয়েছে মাত্র, এবং কোন্ অবস্থায় তাদের নিয়ে আসা হলো উপন্যাসে, তার ভূমিকা ও ভূমি রচিত করা হয়েছে মাত্র।

"মালঞ্চ" উপন্যাসেও সরলার প্রতি নীরজার ঈর্ষা জাগরিত হবার পরই উপন্যাসের মুল কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন লেখক। তৎপূর্বে তিনি নীরজা-আদিত্যর সাংসারিক জীবন, নীরজার অসুস্থতা এবং সেবার জন্য সরলার আগমন সংবাদটি মাত্র জানিয়েছেন। অর্থাৎ এ-উপন্যাসেও নীরজা-আদিত্যপর্বের প্রথম পর্যায় বা সরলা-আদিত্যর আদিপর্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হয় নি। সমস্যা যখন চূড়ায় উঠেছে, নীরজা যখন সরলার প্রতি স্বামী আদিত্যর আকর্ষণ সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত হয়েছে, লেখক তেমন অবস্থা থেকে পরিণতি পর্যন্ত কাহিনীর কিঞ্চিৎ

বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, যে-বিবরণ “চোখের বালি” উপন্যাসে প্রথমাবধি লক্ষিত হয়। “মালঞ্চ”-এ তাই দেখি পাত্র-পাত্রীরা জীবনের একটি সমস্যাসঙ্কুল অধ্যায়ে উপনীত হয়েছে, এবং সেই পর্যায় থেকে পরিণতি পর্যন্ত লেখক তাঁর কাহিনী অংশ নির্বাচিত করে নিয়েছেন। এক কথায় বলা যায়, আদিপর্ব উহ্য রেখে মোটামুটি মধ্য পর্যায়ের শেষপাদ থেকে অন্ত্য অধ্যায় পর্যন্ত উপন্যাসগুলির কাহিনীর সীমা। এমনকি “শেষের কবিতা” পর্যালোচনা করলে দেখি, অমিত-লাবণ্যর প্রণয়-উন্মেষের পরই মূল উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছে, তার আগে অমিত ও লাবণ্য সম্পর্কিত কয়েকটি সূত্র ধরিয়ে লেখক নায়ক-নায়িকাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন এবং দুর্ঘটনা যে অপরিচয়ের বেড়া ভেঙে অনেকদূর নিয়ে গেছে এমন ভূমি প্রস্তুত করেই উপন্যাসের কেন্দ্র-সমস্যায় উপনীত হয়েছেন অর্থাৎ এই উপন্যাসগুলির কোনও পুস্তকেই লেখক চারিত্র বিবর্তন, চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও কাহিনীর আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্যায় প্রাচীন উপন্যাস তত্ত্ব মেনে নিয়ে অগ্রসর হন নি। শশাঙ্ক, শর্মিলা, অমিত, লাবণ্য, নীরজা, আদিত্য, অন্তু অথবা এলা উপন্যাসে যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছে, সেই সময় থেকে শেষ পর্যন্ত অথবা পরিণতিতে পরিবর্তিত হয়ে অন্যমানুষ হয়ে উঠেছে—এমন রূপান্তরের চিত্র অনুপস্থিত এ-সব উপন্যাসে। শর্মিলা, নীরজার ঈর্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, অন্তু-এলার প্রণয়পিপাসা ও অন্যদিকে পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা তীক্ষ্ণ হয়েছে; আমরা শর্মিলা, নীরজা, অন্তু, এলা প্রভৃতিদের প্রাক্তন রূপই প্রত্যক্ষ করি। শুধু সমস্যার উত্তুঙ্গ চূড়ায় চরিত্রগুলির কয়েকটি নতুন দিকের সংবাদ সরবরাহ করেছেন লেখক কোন কোন ক্ষেত্রে।

ফলে প্রচলিত উপন্যাসের চরিত্রের ক্রমবিকাশ, ক্রমবৃদ্ধির সন্ধান করা বর্তমান উপন্যাসগুলিতে নিরর্থক।

উপরি-উক্ত আলোচনায় এই উপন্যাসগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে আমরা সক্ষম, যে-বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচলিত উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

১. পূর্বতন উপন্যাসের চারিত্রিক বিবর্তন, চরিত্রের ক্রমবিকাশ আলোচ্য উপন্যাসে অপরিলক্ষিত। চরিত্রগুলি উপস্থাপিত হয় চরম মুহূর্ত (climax)-এর নিকটবর্তী কোন এক পর্যায়ে, ফলে চরিত্রগুলি বিকশিত অবস্থায় উপনীত হয় উপন্যাসে, তাই চরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখানো এক্ষেত্রে অসম্ভব।

২. উপন্যাসগুলি বিশেষত সমস্যাপ্রধান। সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবার ঝোঁক ও মূলত একটি সমস্যার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা এই সব উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। সেজন্য কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে চরিত্রের কিছু নতুন বৈশিষ্ট্যের আভাস পেতে পারি, কিন্তু ওই আভাসের অতীত চারিত্রিক বর্তুলতা সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৩. কাহিনী এক্ষেত্রে ছুতো মাত্র, চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত-উচ্ছ্রিত সমস্যা প্রকাশের অতি ক্ষীণ অবলম্বন। সেজন্য প্লটের আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই সুস্পষ্ট অধ্যায় অবর্তমান। কাহিনী যে কোনও অধ্যায়ে শুরু হয়, এবং যে কোনও অধ্যায়ে এমনকি সেই অধ্যায়েও শেষ হওয়া বিচিত্র নয়।

৪. এসব উপন্যাসে প্রাচীন-তত্ত্ব অনুসারী চরিত্রের ত্রিমাত্রিকতা বা দ্বিমাত্রিকতা প্রভৃতির অনুসন্ধান পণ্ডশ্রম। বরং নাটক ও চলচ্চিত্র শিল্পের কয়েকটি পদ গ্রহণ করলে উপন্যাসগুলির প্রতি সুবিচার করা হয়।*

এইসব নতুনত্ব সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই রবীন্দ্রনাথের শেষ চারটি উপন্যাস মহৎ প্রতিভার খেয়াল-খুশির খেলামাত্র।

*এ প্রসঙ্গে মল্লিখিত "রবীন্দ্র-ঐতিহ্য ও নতুন উপন্যাসতত্ত্ব" (পরিচয়, বৈশাখ ১৩৬৬) ও "রবীন্দ্র-উপন্যাস, শেষপর্যায় : শেষের কবিতা" (অগ্রণী) প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য।

আখ্যান ভঙ্গী

পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় মহৎ উপন্যাস প্রথমপুরুষে রচিত; প্রথমপুরুষ অর্থাৎ যে-প্রণালীতে লেখক সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী এবং সর্বচারী। কাব্য বা নাটক থেকে উপন্যাসের ক্ষেত্র বহু ব্যাপ্ত অথবা বিশাল জীবনের প্রতিটি সূক্ষ্ম বা স্থূল স্তর রূপায়ণ ঔপন্যাসিকের অনন্য লক্ষ্য বলেই ঈশ্বরের (?) মত তাঁর দৃষ্টি ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে বাধ্য; অন্যদিকে সামাজিক প্রাকৃতিক পটভূমিকায় প্রসারিত জীবনসামগ্র্য সন্ধানে এ-প্রণালী বিশেষ কার্যকরী, যেহেতু জীবনের বিরাট ছবি কোন সংকীর্ণ বা নির্দিষ্ট পটে ধরা অতি কষ্টকর ও প্রায় অসাধ্য। কিন্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত দৃষ্টির জন্য পাত্র-পাত্রীর অন্তরঙ্গ চিত্র বহুসময় গভীরতায় উদ্ভাসিত হয় না। এই অন্তরঙ্গ পরিমণ্ডলের আন্তরিক চিত্রণের অক্ষমতা এ-প্রণালীর সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই, ফলে ঔপন্যাসিক এ-বিষয়ে অতৃপ্ত থাকেন, তাই অতৃপ্তি নিরসনের জন্য লেখক এক নায়ক কেন্দ্রিক কাহিনী রচনায় মনোযোগী হন। পাঠক তখন সেই চরিত্রের আলোকে সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন ব'লে সেই চরিত্রের সঙ্গে তার আত্মীয়তা স্থাপন অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। উপরি-উক্ত বহিরঙ্গ প্রণালী উপন্যাসের সর্বগ্রাসী ও সবার্থসাধক ভূমিকা প্রকাশে বহুলাংশে সহায়ক হলেও পাঠক বর্ণিত চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপ ও মানসিক অবস্থার বিবরণে চরিত্রের সঙ্গে নিজের সাযুজ্য স্থাপনে উন্মুখ হন, সময় সময় এই উন্মুখতায় পাঠক চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতেও

ইচ্ছুক ; ঔপন্যাসিক তখন নিজের তাগিদে পাঠকের এ-বাসনা পূরণে যত্নবান হন, তখন তাঁর অনুসৃত প্রণালী আখ্যানের উত্তম-পুরুষে বিবৃতি। এ-প্রণালী নিঃসন্দেহে অন্তরঙ্গ, কারণ "আমি" এস্থলে বক্তা এবং বিবরণ প্রদানকারী, ফলে বক্তার বিবরণ আবেগে উচ্ছ্বাসে উষ্ণ এবং প্রতিটি মুহূর্ত ব্যক্তিক স্পর্শে অন্তরঙ্গ ও নিবিড় হয়। অন্যদিকে বাস্তবে সংঘটিত নানা অসংলগ্ন ঘটনা বা বিশৃঙ্খলা উত্তমপুরুষে সহজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়, এমন কি অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের ধারণা বক্তার মাধ্যমে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। উত্তমপুরুষে আখ্যান একটি ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত ব'লে অভিজ্ঞতার আত্মমুখীনতা প্রাধান্য পায়, কারণ এই "আমি"-র আত্মজ্ঞান কিছু প্রবল ও তীক্ষ্ণ, সেজন্য চরিত্রের আবেগ, উচ্ছ্বাস, সুখ-দুঃখের অভিব্যক্তি, অনুভূতি পাঠককে স্পর্শ করে অনায়াসে। হয়ত অন্যের আত্মজীবনী পাঠ কৌতূহলের বিষয়, এবং আত্মজীবনী অন্তরঙ্গ জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। উত্তমপুরুষে রচিত উপন্যাস আত্ম-জীবনীর নিকট আত্মীয়, অথচ উপন্যাস বলেই এ-প্রণালী আত্মজীবনীর ত্রুটি সংশোধন ক'রে সজীবতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা" উত্তমপুরুষে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের বক্ত্রী ইন্দিরা এবং সমস্ত ঘটনাই ইন্দিরার মাধ্যমে বর্ণিত। ইন্দিরার শ্বশুরালয় গমনের উদ্যোগ, পথে দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠনে ভাগ্যবিপর্যয়, বিপর্যস্ত ভাগ্যসহ কলকাতা আগমন এবং নানা বাধা বিঘ্নের পর অবশেষে স্বামীসান্নিধ্য লাভ "ইন্দিরা"-র মূল উপজীব্য। ঘটনা বিশেষ বাহুল্য বর্জিত, ঘটনাস্রোত একটানা সহজ সরল। উত্তমপুরুষে রচিত উপন্যাসে কাহিনীর ভাব ও ভাষায় বক্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকা বাঞ্ছনীয়, অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য কথকের বিদ্যাবুদ্ধি

সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা অবস্থান অনুসারী হওয়া উচিত, নচেৎ অন্তরঙ্গ চিত্র অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। ইন্দিরা নারী, সপ্রতিভ নারী; অতএব উপন্যাসের পরিমণ্ডল নারীর দৃষ্টিতে দেখা বিশেষ জগৎ হওয়া স্বাভাবিক। এবং বঙ্কিমচন্দ্র এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সহজে। ইন্দিরার বলার ভঙ্গী সহজ, সরল এবং অকপট। হয়ত বুদ্ধির মারপ্যাঁচ বা কসরৎ অনুপস্থিত বলেই সমস্ত উপন্যাসে, লেখকের স্থানে স্থানে অবতরণ সত্ত্বেও আবহাওয়াটি স্বচ্ছন্দ ও লঘুচপল, এবং এই চাপল্য, ঈষৎ পরিহাসের স্পর্শ ইন্দিরার চরিত্রে প্রায় সহজাত। শ্বশুরালয়ে প্রথম স্বামী-সন্দর্শনে যাওয়ার প্রাক্‌কালে বা যাওয়ার সময় নারীর হৃদয়ে আনন্দ ও সুখের উদয় স্বাভাবিক, সেই সুখ ও আনন্দের ফলে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতা বা চটুলতা দূষণীয় নয়, বরং সেক্ষেত্রে লঘুতা বা চাপল্য সজীবত্বের লক্ষণ। নায়িকার আত্মকথন এমন মুহূর্ত থেকে শুরু হয় ব'লে সমগ্র উপন্যাসে ইন্দিরার বিবরণে সপ্রতিভ ভাবটি সর্বদাই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত, সেজন্য ইন্দিরার জগৎ একান্ত নারীর জগৎ হয়ে ওঠে লেখকের বিশেষ আয়াস ব্যতিরেকে, এবং প্রথমদিকে, অন্তত কলকাতা পৌঁছুনো পর্যন্ত, ইন্দিরার বিবৃতিতে লেখকের হস্তক্ষেপের চিহ্ন অবর্তমান, তাই নারীর বিশেষ মনোভঙ্গী স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ং-প্রকাশিত। স্বামীসঙ্গসুখবঞ্চিতা ইন্দিরার মা-বাবার প্রতি অভিমান ও দু-একটি ইঙ্গিতে সেই অভিমানের প্রকাশ, পতিগৃহে যাত্রাকালে ইন্দিরার চিত্তচাঞ্চল্য, দস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েও সধবা নারীর হাত খালি না-রাখার চেষ্টা, গঙ্গা দেখে আহ্লাদ, অমলা-নির্মলার গান ও সেই গান শোনার জন্য বসুজপত্নীর বিরক্তি ইত্যাদির বর্ণনা একমাত্র নারীর পক্ষেই স্বাভাবিক। কলকাতায় বৃদ্ধ রামরামবাবুর গৃহে "কালির বোতলের" সোমত্ত মেয়েকে

পরিচারিকারূপে নিয়োগে আপত্তি, সুভাষিণীর শাশুড়ীকে তরুণী সাজাবার ফন্দী, রান্নাঘরের দু-চারটে ছোটোখাটো কৌতুকময় ঘটনা, ইন্দিরাকে ফুলের সাজে সাজানোর ঘটনা, সুভাষিণীর কাছে ইন্দিরার পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি আরও অনেক বর্ণনায় সেই বিশিষ্ট নারীমনের স্পর্শ লভ্য, এবং সমস্ত বিবরণে ইন্দিরার লঘুভাব চিত্রটিকে সজীব করে তোলে। ইন্দিরার জগৎ একান্ত নিজস্ব, উপন্যাসে সেই জগৎ অত্যন্ত আন্তরিকতায় ও নিবিড়তায় সংসিক্ত। হয়ত এই জন্য পুরুষচরিত্রগুলি (কৃষ্ণদাস বসু, রাম-রামবাবু, রমণবাবু, উপেন্দ্র) নারী চরিত্র অপেক্ষা অনুজ্জ্বল ও বর্ণহীন। স্বামীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল বলেই ইন্দিরার মনোবৃত্তটি সংকীর্ণ, তার জগৎ সম্পূর্ণ পারিবারিক এবং কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক। এই নির্দিষ্ট বৃত্তের জন্যও ইন্দিরার বিবরণ অন্তরঙ্গ। সেজন্য স্বামীকে বশ করার সময় উপেন্দ্রর কুসংস্কারের সুযোগ গ্রহণ ইন্দিরার পক্ষে স্বাভাবিক, যদিও এ-ঘটনায় উপেন্দ্রর চরিত্র অঙ্কনে লেখকের পক্ষপাতের চিহ্নই প্রকট। তবু ইন্দিরার বিবরণ সহানুভূতি ও অনুকম্পা বর্জিত নয়, কিন্তু কয়েকটি বিষয় অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ইন্দিরার মত সপ্রতিভ নারীর পক্ষে জিলার বা ডাকঘরের নাম না জানা বিস্ময়ের। এছাড়া, একই গৃহে মক্কেলরূপে ইন্দিরার স্বামীর আবির্ভাব এবং পাচিকার সঙ্গে তার প্রণয়—অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব। এমনকি উপেন্দ্রর ইন্দিরাকে বিদ্যাধরীরূপে স্বীকার করা আশ্চর্যের বিষয়। সময় সময় অবশ্য লেখক স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ইন্দিরার মুখে দার্শনিকতা আরোপ করেন, সেজন্য উপন্যাসটির অন্তরঙ্গ পরিমণ্ডল বিঘ্নিত হয়। তবু "ইন্দিরা"-য় কোনও তত্ত্বপ্রতিপাদনের চেষ্টা নেই, একটি সপ্রতিভ নারীর স্বামী ফিরে পাওয়ার কাহিনী সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিবরণ

না হয়ে ইন্দিরার কাহিনী হয়ে ওঠে এবং এইখানে উত্তমপুরুষ পদ্ধতি গ্রহণের সার্থকতা।

"শ্রীকান্ত" আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হলেও উপন্যাসটির রচনা-পদ্ধতি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। "ইন্দিরা"-য় ইন্দিরা বক্ত্রী যদিও, তবু সে উপন্যাসের একটি চরিত্র-ও বটে এবং উপন্যাসে তার ভূমিকা সক্রিয়। কিন্তু "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের প্রথম দুই পর্বে শ্রীকান্ত কাহিনীর বক্তা হলেও সে নিজেকে নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত নয়। "এই আত্মচরিত-লেখক নিজেকে একটা চরিত্ররূপে খাড়া করিবার কোন সজ্ঞান চেষ্টা করে নাই, নিজের সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র মমতা বোধ নাই—* * * এই কাহিনীও তাহার নিজের কাহিনী ততটা নয়, যতটা অপরাপর কয়েকজন নর-নারীর, অতএব তাহার দৃষ্টি মুখ্যতঃ নিজের দিকে নয়।" (শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৩৪৩)। মোহিতলাল মজুমদারের এই উক্তি "শ্রীকান্ত"-র প্রথম দুই পর্ব সম্পর্কে যথার্থ। এর কারণ শরৎচন্দ্রের প্রারম্ভিক পরিকল্পনা ছিল শ্রীকান্তর ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করা, এবং ভ্রমণকাহিনীতে নিজের চেয়ে অন্যবিষয় এবং অন্যচরিত্র সম্পর্কে কৌতূহল বেশী হওয়াই স্বাভাবিক, সেজন্য শ্রীকান্তর মানসিক বিবর্তনের আলেখ্যর চেয়ে ভ্রাম্যমান শ্রীকান্তর সংস্পর্শে আসা চরিত্র ও ঘটনাবলীই মুখ্য ও প্রধান হয়ে ওঠে। ভ্রমণকারীর দৃষ্টি কৌতূহলের, হয়ত সেই দৃষ্টি আন্তরিকও; কিন্তু ভ্রমণকাহিনীতে বিবৃত নানা ঘটনা বা সংস্থান বা চরিত্রের মধ্যে পূর্বাপর যোগসূত্র থাকবেই—এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না, যেহেতু সেখানে বক্তার চারিত্রিক বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ধারা তুলে ধরা লেখকের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। আর এইখানেই উপন্যাসের "আমি"-র সঙ্গে ভ্রমণকারী "আমি"-র পার্থক্য। "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের সূচনা

শ্রীকান্তর বাল্যজীবন বর্ণনা থেকে, অতএব আশা করা যায় বক্তা আমি-র বিবরণে শ্রীকান্তর চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব উন্মেষের স্তরগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, কারণ বিবৃত ঘটনাগুলির মধ্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়ত্ব নিহিত। উপন্যাসের মূল উপজীব্য রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর প্রণয়-উপাখ্যান, এই উপাখ্যানের সূত্রপাত প্রথম পর্বের অষ্টম পরিচ্ছেদে। অথচ এর আগে শ্রীকান্তর বাল্যজীবনের বর্ণিত বিবরণে ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির ভূমিকা প্রধান এবং স্বল্প পরিসরে ইন্দ্রনাথ-অন্নদাদিদির উপাখ্যান স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে ইন্দ্রনাথ বা অন্নদাদিদির কাহিনী সংযোগহীন। এমনকি শ্রীকান্তর উপর এই দুই চরিত্রের প্রভাব প্রায় শূন্য, যদিও অন্নদাদিদির কথা শ্রীকান্তর মানসপটে মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, তবু তা স্মৃতি রোমন্থনের উর্ধ্বে স্থিত নয়। সেজন্য শ্রীকান্তর চরিত্র বিকাশে অন্নদাদিদির ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ পিয়ারীবাইজির সঙ্গে সাক্ষাতের পরের কাহিনীর সঙ্গে পূর্বের কাহিনী সংযোগহীন ও বিচ্ছিন্ন। এমন সংযোগহীন অথচ উজ্জ্বল বহু উপাখ্যান দ্বিতীয় পর্বেও লভ্য, যেমন—নন্দমিস্ত্রী-টগর উপাখ্যান, মনোহর চক্রবর্তী ও ঠাকুর্দার হোটেলসংক্রান্ত ঘটনা, জাহাজে অভয়ার সাক্ষাৎ এবং পরবর্তীসময় অভয়া-রোহিণী উপাখ্যান। উপাখ্যানগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। চলমান চিত্র হিসাবে উপাখ্যানগুলি উপভোগ্য, কিন্তু ভ্রাম্যমানের জীবন উপন্যাসের বিষয় হলে শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণদানই যথেষ্ট নয়, ওই ঘটনাগুলির তাৎপর্য এবং নায়কের জীবনে সেগুলির গুরুত্ব কতখানি সেই অর্থ পরিস্ফুট করা অপরিহার্য। "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের প্রথম দুই পর্বে নানাধরণের চিত্র সন্নিবেশিত, কিন্তু সেই চিত্রগুলি বিচ্ছিন্ন এবং কোনও অখণ্ড ঐক্যে গ্রথিত নয়, এই

চিত্ররচনার পশ্চাতে লেখকের ঔপন্যাসিক পরিকল্পনা কার্যকরী নয় ব'লে প্রথম দুই পর্ব উপন্যাস-মর্যাদালাভে বঞ্চিত, তাই প্রথম পর্বের পিয়ারীবাইজির কাহিনী সময় সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ উপাখ্যান বলে মনে হয়। আসলে "শ্রীকান্ত"-র প্রথম দুই পর্বের "আমি" উপন্যাসের "আমি" নয়, ভ্রমণকাহিনীর লেখক "আমি": সেজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের বহু ঘটনা উপন্যাসের মূল কাহিনী বা নায়ক-নায়িকার চারিত্র্যবিবর্তনের ক্ষেত্রে অবান্তর ও তাৎপর্যহীন। উত্তমপুরুষে রচিত উপন্যাসে বহু এলোমেলো ঘটনা বা কাহিনী "আমি"-র মাধ্যমে গ্রথিত ও সুসংলগ্ন হয়, কিন্তু গ্রন্থন ও সংলগ্নতা উপন্যাসের ঘটনা বা চরিত্র বিকাশের নিয়মেই সম্ভব হয়, এবং এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা চরিত্র বক্তার স্বকীয়ত্ব বা স্বরূপ প্রকাশেরই পরিপোষক। কিন্তু আলোচ্য দুই পর্বে বর্ণিত ঘটনা বা চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা নায়কের বিবর্তন বা রূপান্তর কিছুই লক্ষ্য করি না, এ-সব ঘটনা যেন ভ্রাম্যমানের কৌতূহলী দৃষ্টি, তাই প্রথম দুই পর্বে উত্তমপুরুষের ব্যবহার উপন্যাসোচিত নয়।

অথচ তৃতীয় পর্ব থেকে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের দ্রষ্টা-চরিত্র পরিবর্তন করে তাকে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্রে রূপান্তরে প্রয়াসী হয়েছেন, সেজন্য এ-পর্বে রাজলক্ষী-শ্রীকান্তর কাহিনী-ই লেখকের মূল উপজীব্য। পূর্বের দুটি পর্বে কাহিনীর দ্রুত গতি তৃতীয় পর্বে অতি ধীর ও মন্থর। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তর প্রণয়ে নানা জটিলতার গ্রন্থিবন্ধন বা গ্রন্থিমোচনে সেই অহেতুক ব্যস্ততা নেই। অবান্তর ঘটনা কিছু কিছু থাকলেও সেই সব ঘটনা প্রণয়-উপাখ্যানের সঙ্গে কোনও-না-কোনো ভাবে যুক্ত, অর্থাৎ এ-পর্বে কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাস-কাহিনীর ধারাবাহিকতার

অনুরূপ, তাই নানা অসংলগ্ন ঘটনা এই পর্বে মূল কাহিনীর সঙ্গে জড়িত, এবং মূল কাহিনীকে সমৃদ্ধ করার জন্য এসব ঘটনা প্রয়োজনীয়। কিন্তু চতুর্থ পর্বে তৃতীয় পর্বের কাহিনীর কি কোনও প্রভাব বিদ্যমান? চতুর্থ পর্বে কমললতা ও গহরের জীবন শ্রীকান্তর জীবনে একটি পরিবর্তন আনার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পরিবর্তনের ফলে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর সম্পর্কের নব মূল্যায়ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তর সম্পর্ক স্পষ্ট অঙ্কিত হওয়া উচিত। তৃতীয় পর্ব সেই হিসাবে চতুর্থ পর্বের ভূমিকা, এবং তৃতীয় পর্ব উহ্য থাকলে চতুর্থ পর্বের অনেক কিছু অর্থহীন হয়ে পড়ে। বস্তুত "শ্রীকান্ত" তৃতীয় পর্ব থেকে উপন্যাসের আদর্শানুসারে লিখিত, এবং রাজলক্ষ্মী কমললতা, শ্রীকান্তর জীবনের নানা দ্বন্দ্ব জটিলতা তৃতীয়-চতুর্থ পর্বে উপন্যাস নামের যোগ্য। অথচ চারপর্বে একত্রিত "শ্রীকান্ত" না আত্মজীবনী, না ভ্রমণকাহিনী, না উপন্যাস। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, "ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে কিনা, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়, উপন্যাসের নিবিড় ঐক্য ইহার নাই, ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি", (বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ২২৯) এ-প্রসঙ্গে যথার্থ বলে মনে হয়। এর কারণ গ্রন্থের সূচনায় লেখকের পরিকল্পনার অভাব, ফলে "শ্রীকান্ত" দ্বিধাবিভক্ত। প্রথম দুই পর্ব ভ্রমণকাহিনীর "আমি" দ্বারা লিখিত, শেষ দুই পর্বের "আমি" উপন্যাসের "আমি", সেজন্য "শ্রীকান্ত" উপন্যাস হিসাবে সার্থক নয়।

"চতুরঙ্গ" উপন্যাসের বক্তা শ্রীবিলাস, কিন্তু ইন্দিরা বা শ্রীকান্তর মত "আমি" শ্রীবিলাস নয়; এই বক্তা একই সঙ্গে জ্যাঠামশায়,

শচীশ, দামিনী কাহিনীর নিরাসক্ত কথক এবং কাহিনীর একটি চরিত্র-ও বটে। জ্যাঠামশায় অধ্যায়ে এবং শচীশ-দামিনীর জটিল সম্পর্কের বিবরণদানে শ্রীবিলাস সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মতই নৈর্ব্যক্তিক এবং নিরাসক্ত ; অথচ শচীশ-দামিনীর মানসিক গ্রন্থিবন্ধন ও গ্রন্থিমোচনে তার ভূমিকা নগণ্য নয়, যদিও শ্রীবিলাস উভয়ের আত্মগত অভিনয়ে নিতান্ত গৌণ, বরং উপলক্ষ্য বলাই শ্রেয়। তবু শচীশ-দামিনীর কাহিনীতে শ্রীবিলাসের উপস্থিতি অনিবার্য, যেহেতু সম্পর্কের তীব্র ও তীক্ষ্ণ মুহূর্তে শ্রীবিলাস মঞ্চের আবহসঙ্গীতের মত ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। শ্রীবিলাস দামিনী-শচীশের অনেক ঘটনার সাক্ষী, এবং আখ্যান বিবৃতির সময় বিচারকের মত নিরপেক্ষ ; অন্যদিকে তার ভূমিকাও নিষ্ক্রিয় নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শ্রীবিলাসের মধ্যে লেখক "আমি" ও বক্তা "আমি"কে মিশিয়ে নতুন "আমি"-র সৃষ্টি করেন, যে "আমি" উপন্যাসের সামগ্রিক বিচারে নৈর্ব্যক্তিক "আমি", যার নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা মোহ বা বিভ্রম নেই। শ্রীবিলাস নৈর্ব্যক্তিক হলেও সংবেদনশীল, তাই সে শচীশ-দামিনীর কাহিনী যথাসম্ভব আন্তরিকভাবে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট। এক ভাববৃত্ত পরিক্রমান্তে আর এক ভাববৃত্ত শ্রীবিলাসের বর্ণনীয় ব'লে ঔপন্যাসিক শ্রীবিলাসকে যে বিশেষ "আমি"-তে পরিণত করেন—তা আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীর বিবৃতির পক্ষে উপযুক্ত ভঙ্গী ! উত্তমপুরুষ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লেখক সচেতন, তাই কয়েকটি ক্ষেত্রে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে এবং এক স্থানে ডাইরীর সাহায্য নিয়ে শ্রীবিলাস উভয়ের চরিত্র ও কাহিনীর শূন্যস্থান পূরণ করে। কিন্তু এই নিরাসক্তি ও নিরপেক্ষতার মধ্যে শ্রীবিলাসের চরিত্র কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ও অবিকশিত ব'লে মনে হয়, তার বলার ভঙ্গীর মধ্যে তর-তম লক্ষ্য করা দুষ্কর। সে

বরাসনে বসেও যেন কথকের কুশাসনে চির অধিষ্ঠিত। এমনকি দামিনীর সঙ্গে বিবাহের প্রত্যাশিত সৌভাগ্যেও তার নির্বিকারত্ব অক্ষুণ্ণ এবং এ-সময়ও তার কণ্ঠস্বর ও বাগ্‌ভঙ্গী সমান ও পূর্বের ন্যায় অকম্পিত। বিলাসের এই নির্বিকারত্ব এক্ষেত্রে গুণ-ই, কারণ সে যে-ভূমিকায় অবতীর্ণ সে-ভূমিকায় এমন পুরুষেরই প্রয়োজন এবং ঘটনার স্বল্পতা হেতু লেখক যে সাংকেতিকতার আশ্রয় নিয়েছেন, সেই সাংকেতিকতা পরিস্ফুট করার জন্য শ্রীবিলাসই উপযুক্ত কথক।

॥ ২ ॥

বক্তা অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে লিপিবদ্ধ করলেও এবং "আমি" ব্যতীত অন্য চরিত্রের মানসিক চিত্র বহুলাংশে বাইরের আচার-আচরণে প্রকাশিত হলেও অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কে বক্তার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। এবং যে-চিত্র উপস্থাপিত, সে-চিত্রেও বক্তার ভাল-মন্দ লাগার স্পর্শ থাকা অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, এস্থলে বক্তা একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাই বক্তার চরিত্র তারই বিবরণের উপর একান্ত নির্ভরশীল, এবং নিজের সম্পর্কে যথেষ্ট নিরাসক্ত নিরপেক্ষ না হলে বক্তার চরিত্রে অতিরঞ্জনের স্পর্শ লাগার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা ও অপরের সেই চরিত্র সম্পর্কে ধারণা যুক্ত হলে চরিত্রটির সমগ্র পরিচয় উদ্ভাসিত হয় পাঠক সম্মুখে। এক্ষেত্রে লেখকের নির্বাচিত প্রণালী একাধিক পাত্র-পাত্রীর জবানবন্দী মারফৎ কাহিনী, ঘটনার বিবৃতি। "এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভালো লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত

করা হয়।" (রজনী, বিজ্ঞাপন)। এ-ছাড়া, একই বক্তাকে তার নিজের জবানী ছাড়া অন্য বক্তার আলোকেও দেখা সম্ভব। অন্য দিকে যে-অংশে যার ভূমিকা সক্রিয়, সেই অংশ উক্ত চরিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হলে চিত্রটি সজীব ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, এবং উপন্যস্ত পাত্র-পাত্রী সকলেই নিজের ও অপরের আলোকে উদ্ভাসিত হয় ব'লে একজন বক্তার চেয়ে এ-প্রণালীতে চরিত্রের সামগ্রিক পরিচয়লাভ পাঠকের পক্ষে সহজ হয়। লেখকের ভূমিকা এ-পদ্ধতিতে অনেকটা সম্পাদকের মত, বিভিন্ন বক্তার বিবরণ সু-সম্পাদিত বা সংকলিত করাই তাঁর একমাত্র কাজ। কিন্তু এই সম্পাদনার কাজ সহজ নয়, কারণ একই ঘটনা বা সেই ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন বক্তা পেশ করলে পুনরুক্তিদোষের আশঙ্কা থাকে, তার ফলে কাহিনীর গতি মন্থর ও কাহিনীর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয়। এ-ছাড়া এক বক্তা কাহিনীর যে-পর্যায়ে (কাহিনীর বর্তমান মুহূর্তে বা ঘটনা ঘ'টে যাওয়ার পর) বিবরণ শুরু করেন, অন্যান্য বক্তার সেই ক্রম মেনে না চললে অনাসৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল, সেজন্য লেখক এ-ব্যাপারে সজাগ ও মনস্ক থাকতে বাধ্য। একজন বক্তার মাধ্যমে বিবরণ প্রদানের প্রণালীর চেয়ে এ-প্রণালীতে তাই লেখকের তীক্ষ্ণ প্রহরার ও সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন বেশী, এমনকি বিভিন্ন বক্তার বিবরণে ভাষার তর-তমভেদ বা ভাষার সাম্য-স্থাপনও ঔপন্যাসিকের দায়িত্বের অন্তর্গত। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" উপন্যাস উপরি-উক্ত রীতিতে রচিত বাংলাসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের বক্তা যথাক্রমে রজনী, অমরনাথ ও শচীন্দ্রনাথ। চতুর্থ খণ্ডে সকল বক্তারই কথা লিপিবদ্ধ, এবং এই খণ্ডে লবঙ্গলতার কথা সর্বপ্রথমে বিবৃত। পঞ্চম খণ্ডে অমরনাথের জবানবন্দীর মধ্যে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

প্রতিবক্তার বিবরণ পূর্বে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা, যেন স্মৃতির সাহায্যে প্রতি চরিত্র তাদের অতীত ঘটনার ছিন্নসূত্রগুলি গ্রন্থনে তৎপর। অবশ্য সঠিক অর্থে স্মৃতিচারণ নয়, কারণ স্মৃতিচারণে বহির্ঘটনার বর্ণনার চেয়ে অভিজ্ঞতার অন্তর্মুখীন প্রসঙ্গের বিবরণই মুখ্য, যা উপন্যাসে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি নামে পরিচিত। (এ-প্রসঙ্গে বাংলা উপন্যাসের নবপর্যায় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। "রজনী" উপন্যাসে রজনীর জীবনকাহিনীই ঔপন্যাসিকের উপজীব্য, এবং এক-একজন বক্তার বিবরণে তাই রজনীর জীবনী স্পষ্ট ও উজ্জ্বল রূপে পাঠক সম্মুখে উন্মোচিত হয়। যদিও এ-উপন্যাসে দুটি কাহিনী বর্তমান—একটি রজনীর, দ্বিতীয়টি লবঙ্গলতার কিন্তু উভয় কাহিনী অবিচ্ছেদ্য রূপে গ্রথিত এবং রজনী-কাহিনীর বৃত্ত সম্পূর্ণ করার জন্যই লবঙ্গ-কাহিনীর অবতারণা। সমগ্র উপন্যাসে ঘটনার স্রোত প্রবল, অথচ কোন ঘটনাই পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়। পুনরুক্তিদোষ মুক্ত হওয়া, অন্তত এমন ঘটনাময় উপন্যাসে, বঙ্কিমের দক্ষতার পরিচয়। একজন বক্তার কাহিনী শেষ হওয়ার পর অন্য বক্তার পালা আরম্ভ হওয়ায় একই ঘটনা বারংবার উল্লিখিত হয় নি, এজন্য বিভিন্ন বক্তার মধ্যে সমগ্র আখ্যানের সুপরিকল্পিত বণ্টন লেখকের কৃতিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্যতা এক্ষেত্রে সংশয়াতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। রজনীর কথা শেষ হওয়ার পর অমরনাথের পালা এবং অমরনাথের কথা আরম্ভ হয় লবঙ্গলতার বিষয় উল্লেখে, ফলে কাহিনী সরল রেখায় প্রবাহিত না হয়ে জটিল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শচীন্দ্রনাথের বক্তৃতা তার বিপর্যয়ের সূচনায় আরম্ভ, অর্থাৎ যে-পাত্র বা পাত্রী যে-অংশে প্রধান, সেই-অংশটির কথক সে নিজেই, সেজন্য বিবরণগুলি অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক, "রজনীর গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জনের পর ঠিক তাহার উদ্ধারকর্তা

অমরনাথের উক্তির আরম্ভ, আবার অমরনাথের দ্বারা রজনীর বিষয়-উদ্ধারের উপায় স্থিরীকৃত হইবার অব্যবহিত পরেই শচীন্দ্রকে বক্তা করা হইয়াছে। রজনীকে পুনর্বার পাওয়ার পর শচীন্দ্রের সহিত তাহার মাতা-পিতার পরিবর্তিত আচরণ ও তাহার সম্পত্তি উদ্ধারের কাহিনী শচীন্দ্রের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। তারপর শচীন্দ্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রজনীকে বধূ করিতে কৃতসংকল্পা লবঙ্গলতার উক্তি আরম্ভ ও রজনীকে লইয়া অমরনাথের সহিত তাহার চাতুর্য প্রতিযোগিতা।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ১০১)।

কিন্তু "রজনী" সম্পর্কে অভিযোগ প্রধানত উপন্যাসটির ভাষা-সংক্রান্ত। রজনীর সমগ্র জীবনে বিষাদ ও দুঃখের হাহাকার অনুভূত হলেও কানাফুলওয়ালির পক্ষে ঐ ভাষা ব্যবহার সম্ভব কিনা প্রশ্নাতীত নয়। এমনকি লবঙ্গলতার সুচারু ভাষণও আমাদের সন্দেহযুক্ত প্রশ্নের সীমায় অবস্থিত। মনে হয়, রজনী ও লবঙ্গর বকলমে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই কথক, এবং যা উপন্যাসটির পক্ষে ক্ষতিকর নিঃসন্দেহে কারণ ভাষাপ্রয়োগের তর-তমের মধ্যেই চিত্রের বিশ্বাস্যতা নির্ভরশীল এক্ষেত্রে, যেহেতু উত্তমপুরুষে বক্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এই ভাষাতেই বিধৃত। অমরনাথ বা শচীন্দ্রর মুখে লেখকের ভাষা মানিয়ে গেলেও রজনী ও লবঙ্গর ক্ষেত্রে এ-ভাষা বেমানান। "ইন্দিরা"-র ভাষা এইখানেই ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য।

"রজনী" উপন্যাসে দ্বিতীয় অভিযোগ উপন্যাসে সংঘটিত অনৈসর্গিক অপ্রাকৃত ঘটনাসম্বন্ধীয়, যদিও লেখকের ঘোষণায় এ-বিষয়ে সচেতনতা লক্ষণীয়, "এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।" উত্তমপুরুষে আখ্যান কথিত ব'লে এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত

কম, কিন্তু শচীন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের মূলে সন্ন্যাসীর প্রভাব নিশ্চয়ই লেখকের অভিপ্রেতই, অথচ এমন পরিবর্তন শচীন্দ্রর চরিত্র উত্থিত নয়, সেজন্য সন্ন্যাসীর প্রভাব বাইরের চাপ হিসাবেই গণ্য, এবং এই বাইরের চাপ সৃষ্টির জন্য লেখকই দায়ী, এর ফলে উপন্যাসের চরিত্রবিকাশের ন্যায় লঙ্ঘিত হয়েছে। রজনীর চক্ষুষ্মতী হওয়ার ঘটনা অলৌকিক অধ্যায়েরই অন্তর্গত। এ-দুটি ঘটনায় লেখকের নৈতিক তত্ত্ব সহজে প্রমাণিত হলেও শিল্প হিসাবে উপন্যাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—তা বলা বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথের "ঘরেবাইরে" উপন্যাসের বক্তা তিনজন—বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ। কিন্তু বক্তাদের ক্রম নির্দিষ্ট নয়, যেমন—বিমলার পর নিখিলেশ, তারপর সন্দীপ, পুনরায় বিমলা কিন্তু তারপর সন্দীপ। এর কারণ এই উপন্যাসে কোনও ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর, কোনও ঘটনা সংঘটনকালে বিবৃত হয়েছে, ফলে নির্দিষ্ট ক্রম রক্ষার চেষ্টা করলে আখ্যান অংশ যান্ত্রিক হয়ে পড়তো। বিমলার আত্মকথনের প্রায় অধিকাংশ স্মৃতিচারণ, এ-স্মৃতিচারণায় পরবর্তী অভিজ্ঞতার স্পর্শ বর্তমান, অর্থাৎ সংঘটিত ঘটনার বিবরণ অবিকল অবিকৃত না থেকে সময় সময় অর্জিত অভিজ্ঞতায় সিক্ত। অন্যপক্ষে, নিখিলেশ ও সন্দীপের আত্মকথনে বহুসময় ঘটমান বর্তমানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে পুনরুক্তিদোষের আশঙ্কা আছে, রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে মনস্ক ব'লে মধ্যে মধ্যে কোনও একটি ঘটনার আভাস কোনও এক বক্তার মারফৎ ঈষৎ প্রকাশ করেই অন্য বক্তার উপর সেই ঘটনা বিস্তারণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেজন্য বিমলা-সন্দীপের সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক্লান্তিকর নয়। বিমলা বিবাহিতা, তার স্বামী বর্তমান। তাই সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হলেও সেই

আকর্ষণের মধ্যে দ্বিধা সংশয় থাকা স্বাভাবিক। আবার উভয়ের পরিবর্তিত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নিখিলের সচেতনতার বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য ; কারণ এই সময় নিখিলেশ-চরিত্র মূর্ত হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। এই অধ্যায়টি ঘটমান বর্তমান, এর সঙ্গে বিমলার আত্মকথনে স্মৃতি যুক্ত থাকে ব'লে "ঘরেবাইরে"-র রচনাপ্রণালী সহজ সরল নয়, যদিও অতীত ও বর্তমান কালের ঘটনা সংযুক্ত করতে গিয়ে লেখক স্থানে স্থানে ভারসাম্য হারান। বিমলার আত্মকথনের শেষপর্যায়ের ঘটনাগুলি চলমান মুহূর্তের ঘটনা, অথচ নিখিলেশের আহত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় বিমলার মনোভাব সম্পর্কে লেখক নীরব, সেজন্য উপন্যাসের সমাপ্তি কিঞ্চিৎ আকস্মিক ও অতর্কিত মনে হয়। কারণ, স্বামীর আহত হওয়ার ঘটনাটি বিমলার জীবনের কোন্ পর্যায়ের ঘটনা—এসম্পর্কে প্রশ্ন জাগে; কারণ, এই ঘটনার পূর্বে বিমলার স্বামীর কাছে আত্ম-সমর্পণের আলেখ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এই একস্থানে কিছু সংশয় দেখা দিলেও "ঘরেবাইরে"-র আখ্যান-অংশ প্রায় ত্রুটিমুক্ত। বিমলার অতীত ভাষণের সমান্তরালে নিখিলেশ সন্দীপের উপজীব্য বর্তমানের বিবরণে উপন্যাসের কাহিনী গতিযুক্ত হয়। সন্দীপ নিখিলেশ যখন বর্তমানে, তখন অতীত ও বর্তমানের ছিন্নসূত্র গ্রথিত করার জন্য বিমলার প্রয়োজন, অবশ্য এ-প্রয়োজন দু-একসময় নিখিলেশের দ্বারাও সাধিত হয়েছে। এজন্য পুনরাবৃত্তি-দোষ আলোচ্য উপন্যাসে প্রকট নয়। "ঘরেবাইরে" উপন্যাসে ঘটনার চেয়ে মন এবং মন থেকে অনুভূতির চিত্রই মুখ্য। তবু উপন্যাসটি সফল সাহিত্যের নিদর্শন নয়। আত্মভাষণ যখন নির্বাচিত প্রণালী, তখন প্রতিটি আত্মভাষণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব, যেহেতু বিভিন্ন বক্তার ব্যক্তিত্ব ভিন্ন এবং

বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার আত্মমুখীন বিষয় ভিন্ন হতে বাধ্য এবং ঔপন্যাসিকের উপজীব্য যেখানে আনুভূতিক চিত্র, সেখানে প্রত্যেকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভাষা পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয়। "ঘরেবাইরে" উপন্যাসের বিভিন্ন বক্তার ভাষা একই আবেগ ও উচ্ছ্বাসে আপ্লুত এবং তিনজনের ভাষার মধ্যে তর-তম ভেদ করা দুষ্কর। আসলে, রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উপন্যাসে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না, সেজন্য সন্দীপের মত চরিত্র তাঁর অবলম্বন হয়। নির্বাচিত নারীচরিত্রটিও ভাবাবেগে পরিপ্লুত, তাই ব্যক্তিত্বের পরীক্ষায় নিমজ্জিত হওয়ার সময় সে সামান্যা নারীর মতই সন্দীপের বাহ্য চাকচিক্যে অভিভূত হয়েছে। অন্যদিকে সন্দীপ তেমন বলিষ্ঠ চরিত্র নয়, তার পরিচয় নীচতার মধ্যে, অর্থলোলুপতার মধ্যে। ফলে এমন চরিত্র দিয়ে অন্য চরিত্রের বলিষ্ঠতা পরীক্ষা করানো যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। উপন্যাসের পটভূমি ও চরিত্র সম্পর্কে লেখকের অ-মনস্কতার জন্য বক্তাদের আত্মবিশ্লেষণ উচ্ছ্বাস আবেগে কাব্যমণ্ডিত। ঘরের ও বাইরের সমস্যার জটিলতা বা অতল গভীরতা আলোচ্য উপন্যাসে অনুপস্থিত এবং বক্তাদের অতি-আত্মকেন্দ্রিকতায়, উপন্যাসটির নামের ব্যঞ্জনা মহৎ হলেও, "ঘরেবাইরে" তিনটি শিক্ষিত ভদ্র নর-নারীর বুদ্ধিকণ্ডুয়ণের ইতিবৃত্তমাত্র। যেজন্য ভাষার মধ্যে এপিগ্রাম, উপমার ছড়াছড়ি এবং সকল বক্তাই সমান কবি ও রসিক হয়ে ওঠে।

॥ ৩ ॥

উত্তমপুরুষে আখ্যানবর্ণনার একটি অসুবিধা এই যে অতীত ঘটনা অবিকল বর্ণনা করা যায় না, তাতে বক্তার অর্জিত অভিজ্ঞতার স্পর্শ লেগে যায়।

পত্রাকারে রচিত উপন্যাসে এই অসুবিধা নিবারণ করা কিছুটা সহজ। পত্রলেখকের পত্ররচনার সময় অনুভূতি ও মনোভাব পত্রে বিধৃত থাকে সহজে, এবং এ-প্রথায় পাত্র-পাত্রীর আন্তরিক পরিচয় নিবিড়ভাবে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী, অবশ্য পত্রলেখকের ভাষার উপর যদি সেই পরিমাণ কর্তৃত্ব থাকে। এই রীতির আর একটি সুবিধা এই যে একপক্ষের বক্তব্য শুনে অন্যপক্ষের ভাবনাচিন্তা কোন্ খাতে প্রবাহিত হবে পাঠকের সে-সম্পর্কে কল্পনার অবকাশ আছে, এবং অন্যপক্ষের উত্তর পড়ার পর পাঠকের নিজের ধারণার সঙ্গে সেই উত্তরের মিল-অমিল সন্ধান পাঠকের কৌতূহলের অন্তর্গত, অন্তত পাঠক স্বীয় ধারণার অনুরূপ উত্তর দেখলে সন্তুষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু জীবনের প্রতি ঘটনায় পত্র লেখা এবং সেই পত্র গচ্ছিত রেখে পরবর্তী সময়ে সেই পত্রগুচ্ছ একত্রিত ক'রে প্রকাশ করা কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব সন্দেহ নেই। তাছাড়া সেই পত্রগুলি ঔপন্যাসিক আখ্যানরচনার প্রচুর উপকরণ কিনা প্রশ্নাতীত নয়। তাই মনে হয় অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা এ-প্রণালী অধিক কৃত্রিম, চেখভের ভাষায় "as a literary form it is no good in many respects ; it puts the author into a frame, —that is its main weakness." (Novelists on the Novel গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৬০)।

বাংলাসাহিত্যে নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "বসন্তকুমারের পত্র"

পত্রাকারে রচিত প্রথম উপন্যাস। অবশ্য উপন্যাসে পত্রদ্বারা ঘটনার রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা "দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা", "বিষবৃক্ষ" গ্রন্থে লক্ষণীয়। "দুর্গেশনন্দিনী"-তে জগৎসিংহকে লিখিত আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের জন্য বিমলার পত্র নিঃসন্দেহে একটি নতুন কৌশল, যদিও এ-কৌশলের উন্নত প্রকাশ "বিষ-বৃক্ষ" -এর একাধিক পত্র। নগেন্দ্রর কুন্দর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সংবাদ সূর্যমুখীর পত্রে প্রকাশিত, এবং এইটি উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হরদেব ঘোষালের কাছে পত্রে নগেন্দ্রর মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের সংবাদ অতিকৌশলে বিবৃত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত-ও "মাধবীকঙ্কণ" উপন্যাসে পত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, কিন্তু একমাত্র পত্র-অবলম্বনে রচিত উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন "বসন্তকুমারের পত্র"। উপন্যাসের ঘটনা প্রধানতঃ বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ও হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্রের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসে একটি সুন্দর কৌশল অনুসৃত,— বসন্তকুমারের পত্রে ঘটনার বিবরণ এবং হরকুমারের পত্রে উক্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। পত্ররচনার এই দ্বিবিধ ভঙ্গী গ্রহণের জন্য পুস্তকটি ঔপন্যাসিক মানদণ্ডের বিচারে সহজে উত্তীর্ণ। এছাড়া গ্রন্থের শেষে কুসুমিকা ও নীলাব্জিকার পত্রে নটেন্দ্রনাথ আখ্যানে বৈচিত্র্য আনায় সচেষ্ট হয়েছেন এবং বৈচিত্র্য আনার ফলে প্রতিটি চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, এবং "by varying your correspondents you can get different views of the same event, and first hand manifestation of extremely different characters," (George Saintsbury : The English Novel. p. 19) এ-ক্ষেত্রে যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

॥ ৪ ॥

একটি ঘোষণা সত্যই বিস্ময়ের : "বঙ্গীয় পাঠক ! এপর্যন্ত নানা রকম উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু আদালতের নথিতে উপন্যাস পাঠ করা দূরে থাকুক, বোধ হয়, কাহারও মুখে কখনও এরূপ কথা কর্ণগোচর করেন নাই, তজ্জন্যই আমার মাতামহ মহাশয়ের পুরাণ কাগজগুলির ভাষাটিকে সময়োচিত মাত্র করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। পাঠকগণ ইহার নূতনত্ব-প্রযুক্ত যদি কিঞ্চিৎমাত্র আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।" নিঃসন্দেহে ঘোষণাটি মৌলিক এবং আদালতের নথিকে ক্রমবিন্যস্ত ক'রে উপন্যাসরচনার দৃষ্টান্ত বোধহয় অন্য সাহিত্যে দুর্লভ। অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত "পুরাণ কাগজ বা নথীর নকল" গ্রন্থটি সেদিক থেকে সমগ্র উপন্যাসসাহিত্যে একটি ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য। গ্রন্থের উপন্যাস-ত্ব সম্পর্কে লেখকের সংশয় সর্বদাই প্রবল ছিল, "ইহা যেভাবে রচিত তাহাতে গল্প-রচনার প্রধান অঙ্গ বৈচিত্র্যও রক্ষা করা কঠিন। উপাখ্যান-বর্ণিত নায়ক-নায়িকাদি ব্যক্তিগণের চরিত্রগঠন ও তাহার পূর্ণতাসাধন দূরের কথা।" (ভূমিকা, পৃঃ ।০—৷৷০)।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিনীরচনায় ও কাহিনীর টানে চরিত্রস্ফুরণে তিনি বহুলাংশে সফল হয়েছেন। উপন্যাসের আখ্যানে আদ্যন্ত একটি কৌতূহলের ভাব সর্বদা বর্তমান। অন্যদিকে অনঙ্গমোহিনীর চরিত্র ও পিতার আচরণ পত্রমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। ব্রহ্মানন্দর সরল উদার চরিত্রও সুঅঙ্কিত। সাধারণভাবে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবেশ রচিত হওয়ার জন্য উপন্যাসের পটভূমি বিশ্বাস্য ও বাস্তব

হয়ে ওঠে এবং নথিগুলির ক্রম-বিন্যাস সুপরিকল্পিত। একখানি আবেদনপত্রের প্রতিলিপির পর বিভিন্ন পত্রের সাহায্যে কাহিনীর অতীতাবর্তন লেখকের লিপিচাতুর্যের পরিচায়ক নিঃসন্দেহে। কাহিনী পুনরায় বর্তমানে প্রত্যাবর্তন করে প্রতিবাদীর উত্তরের পর। প্রেম প্রায় উপন্যাসের একটি উপজীব্য বিষয়, বর্তমান গ্রন্থে সেই প্রেমোপাখ্যান কৃষ্ণভামিনী ও আদিত্য কেন্দ্রিক, এবং উপাখ্যানটি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে। সর্বোপরি ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে শেষপর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত রাখার চেষ্টা আলোচ্য উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। সম্পত্তিকে কেন্দ্র ক'রে ষড়যন্ত্রের ভয়াল ও সূক্ষ্ম জটিলতার বিবরণদান "পুরাণ কাগজ" উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়। এ-উপন্যাস-নিশ্চয়ই মহৎ বা সফল শিল্প সৃষ্টির উদাহরণ নয়, বরং গ্রন্থটি কোনও ক্রমে উপন্যাস-মর্যাদা লাভ করেছে, তবু এই উপন্যাসের অভিনব পদ্ধতি নিঃসন্দেহে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "পুরাণ কাগজ" নথির মাধ্যমে লিখিত অদ্যাপি বাংলাভাষায় এ-জাতীয় শেষ উপন্যাস।

ভাষা

"অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।" (বঙ্কিমচন্দ্র ঃ বাঙ্গালা ভাষা)।

* * *

ঔপন্যাসিকের স্বীয় বক্তব্য, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতা রূপায়ণের জন্যই উপন্যাস রচিত হয়। এবং ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ ইত্যাদি রচনায় সেই তাৎপর্য প্রকাশে লেখক মনোযোগী হন সৃষ্টিশীল সাহিত্যের নিয়মে। তাই প্রকৃত (সিরিআস) সাহিত্য-রূপে উপন্যাস রচনা কালে প্রকাশের মাধ্যম ভাষা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সজাগ মনস্কতার একান্ত প্রয়োজন, যেহেতু ভাষার শৈথিল্য ও অসুষ্ঠু প্রয়োগ ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা শিল্পায়নের পরিপন্থী হয়। উপন্যাস আখ্যানমূলক সাহিত্য বলেই নির্বাচিত সংস্থান, চরিত্র, পরিবেশ প্রভৃতির যথোপস্থাপনার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। অন্যদিকে সঠিক ভাষা প্রয়োগেই একমাত্র সংস্থান, চরিত্র ইত্যাদি অর্থপূর্ণ হয়, অর্থাৎ বক্তব্য রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও ভাষা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার নিয়ম বিঘ্নিত হলে বিষয়বস্তুর তীক্ষ্ণতা বা তীব্রতা সেই অনুপাতে হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে, যদিও এ-মন্তব্যের সরলীকরণে সমালোচনা যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট হয়। ভাব অনুসারী ভাষা রচনা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব, কিন্তু ভাষার ভাব-অতিক্রমকারী একটি শক্তিও বর্তমান, আবার ভাব অনুযায়ী ভাষার ক্ষমতাও সর্বদা সমানুপাতিক নয়,

সেজন্য ভাব ও ভাষার সুসমঞ্জস প্রয়োগ-ই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব; অথচ আশ্চর্যের বিষয় সাধারণ পাঠক এবং বহু সমালোচক উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে স্বল্পই ভাবিত হয়েছেন। উপন্যাসে আখ্যানের আকর্ষণ হয়ত এর জন্য মূলত দায়ী, কিন্তু আখ্যানের আকর্ষণ-শক্তি উপযুক্ত ভাষার আশ্রয়েই প্রসারণযোগ্য। এ-সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট অবহিত নই ব'লে উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে আমাদের অবহেলা সীমাহীন।

সময় সময় বিবৃত ঘটনার আকর্ষণ পঙ্গুভাষা নিয়েও গিরিলঙ্ঘনে সক্ষম, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসের পাঠান কর্তৃক গড়মান্দারণ বিজয় অধ্যায়। এ-উপন্যাসের ভাষা অপরিণত নিঃসন্দেহে, এমনকি সে-ভাষা মোহিতলাল মজুমদারের মতে "অশুদ্ধ—শুধুই ব্যাকরণ নয়,—ইডিয়ম বিরুদ্ধ, শিথিল, ছন্দোহীন বাক্যযোজনা কোন সার্থক রসসৃষ্টিমূলক রচনায় কখনো লক্ষিত হয় নাই।" (বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা, পৃঃ ১)। অথচ দুর্বল কষ্টকৃত ভাষাতেই উল্লিখিত ঘটনা প্রায় বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে একমাত্র অতিদ্রুত ঘটনা সঞ্চালনের জন্য। অতএব প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, উপযুক্ত ভাষা ব্যতীত রসসৃষ্টি সম্ভব কি? কিন্তু অংশবিশেষের সাফল্য যে-কোনও শিল্পীর কাঙ্ক্ষিত নয়, এবং "দুর্গেশনন্দিনী" যে সার্থক উপন্যাস নয়—সে-মন্তব্যে দ্বিমত হওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে বক্তব্যের প্রশ্নই মুখ্য, "দুর্গেশনন্দিনী"-তে তেমন বক্তব্য অনুপস্থিত। উপরন্তু বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পর যে প্রাণস্পন্দ অনুভূত, আলোচ্য উপন্যাসে সেই স্পন্দনও অবর্তমান, এ-বিষয়ে ভাষার স্থিতিশীলতার বিষয়টিও বিচার্য। অনেক সময় চিন্তা রাজ্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন বা বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, সেই আলোড়ন বা বিক্ষোভ রূপায়ণের উপযুক্ত

ভাষা তখন পর্যন্ত সে-সাহিত্যে সৃষ্ট না-ও হতে পারে, কারণ ভাষা একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং তা খেয়াল খুশি অনুসারে উদ্ভূত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রর সময় বাংলাগদ্যের অবস্থা তেমন দীন না হলেও বাংলা সাহিত্যিক-গদ্য তখনও শৈশব বা কৈশোরে। "আলালের ঘরের দুলাল", "হুতোম পেঁচার নক্‌শা" মধুসূদন বা দীনবন্ধুর প্রহসন নাটকাবলীর সংলাপে কথ্যভাষার আদল সময় সময় স্পষ্ট হয়ে উঠলেও সেই ভাষার শক্তি তখনও বাঙালী গদ্যলেখকের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। ফলে সাধুভাষাই তাঁদের অবলম্বন হয়, যদিও সাধুভাষাও তখন সংস্কৃত রীতি ও বাগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতী রীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন, এবং আলালীভাষার প্রশংসা করতেন, কিন্তু বাস্তবে বঙ্কিমচন্দ্র আলালী-ভাষার দুর্বলতা বা ত্রুটি সংশোধন না ক'রে অথবা আলালীভাষার শক্তিপ্রয়োগে নিশ্চেষ্ট হয়ে যে-রীতি গ্রহণ করেন তা পণ্ডিতী রীতিরই আত্মীয়, যদিও এ-রীতির প্রভূত উন্নতি সাধনে তিনি একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। একহিসাবে সাধুভাষার স্বচ্ছন্দ রূপটি তাঁর অনলস পরিশ্রমের ফসল। সাধুভাষা বঙ্কিম-উপন্যাস রচনার মাধ্যম ব'লে জীবনের প্রাত্যহিকতার চিত্রণের চেয়ে অতীত সুদূরতা ও বর্ণাঢ্য জীবন বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিচরণ স্বাভাবিক ছিল, কারণ বঙ্কিম-ব্যবহৃত গদ্যে সাধারণ মানুষের কর্মমুখর দৈনিক বা সংগ্রামী মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টার চিত্র অঙ্কন শুধু দুরূহ-ই নয়, অসম্ভবও। কারণ এ-গদ্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত গদ্যের ব্যবধান যোজন যোজনের। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস ইতিহাস-আশ্রিত। এটি তাঁর অতিসচেতনতার পরিচয় ব'লে আমার মনে হয়। প্রচলিত মত এই যে সমসামিয়িক কাল ও জীবনকে সঠিক ধরতে অক্ষম ছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র অতীতাশ্রয়ী।

মতটি সর্বাংশে সত্য নয়, অন্তত বঙ্কিম-প্রবন্ধ ও রসরচনা পাঠে এ-উক্তি বহুলাংশে অসত্য ব'লে মনে হয়। মনে হয়, ভাষার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজ্ঞান এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ছিল।

এই সীমাবদ্ধ ভাষার সোনার ফসল হচ্ছে "কপালকুণ্ডলা"। বক্তব্য অনুসারী ভাষা হলে উপন্যাস কত উচ্চতায় উন্নত হতে পারে তার প্রমাণ "কপালকুণ্ডলা"। নিশ্চয়ই এরসঙ্গে উপযুক্ত পরিবেশ, চরিত্র ও ঘটনা যোজনার কৃতিত্ব স্মরণীয়, তথাপি ভাষা এখানে উপন্যাসের প্রতিটি উপকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ওতপ্রোত। নায়িকার রূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববর্তী লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র, তথাপি প্রথম উপন্যাসে পূর্বসূরিগণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, পাতার পর পাতায় বিমলা, আয়েষা বা তিলোত্তমার রূপ বর্ণনায় শুধু পূর্বধারাই অনুসৃত নয়, কাহিনীর গতিও এই বর্ণনার জন্য ব্যাহত হয়েছে। সেজন্য এ-সব রূপবর্ণনা আরোপিত, কাহিনীর মুল বা শাখা স্রোত থেকে সমুত্থিত নয়। কিন্তু কপালকুণ্ডলার রূপবর্ণনা কপালকুণ্ডলার আবেষ্টনে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত এবং প্রকৃতির উদার স্বাধীন মুক্ত নির্জনতা বিযুক্ত উপস্থাপিত নায়িকাকে ভাবা যায় না এই গ্রন্থে। শকুন্তলার মতই কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত আখ্যানের অধিকাংশই নবকুমারের দৃষ্টিতে রচিত, যে-নবকুমার বিজন বনে সমুদ্রতীরের বিবিক্ত প্রতিবেশে অপরিচয়ের বিস্ময়ে বিমূঢ়। এই বিস্ময়বিমূঢ় নবকুমার "ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর

চিত্র দেখা যাইতেছে! অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতিগম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। রমণী দেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না; অর্ধচন্দ্র নিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ; ঘন কৃষ্ণ চিকুরজাল, পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।"
এই বর্ণনায় প্রকৃতির রহস্যময়তা সন্ধ্যাসমাগমের প্রসঙ্গ যেমন বিধৃত, তেমনি নায়িকার সৌন্দর্যের আশ্চর্য বিস্ময়তা অর্ধচন্দ্র নিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ ইত্যাদির মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং কপালকুণ্ডলার এই রহস্যময় সুদূরতা সমগ্র আখ্যানে প্রসারিত, যেজন্য বর্ণনাটি আরোপিত নয়, সমগ্র উপন্যাস দেহে শিরা উপশিরায় রক্তের মত সঞ্চারিত হয়। অন্যপক্ষে মতিবিবির রূপবর্ণনা যদিও নবকুমারের নিমেষশূন্যচক্ষের বিবরণ, তবু এ-বর্ণনায় লেখকের উপস্থিতি অনুভূত হয়, সেজন্য বর্ণনার তীক্ষ্ণতা কিঞ্চিৎ বিঘ্নিত। লেখকের উপস্থিতির ফলে মতিবিবির রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ইঙ্গিত স্পষ্ট ধরা পড়ে, "ইনি যে নির্দোষ সুন্দরী নহেন" —এ-উক্তিতে মতিবিবির রূপের দোষ বর্ণনার চেয়ে বুদ্ধির প্রভাব ও আত্মগরিমার বিষয়টি উত্থাপিত করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়। এই উদ্দেশ্যেই মতিবিবির যে-প্রাক্তন জীবন ও প্রতিবেশ বর্ণিত, সেই চিত্র কপালকুণ্ডলার মনোরম চিত্রের পাশে ম্লান এবং

বিবর্ণ। বস্তুত উপন্যাসটির সৌন্দর্যহানির জন্য ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা দায়ী, এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে এ-বর্ণনার আত্যন্তিক সংযোগ নেই বলেই কাহিনীর গতি রুদ্ধ ও ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য এজন্য নির্বাচিত পদ্ধতিও দায়ী। অথচ এ-ত্রুটি সত্ত্বেও "কপালকুণ্ডলা"-র ভাষা যে শিখরে উপনীত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য উপন্যাসে তেমন সমৃদ্ধ ভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ। বক্তব্য অনুসারে ভাষার উচ্চতা নির্বাচন যথোপযুক্ত হওয়ায় উপন্যাসটি বাংলাসাহিত্যের সার্থক ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের তালিকাভুক্ত। আবার "ঘটনা যেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে বিবর্তিত বা পরিণত হইতেছে সেখানে অন্তরঙ্গতার স্থলে নাটকোচিত আকস্মিকতা" (সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য, পৃঃ ১১০) বঙ্কিমের "রচনারীতি ও বর্ণনাভঙ্গীকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়াছে।" নাটকীয়তার উৎস অবশ্যই পরিস্থিতি ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব-উত্থিত ঘটনাবলী, তবু সেই দ্বন্দ্ব প্রকাশের জন্য তেমন ভাষারই প্রয়োজন। "দুর্গেশনন্দিনী"-র ভাষায় নাটকীয়তা ধারণের ক্ষমতা ছিল না, তাই উক্ত উপন্যাসের নাটকীয় মুহূর্ত অতিনাটকে পর্যবসিত। "কপালকুণ্ডলা"-র স্থানে স্থানে এবং বিশেষতঃ শেষ দুই দৃশ্যে অতিনাটকীয়তা অবশ্য পঙ্গু ভাষার সৃষ্টি নয়, সেই অতিনাটকীয়তার জন্য লেখকের বক্তব্য ও নির্বাচিত পদ্ধতি দায়ী, এবং সেইসব দৃশ্যেও ভাব অনুসারী লেখকের ভাষাপ্রয়োগের দক্ষতা আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। নাটকোচিত অনুভূতি সৃষ্টির জন্য বোধহয় আবেগ-উচ্ছ্বাস দমনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সংক্ষিপ্তকরণও প্রয়োজন; এবং এই সংক্ষিপ্তকরণে বলার চেয়ে না-বলাই মুখর হয়ে ওঠে সঙ্গত কারণে—

ঃ নবকুমার বলিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্ম্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল। ঃ

শেষ বাক্যটিতে নাটকীয়তা বিধৃত। এই বাক্যটি উদ্ধৃতির প্রথমবাচ্য হলে সমগ্র পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে শত শত কৌতূহল জিজ্ঞাসার বিষয়ে পরিণত হতো না; উপযুক্ত স্থানে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যের প্রয়োগ সমস্ত পরিবেশকে উত্তীর্ণ করে এক নতুন ব্যঞ্জনায়, সেই বাক্যে ঘটনার প্রতিক্রিয়া-ও স্পন্দমান এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখানো নাটকীয়তা নিশ্চয়ই। এমন উদাহরণ "কপালকুণ্ডলা"-য় অজস্র মেলে।

বস্তুত "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসের ত্রুটির জন্য দায়ী উপন্যাসের ভাষা নয়, বরং বহু ক্ষেত্রে বঙ্কিমের ঐশ্বর্যময় ভাষা দুর্বলতা ঢাকার পক্ষে অসম্ভব কার্যকর। ভাষা উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির অতিরিক্ত অন্য উপকরণ নয়, প্রসঙ্গের রূপায়ণে সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন ও উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগে উপন্যাসের সাফল্য ও সার্থকতা, তা বলা বাহুল্য। "কপালকুণ্ডলা"-র ভাষা সেক্ষেত্রে প্রশংসনীয়, সেইসময় বাংলাগদ্যের কাঠামোও যথেষ্ট দৃঢ় ছিল না। সেই অদৃঢ় ভিত্তির উপর এমন উপন্যাস রচনার প্রয়াস দুঃসাহসিক, এই দুঃসাহসিকতার জন্যই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র বহুলাংশে স্বকীয় ভাষা আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন।

"বিষবৃক্ষ" উপন্যাসেই অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভাষা আত্ম-প্রতিষ্ঠ হয়। "বঙ্গদর্শন" সম্পাদনার কাজে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ,

মন্তব্য, রসরচনা জনগ্রাহ্য করার অজুহাতে হয়ত "তাঁর যে কলম উপন্যাসের পথে মন্দ গতিতে সরলতা ও স্পষ্টতা অর্জন করছিল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এসে পড়ে তার গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনপত্রের অধিনায়কতার অভ্যাস তাঁর কলমকে বহুপরিমাণে মার্জিত ও ভারমুক্ত হতে সাহায্য করেছে।" (প্রমথনাথ বিশী: বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ভূমিকা, পৃঃ ১১৬)। "বিষবৃক্ষ"-এ যে-রীতির শুরু "রজনী"-তে সেই রীতির পূর্ণ বিকাশ। এই রীতির নাম বঙ্কিম-রীতি, যদিও এ-ভাষায় সমাস-আড়ম্বর বা সংস্কৃতরীতি অনুসারী বাক্যপ্রয়োগ পরিত্যক্ত নয়, তবু বাংলাগদ্যের সাধুভাষার আদর্শ বঙ্কিমকৃত—এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই এ-ভাষার সংস্কার ও উন্নতিসাধনে মনোযোগী ছিলেন, তার একাধিক প্রমাণ বহু প্রবন্ধে পাওয়া যায়। বাক্যগঠনপদ্ধতি, তৎসম শব্দের আধিক্য, সমাস-আড়ম্বর, উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রথাসিদ্ধ অনুপ্রবেশ, পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের আবশ্যকীয় ব্যবহার ইত্যাদির জন্য সাধুভাষা স্বাভাবিক কারণে মানুষের অন্তরের চিত্র অন্তরঙ্গ উপস্থাপনার অনুপযুক্ত। এ-ভাষায় বহিঃপ্রকৃতি বা বহির্ঘটনার বিবরণ প্রদান বরং অনায়াস সাধ্য, হয়ত সংস্কৃতসাহিত্যের বিশাল ঐতিহ্য সেক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল; বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষার এই গুণটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, যেজন্য তাঁর উপন্যাসে বহিঃপ্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় কোনও কার্পণ্য নেই, এবং বঙ্কিম-উপন্যাস যে ঘটনাপ্রধান তার একটি কারণ ভাষার সীমাবদ্ধতা। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র জানেন "বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থা বিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা করা তাহার

উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন তিনিই সুকবি।” (“মানসবিকাশ” গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি)। সেজন্য প্রায় ক্ষেত্রে বঙ্কিম-উপন্যাসে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা নিছক বর্ণনাই নয়, সেই বর্ণনা কাহিনী বা চরিত্রের সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে জড়িত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিসর্গ পাত্র-পাত্রীর আলোকেও বর্ণিত, অর্থাৎ প্রায় ক্ষেত্রেই “উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে।”

কিন্তু উপন্যাসে ঘটনাস্রোত প্রবল হলেও পাত্র-পাত্রীর অন্দরমহলে উঁকি মারা সময় সময় ঔপন্যাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ অন্দরমহলকে পাশ কাটানো প্রায় অসম্ভব। অথচ সাধুভাষার এই চিত্র অঙ্কনের ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ-ক্ষেত্রে একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছেন—প্রশ্নবোধক ও সংক্ষিপ্ত বাক্যরচনা দ্বারা তিনি পাত্র-পাত্রীর অন্দরমহলের সংবাদ এবং চিত্র পাঠক সম্মুখে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন, এজন্য সাধুভাষায় কথ্যভাষার ছন্দস্পন্দ সময় সময় অনুভূত হয়, নিঃসন্দেহে বিষয়টি অভিনন্দনযোগ্য, অন্তত বাংলা গদ্যের শৈশব-কৈশোরে এমন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া দুঃসাহসিক অভিযানবিশেষ ঃ

১. কুন্দ ভাবিতে লাগিল, “ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তাহলে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্রগুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি—তা দূর হউক, ও আর ভাবি না—বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে—নহিলে মা—আবার ঐ কথা! দূর হউক—ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব—তা হলে হব ত? (বিষবৃক্ষ)

২. ভাবিল, "এখন কি করি? একা, তাহাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ—সহজই বা কিসে? এতদিন জলে বাস করিলাম, কই একদিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইত, ধীরে ধীরে নৌকার বাহিরে আসিয়া, জলে ঝাঁপ দিলে কে ধরিত? ধরিত—নৌকায় পাহারা থাকিত। কিন্তু আমি-ও ত কোন উদ্যোগ করি নাই। মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার কোন উদ্যোগ করি নাই। —তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষ মরিতে পারে না। কিন্তু আজ? আজ মরিবার দিন বটে। (চন্দ্রশেখর)

৩. বহু মূর্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য, অচিন্ত্যনীয় শক্তিধর, অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জড় পদার্থ সকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য, বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! (রজনী)

এই প্রশ্নবোধক সহজ সরল বাক্যগুলি পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধির সহায়ক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়াপদের (বিশেষতঃ "-ইল" প্রত্যয়ান্ত) ঘন ঘন ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্র অনুচ্ছেদ

গঠনের পক্ষপাতী। "-ইল" প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ ধ্বনি সৃষ্টি করে, যে ধ্বনি কাব্যিক ধ্বনির নিকট আত্মীয়।

বাস্তবের নিষ্ঠুর নগ্নতার স্বরূপ যদিও বঙ্কিমী ভাষায় উদ্ঘাটনা করা কঠিন এবং প্রায় অসাধ্য, তবু বঙ্কিমচন্দ্র এ-ভাষার সাহায্যে কুন্দর দারিদ্র্যপীড়িত সংসার চিত্রণে পশ্চাদপদ ছিলেন না : "কক্ষমধ্যে মনুষ্যজীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল সামগ্রী দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি--একটা ভাঙ্গা উনান—তিনচারিখানা তৈজস—ইহাই গৃহালঙ্কার। দেওয়ালে কালি, কোণে ঝুলি; চারিদিকে আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে।" (বিষবৃক্ষ)। বর্ণনাটি গতানুগতিক, কিন্তু কাটা কাটা শব্দ যোজনায় লেখক বাস্তবের নিষ্ঠুর নির্মম রূপ প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। অবশ্য এমন উদাহরণ বঙ্কিম-উপন্যাসে নেহাৎ-ই অল্প। আমাদের আশার কথা, বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রের অপরিসরতা সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক ছিলেন, তাই ভাষায় অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত বঙ্কিম-উপন্যাসে প্রায় শূন্য। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের জীবনসামগ্র্য রূপায়ণের সৎচেষ্টায় সাধুভাষার দুর্বলতা সংশোধনে ও মনের ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষা আবিষ্কারের পরীক্ষায় সতত নিরত ছিলেন। বক্তব্য ও বিষয় অনুসারে তাঁর নির্বাচিত ভাষায় বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সংলাপ (বিশেষতঃ বিষবৃক্ষের পর), সরল সংক্ষিপ্ত প্রশ্নবোধক বাক্যগঠনে তিনি মৌখিক ভাষার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছেন এবং এইজন্যও তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্র-গদ্য বহুদিন বঙ্কিম প্রভাবিত ছিল। "বৌঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত সরল বাক্য এবং ঘটনাবর্ণনার দ্রুত ভঙ্গী বঙ্কিমীভাষা ও রীতিরই স্মারক। তবু এ-উপন্যাসে অলঙ্কার ও সমাস প্রয়োগের স্বল্পতা ও অনুচ্ছেদে বাক্যগুলির স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক গতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়ত্ব উদ্ভাসিত। তবু "বৌঠাকুরাণীর হাট" বা "রাজর্ষি" উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর অন্তরের চিত্র উপেক্ষিত ছিল এবং বঙ্কিম-অনুসরণে দুটি উপন্যাসই ঘটনা-প্রধান। তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব উপন্যাসরচনার রীতি ও ভাষায় সক্রিয় ব'লে বক্তব্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত উপন্যাসদ্বয়ে স্বকীয় ভাষার অভাবে পরকীয় ভাষার নিগড়ে বন্দী এবং পরাস্ত। এই বন্দীদশা অকস্মাৎ একদিনে ঘোচে নি, এজন্য রবীন্দ্র-নাথের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের উদাহরণ তৎকালীন বহু রচনায় ইতস্তত পাওয়া যায়। "চোখের বালি" নব-পর্যায়ের প্রথম উপন্যাস এবং এই গ্রন্থেই উপন্যাসরচনার স্বকীয় ভাষা রবীন্দ্রনাথের করায়ত্ত হয়। "চোখের বালি"-র ভাষা সাধুভাষা, এমনকি সংলাপও সাধুভাষায় রচিত। তবু এ-ভাষার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধুভাষার পার্থক্য বিস্তর, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ভাষায় "তাঁর সাবেকী ভাষা বঙ্কিমের মতো গুরু-চণ্ডালি দোষে দুষ্ট নয়; তাতে সর্বনামের লিখিত ও কথিত রূপের শ্রুতিকটু সংমিশ্রণ বড় একটা নেই, এবং তিনি যেহেতু শুরু থেকেই জানতেন যে প্রাকৃত বাংলায় কৃ-ধাতু ছাড়া আরও বহু ক্রিয়াপদে চলে, তাই সাধু হয়েও তাঁর গদ্য কখনও স্থবির নয়, সর্বদা বেগবান। তবে শুধু ক্রিয়াধিক্য এই চলৎশক্তির একমাত্র কারণ নয়; দীর্ঘ সমাসের অভাবও উক্ত গদ্যের আর একটি

বৈশিষ্ট্য ; ধ্বনির খাতিরে অথবা অর্থগৌরবের তাগিদে তিনি যদিও বারবার সংস্কৃত শব্দকোষের শরণ নিয়েছেন, তবু তিনি কদাচিৎ ভোলেন নি যে প্রাকৃত বাংলাভাষার ব্যাকরণ স্বতন্ত্র ও স্বগত।" (কুলায় ও কালপুরুষ, পৃঃ ২৪-২৫)। বঙ্কিম-প্রভাবেও যে বৈশিষ্ট্য-গুলি পূর্ববর্তী রচনায় অঙ্কুরে স্থিত, সেই বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমের প্রভাব সবলে মোচন ক'রে "চোখের বালি" উপন্যাসে পুষ্পময় হয়ে ওঠে। তাই সাধুভাষার আশ্রয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনের আঁতের কথা টেনে বের করতে কুণ্ঠা করেন নি, এই অকুণ্ঠ নির্ভয়তা উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি উত্থিত সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধুভাষার এ-ক্ষমতা (মনের আঁতের কথা টেনে বের করা) বহনের শক্তি নেই বললেই চলে, অথচ রবীন্দ্রনাথ "চোখের বালি" উপন্যাসে সাধুভাষাতেই পাত্র-পাত্রীর অন্তরঙ্গ ও অন্তরের চিত্র সার্থকভাবে উপস্থাপনায় সফল হয়েছেন। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষা পণ্ডিতী সাধুভাষা নয়, সেই ভাষার ছাঁদ অনেকটা কথ্যভাষার। অবশ্য এ-দুঃসাহসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও বঙ্কিমীভাষার অন্যতম একটি গুণ নাটকীয়তা রবীন্দ্র-ভাষায় উপেক্ষিত, হয়ত তথাকথিত নাটকীয় প্রকরণে তাঁর আপত্তি বলেই রবীন্দ্র-ভাষা নাটকীয় গুণ বর্জিত। তবু কারণ যাই হোক, ভাষার নাটকীয় শক্তির ধারণক্ষমতার অভাব রূপেই গণ্য। ভাষার এই শক্তির অভাবের জন্যই "চোখের বালি" উপন্যাসে আখ্যান বলার ভঙ্গী অতি সরল ও মসৃণ হয়ে উঠেছে।

"গোরা" উপন্যাসে অবশ্য প্রকরণ বা ভাষায় নাটকীয় গুণ সমভাবে অনুপস্থিত, তবু "গোরা"-র আখ্যান অংশ মসৃণ বা সরল নয়। বক্তব্য, পদ্ধতি, ভাষা প্রভৃতির সুষম সমন্বয়ে "গোরা" আমাদের সাহিত্যের একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম, এবং এই উপন্যাস কেবল বিষয়মাহাত্ম্যে শিরোপা পাওয়ার যোগ্য নয়, প্রকরণ ও

ভাষার অনন্য ও যথোপযুক্ত প্রয়োগে শিল্পকর্মের অননুকরণীয় সৃষ্টিও বটে। একই সঙ্গে ব্যাপক ও গভীর বক্তব্য উপন্যাসায়িত করা শুধু দক্ষতার পরিচয়ই নয়, দুঃসাহসিকতারও পরিচয়। "গোরা"-র ভাষা প্রায় অধিকাংশ সময় নিরলঙ্কার, বাহুল্যবর্জিত, ঋজু ও অবিসর্পিত; সেই ঋজু প্রত্যক্ষতার ফলে ভাষা সংহত ও ঘনসন্নিবদ্ধ হয়, অথচ এ-ভাষা নমনীয়ও বটে, পাত্র-পাত্রীর আবেগ উচ্ছ্বাস সমমাত্রায় সুষ্ঠুরূপেই প্রকাশিত হয়েছে। এ-উক্তি প্রমাণের জন্য উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন, কারণ সমগ্র উপন্যাসে এ-উদাহরণ অপর্যাপ্ত। "চোখের বালি"-র সাধুভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি মধ্যে মধ্যে শোনা গেলেও "গোরা"-য় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ স্বকীয়, যদিও সাধু-ভাষায় অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা চিত্রণের সীমাবদ্ধতার ত্রুটি আলোচ্য উপন্যাসে প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির অভিনবত্বে অপসারিত হয়েছে। ভাষার বিচারে উপন্যাসের যাবতীয় উপকরণের বিষয় সমালোচকের স্মরণে থাকা উচিত। মাত্র ভাষার বিচারে বিড়ম্বনার আশঙ্কা থাকে, যেহেতু ভাষা উপন্যাসের আত্মা ও শরীর বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেজন্য ভাষার কবিত্ব বা নাটকীয় শক্তি বিচ্ছিন্নরূপে আলোচনার যোগ্য নয়। কারণ উপন্যাস কবিতা নয়, জীবনের সমগ্র রূপায়ণে তাই উপন্যাসের ভাষা জীবনের মতই বিচিত্র ও ঐশ্বর্যশালী। "গোরা" উপন্যাসে ভাষার সেই শক্তি বর্তমান বলেই উপন্যাসটি বিরাট ও গভীর বক্তব্য রূপায়ণে সফল হয়েছে।

"চতুরঙ্গ" উপন্যাসের ভাষা রবীন্দ্র-সাহিত্যে ব্যতিক্রমবিশেষ, কারণ এমন সংহত ইঙ্গিতবহ ভাষা সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলীতে দ্বিতীয়-রহিত। এ-ভাষা একজন আদ্যন্ত কবির পক্ষে স্বাভাবিক, আবার অস্বাভাবিকও বটে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা স্মরণে রেখে

বলা যায়, অতিকথন তাঁর অন্যতম ত্রুটি। সেই অতিকথনদোষ "চতুরঙ্গ"-এ বহুলাংশে বিলুপ্ত, বরং অতিসংক্ষিপ্তি মধ্যে মধ্যে অস্বস্তিকর। আখ্যান উত্তমপুরুষে বিবৃত, এবং উত্তমপুরুষে রচিত উপন্যাসে কথকের প্রাগল্‌ভ্য অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে কথক প্রায় নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক। এবং কথকের এই নিরাসক্তি যে-সংযমের বাঁধ তৈরী করে, সেই সংযমই উপন্যাসটির সাফল্যের একটি প্রধান কারণ। এ-উপন্যাসে যে-বিষয় নির্বাচিত, সেই বিষয়ের সঠিক রূপায়ণের জন্য ভাষার সংযম বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ নায়ক-নায়িকা যে-জিজ্ঞাসা এবং অন্বেষণে ক্ষতবিক্ষত, সেই অন্বিষ্ট আত্মসচেতনতা উত্থিত, এবং নায়কের ক্ষেত্রে আত্মসচেতনতার সঙ্গে আত্মমগ্নতা জড়িত, ফলে বিশিষ্ট পাত্র-পাত্রীর মানস চিত্র প্রকাশের জন্য দরকার সংহত ইঙ্গিতময় ভাষা। "চতুরঙ্গ"-এর প্রকরণও অবশ্য সংযমের উদাহরণ, সেজন্যও ভাষার সংহত প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে ওঠে স্বাভাবিক কারণে। উপমা, চিত্রকল্প ও প্রতীকের সুষম ও সংগত ব্যবহারে উপন্যাসটি বাংলাগদ্যের একটি নতুন দিগ্‌দর্শন। উপন্যাসের ভাষা সাধু হলেও লেখকের আশ্চর্য কুশলতায় এ-ভাষা চলিতভাষার মতই মনে হয় এবং চতুরঙ্গের ভাষা মৌখিক ভাষার অধিক নিকটবর্তী।

উপন্যাসে চলিতভাষার মাধ্যম গ্রহণ ঈপ্সিত ফল বর্তায় নি—তার প্রমাণ "ঘরেবাইরে" থেকে "চারঅধ্যায়" পর্যন্ত উপন্যাসগুলির ব্যর্থতায় পরিলক্ষিত। শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে (যোগাযোগ ব্যতীত) অভিজ্ঞতার পরিচিত ক্ষেত্র থেকে অপরিচিত জগতে পা বাড়ানোর ফলে রবীন্দ্রনাথকে কল্পনা দিয়ে অনেক শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়েছে। বিশেষ ক'রে "ঘরেবাইরে" এবং "চারঅধ্যায়" উপন্যাস যে চরিত্র ও ঘটনা কেন্দ্রিত, সেই চরিত্র বা ঘটনা

জনশ্রুতির সুবাদে এসেছে ঔপন্যাসিকের কাছে। তাই এসব উপন্যাসে লেখক কল্পনার উপরই অতিশয় নির্ভরশীল ছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব পূর্ণ করার জন্য ভাষার ক্ষিপ্রগতি প্রয়োজন। এই ক্ষিপ্রগতি সঞ্চারের জন্য "একপ্রকার তীক্ষ্ণ-কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত, অবসরহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থ-গৌরবের দ্যোতনা (epigram)" ব্যবহৃত। (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ১৪৩)। এজন্য চলিতভাষা কাব্যিক আবেগ-উচ্ছ্বাসমণ্ডিত এক অপূর্ব ভাষা সৃষ্টি করলেও এ-ভাষা কথ্যরীতি থেকে বহুযোজন দূরে অবস্থিত। চলিতভাষায় কথ্যভাষার ছন্দস্পন্দ, ইডিয়ম ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ বেশী, এবং কালক্রমে চলিতভাষাই সজীবতা ও প্রাণস্পন্দনে কথ্যভাষাকে আদর্শ (Standard) লেখ্যভাষায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন বিষয়বস্তুর সঙ্গে পদ্ধতির আত্মীয়তা স্থাপনের অক্ষমতায়। "চারঅধ্যায়" উপন্যাস নাটকের ছাঁদে লেখা, অথচ উপন্যাসটির ভাষা কাব্যিক। "ঘরেবাইরে"-র নায়িকা যথেষ্ট আলোকিত হওয়া সত্ত্বেও তার ভাষার জন্যই তাকে আমাদের কেমন কৃত্রিম মনে হয়। সংলাপ রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ এ-পর্যায়ে সমান ব্যর্থ। চলিত ভাষায় সংলাপ রচনার একটি সুবিধা এই যে, সে-সংলাপে সাধারণ কথোপকথনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস-জনিত ওঠানামা, ইডিয়মের ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রবীন্দ্রনাথের সংলাপরচনা অপূর্ব শিল্পের নিদর্শন হলেও, সেই সংলাপ কবিরই সংলাপ। "এরকম সংলাপ সমর্থনযোগ্য হতে পারে দুটো কারণে: প্রথমত, এই ভাষাটাই একটা স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম ব'লে গণ্য; দ্বিতীয়ত, বক্তারা সকলেই সংস্কৃতিবান মানুষ হলে এর

স্বাভাবিকতাও ক্ষুণ্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথের সংলাপের নিজস্ব গৌরব স্বতঃসিদ্ধ, বক্তারাও—অধিকাংশস্থলে—অযোগ্য নন। আমাদের আঘাত লাগে শুধু সেইখানে, যেখানে যোগমায়া বা যতিশঙ্কর অমিত রায়ের প্রতিধ্বনি করে; কিংবা কানাই গুপ্তর কথা শুনে তাকে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে ভুল হয়। 'জনবৃষভের পুষ্যিবাছুর' বা 'নিশ্চয়ই অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি,' এই রকমের শব্দবিন্যাস যার পক্ষে সম্ভব, তারপক্ষে বলা বাহুল্য, কোনো জন্মেই পুলিশের দারোগা হওয়া সম্ভব ছিলো না।" (বুদ্ধদেব বসু : রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্য ; পৃঃ ১৬৭)।

শেষ-পর্যায়ের উপন্যাসে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত ভাষার মোহিনী শক্তি সর্বজনবিদিত। এ-ভাষা অননুকরণীয়, বরং অনুকরণ করাই অনুচিত। কারণ অপরিণত অপক্ক হাতে এ-ভাষা ভাবালুতায় পরিণত হতে বাধ্য। তবু রবীন্দ্রনাথের গদ্য আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার যোগ্য, কারণ সেই অনুশীলনে বাংলা গদ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা আছে।

॥ ৩ ॥

শরৎচন্দ্রের ভাষা আংশিকভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবিত, যদিও এ-ভাষায় রবীন্দ্র-ভাষার বিত্ত বা ঐশ্বর্যের স্পর্শ নেই। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-ভাষার সরল তরলতায় মুগ্ধ, অথবা তাঁর কাছে এই তারল্যই রবীন্দ্র-ভাষার সম্পদরূপে মনে হয়েছিল। অবশ্য শরৎচন্দ্রের ভাষায় ভাবালুতার আধিক্যর জন্য দায়ী তাঁর বক্তব্য ও সমস্যার আংশিকতা, এবং এই আংশিকতা তাঁর নির্বাচিত পদ্ধতিতেও বর্তমান। উপন্যাসের বক্তব্য ও পদ্ধতি যখন আংশিকতাদোষে দুষ্ট, তখন ভাষায় সেই দোষ

বর্তানো স্বাভাবিক। ভাষার বিচার উপন্যাস-নিরপেক্ষ হওয়া অনুচিত। এ-কথা স্বীকার্য, শরৎচন্দ্রের ভাষা যতই তরল ভাবালু হোক না কেন, শরৎ-উপন্যাসে তা বেমানান নয়। তাঁর বাক্যগঠন অকষ্টবদ্ধ ও প্রথানুগত, ভাষায় তৎসম শব্দের আধিক্য নেই, সেজন্য পাঠক অতি অনায়াসে অভিধান ব্যবহার না করেই ভাষার রসাস্বাদনে সক্ষম হন। এ-ভাষা গভীর বক্তব্য রূপায়ণের অযোগ্য নিঃসন্দেহে, একমাত্র পাঠক-পরিতোষিণী হিসাবে এর সাফল্য অনস্বীকার্য।

বস্তুত, বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ (এ-পুস্তকের পরিধির মধ্যে) একমাত্র সচেতন শিল্পী যাঁরা ভাষাকে উপন্যাসের অতিরিক্ত উপাদান ব'লে মনে করেন নি, এবং অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বক্তব্যপ্রকাশের জন্য গদ্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আপন নিশ্চিত-ভূমি পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হন নি। প্রত্যেক সৎশিল্পী আপন ক্ষমতার পরিসর সম্পর্কে সচেতন থাকেন, কিন্তু সেই গণ্ডী অতিক্রম করাও তাঁদের নিরন্তর প্রয়াসের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই বঙ্কিমচন্দ্রও এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন—তার প্রমাণ তদীয় উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী। উপন্যাসের ভাষা উপজীব্য ও উপস্থাপনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বক্তব্য অনুসারে ভাষার "উচ্চতা ও সামান্যতা" নির্ধারিত হওয়া উচিত—বঙ্কিমচন্দ্রের এ-উক্তি সম্পর্কে দ্বিমত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

উপসংহার

আমাদের আলোচনার সীমা প্রথম যথার্থ উপন্যাস "দুর্গেশ-নন্দিনী" থেকে "চারঅধ্যায়" পর্যন্ত প্রসারিত। তবু এ-বিচারণা প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কেন্দ্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বয়স্ক মনন, এবং শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এই পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ। অন্যদিকে বাঙালী পাঠক ও সমালোচকের কাছে উপন্যাসের প্রধান পুরুষ এঁরা তিনজনই, এ-আলোচনায় অন্যান্য যে-সব ঔপন্যাসিকের রচনাবলী গ্রহণ করা হয়েছে, বলা বাহুল্য, সেইসব ঔপন্যাসিক এঁদের তুলনায় গৌণ ঔপন্যাসিক নিঃসন্দেহে। অন্যদিকে জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে প্রধান তিনজনের মধ্যে শরৎচন্দ্র সর্বাগ্রগণ্য, কিন্তু জনপ্রিয়তা ও সৎ-সাহিত্যের সম্পর্ক বোধ করি ব্যস্ত-অনুপাতের (inverse ratio), বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বহুপঠিত বা জনপ্রিয় নয়, এবং পূর্ববর্তী আলোচনায় উভয় ঔপন্যাসিকের বহু ক্রটি দেখানো সত্ত্বেও এই দুইজনের উপন্যাস শরৎ-উপন্যাসের চেয়ে অনেক গভীর তা বলা চলে। শরৎচন্দ্রের গল্প-জমানোর ক্ষমতা সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেকে একমত, কিন্তু কেবল গল্প-জমানোর ক্ষমতাই কি একজন দক্ষ ঔপন্যাসিকের একমাত্র লক্ষণ? আমরা ভাবাবেগে তাড়িত জীব, তাই অতি সহজে শরৎ-চন্দ্রের ভাবালুতায় গা ভাসিয়ে চিন্তা-ভাবনা-বর্জিত উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ অভিধায় ভূষিত করি, সেই ভাবাবেগের তাড়নায় বলি, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা ও অক্ষমতা শরৎচন্দ্র অতিক্রম করেছেন এবং শরৎ-উপন্যাস বাঙালী জীবন ও বাঙালী ঘরের অকপট প্রতিচ্ছবি।

বাংলা উপন্যাসের নাতিপ্রশস্ত পরিসরে (বর্তমান আলোচনার সীমায়) বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বারংবার পাঠ ও বিশ্লেষণের যোগ্য। সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও জীবনসামগ্র্য রূপায়ণে উভয়ের আকুতি আমাদের অনুশীলনের বিষয়। "শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী," সুধীন্দ্র দত্তের এই উক্তি অন্তত বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-উপন্যাস সম্পর্কে প্রয়োজ্য নয়, কারণ উভয়ের উপন্যাস অত্যন্ত মনঃসংযোগ দাবি করে, যেহেতু উভয়ের কাছে উপন্যাস রচনা শুধুমাত্র জনরঞ্জনের বিষয় ছিল না। বাংলা গদ্যের রূপ স্থিরীকৃত ক'রে ঘটনার বিবরণের মধ্যে জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধান কৃতিত্বের সন্দেহ নেই, বঙ্কিমচন্দ্র সেই কৃতিত্বের অধিকারী। উপন্যাস রচনা যে মননের ব্যাপার, সেই কথাটি বঙ্কিম-উপন্যাস পাঠ করলে সহজে বোঝা যায়, অবশ্য বাংলা উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের হাতেই যৌবন লাভ করেছে, এবং সে যৌবন নানা ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হচ্ছে বর্তমানে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম যথার্থ আধুনিক শিল্পী এবং বাংলা উপন্যাস তাঁরই রচনায় আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যদিও আধুনিক উপন্যাসের সূচনাই তিনি মাত্র করে গেছেন, সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বিশেষ চেষ্টা করেন নি, তাঁর শেষ পর্যায়ের চারটি উপন্যাস সে-কথাই আমাদের জানায়।

স্বীকারে লজ্জা নেই যে বিশ্বের অনবদ্য উপন্যাস সাহিত্যের পাশে রাখার মত বাংলা সাহিত্যের একটি উপন্যাসেরও নাম করা যায় না। হয়ত বাংলা দেশের জল হাওয়া ছোটগল্প ও কবিতার উপযোগী, এবং সাহিত্যের এই দু'টি বিভাগ আমাদের যথেষ্ট গর্বের বস্তু ; উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি সেদিক থেকে সাধারণ ভাবে হতাশাব্যঞ্জক সন্দেহ নেই। উপন্যাসের ভবিষ্যৎ আছে, অতএব বাংলা উপন্যাস-ও ভবিষ্যতে বিশ্বমানের কাছাকাছি পৌঁছুবে—এই আশা নিয়ে বর্তমানে আমাদের আলোচনার ছেদ টানা চলে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজী গ্রন্থ

1. Aristotle —On the Art of Poetry, Trans, by Ingram Bywater.
2. Arnold Bennette —The Author's Craft.
3. Arnold Kettle —An Introduction to English Novel, Vol I.
4. Bliss Perry —A Study of Prose Fiction.
5. Clayton Hamilton —Materials and Methods of Fiction.
6. Edith Wharton —The Writing of Fiction.
7. E. M. Forster —Aspects of the Novel.
8. Edmund Wilson —Axel's Castle.
9. Edwin Muir —The Structure of the Novel.
10. Frank O' Connor --The Mirror in Roadway : A Study of Modern Novel.
11. Georg Lukacs —The Meaning of Contemporary Realism.
    —Studeis in European Realism.
12. George Saintsbury —The English Novel.
    —History of French Novel.
13. Henry James —The Art of Fiction and other Essays.
    —The Art of the Novel, Ed. by R. P. Blackmur.
14. Hyman Levy & Helen Spalding —Literature for an Age of Science.
15. J. W. Beach —The 20th Century Novel.
16. Leon Edel —The Psychological Novel.

17. Martin Turnell —The Novel in France.
18. Miriam Allott Ed. —Novelists on The Novels.
19. Percy Lubbock —The Craft of Fiction.
20. Ralph Fox —The Novel and the People.
21. Robert Liddell —Some Principles of Fiction
—A Treatise on the Novel.
22. Stephen Spender —The Making of a Poem.
23. Virginia Woolf —Granite and Rainbow.
—The Common Reader (Series I & II).
24. Walter Allen —The English Novel.

বাংলা গ্রন্থ

১. অচ্যুত গোস্বামী : বাংলা উপন্যাসের ধারা
২. অরবিন্দ পোদ্দার : বঙ্কিমমানস
৩. গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত : শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র
৪. প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত : উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম
৫. প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র-বিচিত্রা
৬. বিষ্ণু দে : সাহিত্যের ভবিষ্যৎ
: এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য
৭. বুদ্ধদেব বসু : রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য
৮. মোহিতলাল মজুমদার : বঙ্কিম বরণ
: বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস
: সাহিত্য বিতান
৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
১০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর
১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুরুষ
: স্বগত
১২. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
(তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
: বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য
১৩. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : বঙ্কিমচন্দ্র
১৪. হরপ্রসাদ মিত্র : সাহিত্যের নানাকথা